প্রসূতি

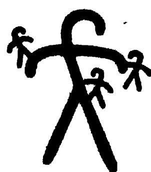
ও

শিশু



প্রসূতি ও শিশু

ডাঃ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



পপুলার বুক ক্লাব ॥ কলিকাতা-২০

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৭

দাম ছয় টাকা

প্রকাশক
অনিলকুমার সিংহ
পপুলার বুক ক্লাব
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ প্রসূতি-পরিচয়

এক | গর্ভসঞ্চার ১—১০

গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ : প্রথম সূচনা—অনিয়মিত, বিলম্বিত ও গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাব।

গর্ভসঞ্চারের প্রমাণ : আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা—বৈজ্ঞানিক উপায়ে গর্ভাধান পরীক্ষা।

দুই | প্রসূতি-চিকিৎসক-হাসপাতাল ১১—৩০

গর্ভসঞ্চার ও চিকিৎসক-নির্বাচন

প্রসূতি-সদন বা হাসপাতাল-নির্বাচন

প্রাথমিক ডাক্তারি পরীক্ষা

"যন্ত্রণাহীন" প্রসব ও "স্বাভাবিক" প্রসব

তিন | গর্ভাবস্থার ক্রমবিকাশ ৩১—৬৬

গর্ভধারণ-কালের স্থায়িত্ব : গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হবে কবে ?

ভাবী মায়ের অভিজ্ঞতা : গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস—গর্ভাবস্থার মাঝের তিন মাস—গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাস।

গর্ভস্থ ভ্রূণ কোথায় থাকে : গর্ভাশয় বা জরায়ু—"জলের থলি"—প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল—কোন্ কোন্ পদার্থ রক্তবাহিত হয়ে ভাবী মা ও গর্ভস্থ সন্তানের দেহে আনাগোনা করে ?

গর্ভস্থ ভ্রূণ কিভাবে বাড়ে : প্রথম মাস—দ্বিতীয় মাস—তৃতীয় মাস—চতুর্থ মাস—পঞ্চম মাস—ষষ্ঠ মাস—সপ্তম মাস—অষ্টম মাস—নবম মাস—যমজ সন্তান নির্ণয়—গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত—গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের উপসর্গ—গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের ধরন—গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের কারণ—পৌনঃপুনিক গর্ভস্রাব—পৌনঃপুনিক গর্ভপাত—কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব ও

ভপাত—সম্ভাব্য গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের চিকিৎসা—গর্ভপাত-নিরোধক ওষুধবিষুধ।

চার | ভাবী মায়ের স্বাস্থ্যবিধি ৬৭—৯৪

শারীরিক পরিশ্রম : খেলাধুলো, হাঁটা, সাঁতার কাটা, গাড়িতে ভ্রমণ —গৃহস্থালির কাজ ও চাকরি—যৌন সংসর্গ বা স্বামী সহবাস।

পোশাক-পরিচ্ছদ

স্বাস্থ্য : স্নান—দাঁতের যত্ন—স্তনাগ্রের যত্ন—নেশা বা বদভ্যাস

খাদ্য

পাঁচ | গর্ভাবস্থার কয়েকটি পরিচিত উপসর্গ ৯৫—১২৪

খাদ্য-পরিপাক ক্রিয়া : গা-বমির ভাব, বমি, অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি—পরিণত গর্ভাবস্থায় বমি, গা-বমি—মুখে জল কাটা—কোষ্ঠকাঠিন্য—অম্বল ও বুকজ্বালা—খাদ্যরুচি ও খামখেয়াল।

চর্ম : গর্ভদাগ—চামড়া চড়চড় করা—ব্রণ, ফুসকুড়ি—চামড়ার নিচে লালচে ছোপ—মেচেতা—তিল—ঘামাচি।

নিদ্রা : ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব—অনিদ্রা রোগ।

নানাবিধ ব্যথা-বেদনা : মাথাধরা, যন্ত্রণা—ফিক-ব্যথা, চাপবোধ—যোনিদেশে বেদনা—পায়ে খিল ধরা—পিঠের ব্যথা।

যোনিদেশে স্রাব ও চুলকানি

অন্যান্য উপসর্গ : ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—শিরাস্ফীতি—অর্শ—হাঁপ-ধরা—গোড়ালিতে শোথ—মাথা ঘোরা—গরম বোধ হওয়া—শীতবোধ ও জ্বর—নাক বন্ধ হওয়া।

ছয় | গর্ভাবস্থায় অসুখ ও প্রতিকার ১২৫—১৪৪

প্রচলিত সাধারণ অসুখবিসুখ—গর্ভাবস্থায় অস্ত্রোপচার—পুরনো ব্যাধি ও কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব-গর্ভপাত—হৃদ্‌রোগ—বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির রোগ—বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস—যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগ—মৃগী রোগ—মূত্রনালি ইত্যাদির রোগ—গর্ভাবস্থা ও অতিরিক্ত বেশি বা কম রক্তচাপ—রক্তাল্পতা-রোগ—রক্তদূষিত রোগ—ওটোস্‌ক্লেরোসিস বা বধিরতা।

সাত | স্তন্যদান বাঞ্ছনীয় কিনা ১৪৫—১৫০

দ্বিতীয় খণ্ড : জন্মকথা

এক । প্রথম সংকেত ১৫৩—১৬১

প্রসবের আগে পেশী-সংকোচন বা পেশীতে টানধরা—শ্লেষ্মাপিণ্ড—রক্তের ছিটে—অ্যাম্‌নিয়টিক 'জলেব থলি' ফেঁসে যাওয়া।

প্রসববেদনা বনাম ডাক্তারবাবু

: । প্রসববেদনা ও শিশুর জন্ম ১৬২—১৮৬

প্রসববেদনার ত্রি-স্তব

প্রসববেদনার প্রথম স্তর : সূচনা—হাসপাতাল—প্রসববেদনা উপশমের উপায়—প্রসববেদনার স্থায়িত্ব।

প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তব, শিশুর জন্ম : সূচনা—"লেবর রুমে"—কাটা-ছেঁড়া ও সেলাই—শিশুর জন্ম—ফর্‌সেপ্‌স বা চিমটের সাহায্যে প্রসব—জন্মের পর।

প্রসববেদনাব তৃতীয় স্তর : "ফুল" পড়া—"ফুল" বের করা—রক্তস্রাব ও "হেঁতাল-ব্যথা" বা প্রসব-পরবর্তী বেদনা।

তিন—প্রসবকালীন জটিলতা ১৮৭—২০১

সীজাবিয়ন সেকসন : অস্ত্রোপচাবের কারণ ও অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি—সীজারিয়ন-পববর্তী গর্ভ সম্পর্কে।

তরান্বিত প্রসববেদনা : বেদনা তবান্বিত করার নানা পদ্ধতি।

অপরিণত বা অকাল-প্রসব : অকাল-প্রসব কাকে বলে—কারণ-নির্ণয়—অপরিণত শিশুব তত্ত্বাবধান।

বিলম্বিত বা সময়-পেরিয়ে-যাওয়া প্রসব : "অতি-পরিণত" গর্ভাবস্থা।

প্রসবকালীন অন্যান্য জটিলতা : শিশুব পাছা-নিচের দিকে অবস্থায় প্রসব—একসঙ্গে একাধিক সন্তান প্রসব—প্রসবের পুর্বে রক্তস্রাব—"শুকনো প্রসব"—"ঘোমটা দেওয়া শিশু"।

চার । জাতক পরিচয় ২০২—২০৬

শিশুকে চেনা—পিতলের চাকতির মার্কা—নবজাতকের কিম্ভূত চেহারা—নার্সারি ঘরে—শিশুর খাদ্য—শিশুর ওজন—শিশুকে দেখা ও খাওয়ানো—শিশুর লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন।

পাঁচ। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ২০৭—২২৮

লেবর-রুমে অবস্থানের সময়—স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সময় ও পদ্ধতি—মূত্রত্যাগ—মলত্যাগ—পথ্য—"হেঁতাল-ব্যথা"—প্রসবের পর রক্তস্রাব—সেলাই-এর জের—প্রসবের পরে মনমরা ভাব—স্তন্যদান—বাড়ি ফেরা—বাড়ি ফেরার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ—প্রসবের পর দেহসৌষ্ঠব রক্ষা—প্রসবের পর প্রথম ডাক্তারি পরীক্ষা—স্বামী-সহবাস—পরবর্তী গর্ভ সম্পর্কে।

তৃতীয় খণ্ড : শিশুপালন

এক। নতুন মায়ের প্রতি ২৩১—২৩৯

সহজবুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস—অপত্যস্নেহ—অভ্যাস, শিক্ষাদীক্ষা, সহবত—শিশুর তত্ত্বাবধান—শিশুর ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপত্যস্নেহ।

দুই। প্রস্তুতিপর্ব ২৪০—২৪৯

শিশুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ. শিশুর খাট-বিছানা—পোশাক পরিচ্ছদ—ফিডিং বট্‌ল ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিস।

সাহায্যকারী ও চিকিৎসক-নির্বাচন

তিন। শিশুর খাওয়াদাওয়া ২৫০—৩০০

শিশু ও খাওয়াদাওয়ার গুরুত্ব. আপরুচি খানা—চোষার প্রবৃত্তি—খাওয়াদাওয়া ও শিশুর ওজন।

খাওয়ার সময় নির্ঘণ্ট. সময় নির্ঘণ্টের তাৎপর্য—নিয়মিত সময়-সূচী অনুসরণের উপায়—তাগিদ অনুযায়ী খাওয়ানো।

স্তনদুগ্ধের অপ্রতুলতা. অপ্রতুলতার কারণ নির্ণয়—একই সঙ্গে স্তন্যপান ও বোতলের দুধের ব্যবস্থা—সাময়িকভাবে স্তনদুগ্ধ হ্রাস।

শিশুকে স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরানো

বোতলের দুধ : দুধ তৈরির প্রক্রিয়া—বোতলের দুধের পরিমাণ নির্ণয়—বোতলে দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি—ঢেকুর তোলানোর উপায়—জবরদস্তি বেশি খাওয়ানো।

শিশুর খাদ্যে ভিটামিন, পানীয় জল : ভিটামিন-ডি—ভিটামিন-সি
—পানীয় জল—বিশোধনের প্রয়োজনীয়তা।

চার | দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান ৩০১—৩১৭

স্নান
চোখ, কান, নাক, মুখ ও নখের যত্ন
নাভিমূলের তত্ত্বাবধান
মাথার তালুর যত্ন
শিশুর সাজ ও শয্যা : পোশাকের ধরন—শিশুর জামা, লেঙট, কাঁথা কাচা।
খোলা হাওয়ায় বেড়ানো
রোদ-পোয়ানো
শিশুর ঘুম ও খেলাধুলো : শিশু কতক্ষণ ঘুমোবে?—খাওয়ার পর ঘুমোনো—পৃথক ঘরে শোয়ানো—শিশুকে সঙ্গদান—শিশুকে লাই দেওয়া—শিশুকে চুমো খাওয়া।

পাঁচ | শিশুর স্বাস্থ্য, অভ্যাস, অসুখবিসুখ ৩১৮—৩৩৮

ওজনবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা
গরহজমের নানা ধরন : হেঁচকি—দুধ তোলা ও বমি—আন্ত্রিক বেদনা ও কাঁদুনে শিশু—অল্পস্বল্প গরহজম ও বায়ু-নিঃসরণ।
শিশুর কান্না
শিশুর পায়খানা
কোষ্ঠকাঠিন্য
শিশুর উদরাময় : অল্পস্বল্প ও গুরুতর উদরাময়—উদরাময়ের জরুরী চিকিৎসা—কয়েকটি অন্যান্য উপসর্গ।

ছয় | উপসংহার ৩৩৯—৩৪০

শিশুর বিকাশ : মানবেতিহাসের পুনরাবৃত্তি

'প্রসূতি ও শিশু' প্রসঙ্গে

'প্রসূতি ও শিশু' বইটি প্রধানত আমাদের দেশের সেই অধিকসংখ্যক প্রসূতির জন্যে, যাঁরা হয় উপযুক্ত পয়সার অভাবে চিকিৎসকের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হন, আর নয়তো পয়সা থাকলেও অভিজ্ঞ চিকিৎকদের কর্মস্থল বা শহরাঞ্চল থেকে এতটা দূবে বাস কবেন যে প্রয়োজনের সময় তাঁদেব সহায়তা লাভ এঁদের পক্ষে দুর্লভ হয়ে পড়ে। প্রধানত এই ধরনের প্রসূতির কথা স্মরণে রেখেই 'প্রসূতি ও শিশু' বইটি লেখা হল।

তবে, এ প্রসঙ্গে একটা কথা। প্রসূতি ও তাঁব আত্মীয় স্বজনদের কিন্তু সব সময়েই মনে রাখা দবকার যে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালীন সময়ে ও পবে শিশুপালন ব্যাপারে শুধুমাত্র বই বা পুঁথিগত বিদ্যাব সাহায্য যথেষ্ট তো নয়ই, এমন কি উপযুক্ত রকম সন্তোষজনকও নয়। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় বিপদ আপদ এবং সন্তানপ্রসবেব সময়ে তো ধাত্রীবিৎ চিকিৎসক কিংবা অভাবপক্ষে অন্তত অভিজ্ঞ, সুনিপুণ ধাত্রীর প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রায় অপবিহার্য বলা চলে। তেমনি নবজাত শিশুব গুরুতর অসুখ-বিসুখ দেখা দিলে শিশু-বিশেষজ্ঞ কিংবা অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া এক দণ্ডও চলে না। তবে তা সত্ত্বেও এ বই রচনার সার্থকতা এই যে গর্ভাবস্থাব সূচনা থেকে সন্তানপ্রসবেব পর শিশুপালনের কাল পর্যন্ত মেয়েদের জীবনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যাযটি সম্পর্কে প্রসূতি মেয়েরা একে-বারে অজ্ঞ থাকাব চেয়ে এ সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞান অর্জন করা তাঁদের পক্ষে সব সময়েই কল্যাণকর ও শ্রেয়। প্রসূতিদের জীবনে এই বিশেষ পর্যায়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও সন্তান সম্পর্কে উদ্বেগ ও ভয় একটি প্রধান আপদ। 'প্রসূতি ও শিশু' যদি এঁদের মনে অন্তত কিছু পরিমাণেও স্বস্তি ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে তা হলে এ বই রচনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করব।

বইয়ের কলেবর অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে দেখে এবং সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ, বলে বইটি শেষ পযন্ত কিছুটা দ্রুত ও আকস্মিকভাবে শেষ করতে হল। পরবর্তী সংস্করণে এ ত্রুটি যথাসাধ্য সংশোধিত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম।

—লেখক

প্রথম খণ্ড

প্রসূতি-পরিচয়

এক | গর্ভসঞ্চার

গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ

আপনি কি মা হতে চলেছেন? ইতিপূর্বে যদি আপনি এক বা একাধিক সন্তানের জননী না হয়ে থাকেন, মা হওয়ার অভিজ্ঞতা যদি আপনার অজানা থেকে থাকে, তাহলে কি কারণে বা কোন্ লক্ষণ দেখে আপনার সন্দেহ হল যে আপনি মা হতে চলেছেন? অর্থাৎ, এক কথায়, গর্ভসঞ্চারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি কি?

সর্বপ্রথম লক্ষণটি অবশ্যই নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া। কোনো এক নির্দিষ্ট মাসে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে-ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার কথা, তা হল না। আপনি প্রথমে হয়তো তেমন লক্ষ্য করলেন না ব্যাপারটা। দু-চাব দিন কাটল। তারপর যখন খেয়াল হল তখন 'দেখাই যাক-না আরো কয়েকটা দিন' বলে প্রতীক্ষা করলেন হয়তো আরো দু-চার দিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন কিছুই হল না, ঋতুস্রাব বন্ধই রইল, তখন আপনার টনক নড়ল। মনে আশা জাগল, তাহলে কি সত্যিই আপনি মা হতে চলেছেন? এই প্রাথমিক আশাকে তখন বিশ্বাসে রূপ দেবার জন্যে আপনি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন গর্ভসঞ্চারের অন্যান্য লক্ষণও আপনার শরীরে দেখা যাচ্ছে কিনা।

কিন্তু আপনি হয়তো দেখবেন এই প্রাথমিক অবস্থায় আপনার মধ্যে আর বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। এটাও খুবই সম্ভব। এত প্রাথমিক অবস্থায় শুধুমাত্র ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো লক্ষণ প্রকাশ না-পাওয়াকে অস্বাভাবিক মনে করার কোনো কারণ নেই। আবার এর ফলে 'তাহলে বোধহয় গর্ভসঞ্চার হয়নি' এ-রকম ধারণা করাও ভুল হবে। অবশ্য এও ঠিক যে

মেয়েদের ঋতুস্রাব সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা কিংবা অনিয়মিতভাবে হওয়া বা বিলম্বে হওয়ার একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই গর্ভসঞ্চার নয়। রক্তাল্পতা বা অন্যান্য ছোটবড় শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কারণেও উপরোক্ত সব কটি লক্ষণই মেয়েদের শরীরে প্রকাশ পেতে পারে। উল্টোদিকে আবার গর্ভাবস্থায়, বিশেষ করে তার প্রথম দু-তিন মাসে, অল্পস্বল্প রক্তস্রাবও কিছু কিছু গর্ভিণীর ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। যাই হোক, মোট কথা এটা মনে রাখবেন যে গর্ভসঞ্চারের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় কেবলমাত্র মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া ছাড়া অন্যান্য লক্ষণ তেমন প্রকাশ নাও পেতে পারে।

আবার কেউ কেউ এও হয়তো দেখবেন যে ইতিপূর্বে মাসিক ঋতুস্রাবের ঠিক আগে-আগে আপনার শরীবে যে-সব বিশেষ উপসর্গ বা অস্বাচ্ছন্দ্য এ-যাবৎ প্রকাশ পেয়ে এসেছে এবাব সেগুলি আবো তীব্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। ইতিপূর্বে যে-সমস্ত শারীরিক উপসর্গ বা অনুভূতি লক্ষ্য করে আপনি বুঝতে পাবতেন মাসিক ঋতুস্রাব আসন্ন, গর্ভাবস্থায় এবাব হয়তো সেই শাবীবিক লক্ষণগুলিই হুবহু আপনার মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখবেন। সাধারণত এই রকমই হয়ে থাকে। তবে তফাত এই যে এবাব আর মাসিক স্রাব শুরু হবে না। যদিও বা তা দেখা দেয় তবে অল্পস্বল্প রক্তক্ষরণ হিসেবেই তা প্রকাশ পাবে, স্বাভাবিক ঋতুস্রাব হিসেবে নয়। অন্যান্যবার মাসিক ঋতুস্রাবের বেলায় প্রথম দু-এক দিনের মধ্যেই যেমন স্রাব বৃদ্ধি পায় ও শারীবিক অস্বাচ্ছন্দ্যগুলি কমে আসে বা সেরে যায়, গর্ভাবস্থায় এবার কিন্তু ওই মৃদু রক্তক্ষরণ দু-এক দিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে আর উল্টো শাবীরিক উপসর্গগুলিই ক্রমশ বেড়ে উঠবে।

এই শারীরিক অনুভূতিগুলি নিম্নরূপ : স্তনদ্বয় ক্রমে বেশি স্পর্শকাতর হয়ে উঠবে—বিশেষ করে বাহুমূলেব কাছাকাছি, বাইরের দিকটায়। স্তনাগ্র ও তার চারপাশের জায়গাটায় এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি বোধ হবে। কখনো-সখনো, এমন কি গর্ভাবস্থার একেবারে প্রথম দিকে—তিন সপ্তাহের মধ্যেই—স্তনবৃন্তে এক-আধ ফোঁটা দুধের মতো

তরল পদার্থও দেখা দিতে পারে।

এছাড়া গর্ভসঞ্চারের তিন সপ্তাহ বা তার কিছু পরে হয়তো আরো একটি লক্ষণ দেখা দেবে। সেটি হল, আগের চেয়ে বেশি ঘনঘন গর্ভিণীর মূত্রত্যাগের ইচ্ছা।

আর প্রায় ওই সময়েই মেয়েদের আরেক ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। তা হল, মাথা ঘোরা বা ঝিমঝিম করা এবং বমনেচ্ছা বা গা-বমির ভাব। এই শেষেব লক্ষণগুলিকে চলতি কথায় বলে প্রত্যুষের অসুস্থতা বা ভোবের রোগ। সাধারণত প্রতিদিন ভোরের দিকে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের এই উপসর্গ দেখা দেয়। তবে এর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, দিনের যে-কোনো সময়ে এ দেখা দিতে পারে এবং সারা দিন ধরে বজায় থাকতে পারে।

গর্ভাবস্থার প্রাথমিক লক্ষণগুলি তাহলে মোটামুটি উপরোক্তরকম। কিন্তু এমনও বহু মহিলা আছেন গর্ভসঞ্চারেব প্রাথমিক দিনগুলিতে যাঁদের শরীরে তাব বিন্দুমাত্র লক্ষণও প্রকাশ পায় না। এঁদের গা-বমি দেখা দেয় না, ঘনঘন মূত্রত্যাগেব ইচ্ছাও জানা যায় না, স্তন-সংক্রান্ত কোনো বিশেষ অস্বাচ্ছন্দ্যের কথাও শোনা যায় না। এঁরা যে গর্ভবতী হয়েছেন তাব একমাত্র লক্ষণ এই দেখা যায় যে ক্রমাগত একাধিক মাস ধরে এঁদের ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে।

যাই হোক, গর্ভকাল ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে অবশ্য পূর্বোক্ত প্রাথমিক লক্ষণগুলি ছাড়া প্রসূতির আরো নানা শারীরলক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। যেমন, স্তনদ্বয় ক্রমশ বড় ও ভারী ওয়ে ওঠা, স্তনাগ্র স্থুল হওয়া এবং স্তনাগ্র ও তার চাবপাশের জায়গা ক্রমে বেশি কালচে হয়ে যাওয়া, চোখের কোলে কালি পড়া, মুখ রোগাটে ধাঁচের হলে চোয়ালের হাড় উঁচু হওয়া এবং পরিশেষে পেটের আয়তন ক্রমশ বেড়ে যাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনিয়মিত, বিলম্বিত ও গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাব—অনেকসময় নিজেদের অনুভূতি বা অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ মেয়েদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে

থাকে। ফলে যখন তাঁরা অন্তঃসত্ত্বা হন তখনো মনে ভাবেন কিছুই হয়নি, আবার যখন সত্যিই কিছু হয়নি তখন গর্ভসঞ্চার হয়েছে মনে করে বসে থাকেন। যেমন, ধরুন, ওভারি বা ডিম্বকোষ-ঘটিত গোলযোগের দরুন কোনো মাসে কোনো মেয়ের ফ্যালোপিয়ন নলীতে ওভাম বা স্ত্রী-ডিম্ব নেমে এল না, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ডিম্ব-স্ফোটনই হল না, এবং তার ফলে ওই মাসে ওই মেয়ের ঋতুস্রাবে বিলম্ব ঘটল। আর বিলম্ব দেখেই মেয়েটি স্থির করে বসলেন যে তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। অথচ আসলে তিনি মোটেই অন্তঃসত্ত্বা হননি। তেমনি, উল্টোপক্ষে, ধরা যাক, একটি মেয়ের যথার্থই গর্ভসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী ঋতুস্রাবের সময় (অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সময়ে তাঁর পরবর্তী মাসিক স্রাব হত, সেই সময়) ঘনিয়ে এলে হয়তো দেখা গেল নিয়মিত ঋতুস্রাবের পূর্ববর্তী সমস্ত শারীরিক উপসর্গ বা অস্বাচ্ছন্দ্যগুলি সেবারও তাঁর দেহে প্রকাশ পাচ্ছে। অতএব তিনি নিশ্চিত হলেন যে তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়নি, কেননা 'মাসিক স্রাব তো আরম্ভ হল বলে'।

সময়-সময় এমনও দেখা যায়, গর্ভসঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী মাসিক স্রাবের নির্ধারিত সময় নাগাদ কোনো কোনো মেয়ের ঋতুস্রাবের সূচনা হচ্ছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ অল্পস্বল্প রক্তক্ষরণ হতে থাকে। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ জনেরই গর্ভকালীন প্রথম দু-তিন মাস এই রকম কিছু-না-কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে।

কিছু কিছু ইতর প্রাণীর মধ্যে এটা অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেরই সামিল। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে একে সাধারণত স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয় না। তবু এ-ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়, বিশেষ করে গর্ভসঞ্চারের পরবর্তী প্রথম মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে-সময়ে তো বটেই। তবে এ-স্রাব নেহাত ক্ষীণ রক্তমোক্ষণ মাত্র। প্রতি চারজন গর্ভিণীতে যদিও মাত্র একজনের এ-ধরনের রক্তক্ষরণ ঘটে এবং যাঁদের এমন হয় তাঁদের তিনভাগের দু-ভাগ যদিও নির্বিবাদে সন্তানপ্রসব

করে থাকেন তবু ডাক্তাররা বলেন যে এমন ব্যাপার দেখা গেলে আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো। কেননা, উপরোক্ত তিন ভাগের এক ভাগ মেয়ের ক্ষেত্রে অন্তত এ-ধরনের ঘটনার পরিণতি ঘটে মারাত্মক গর্ভপাতে।

গর্ভসঞ্চারের প্রমাণ

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা—গর্ভে সন্তান এসেছে এমন সন্দেহ হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো চিকিৎসককে—সম্ভব হলে ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ কোনো ডাক্তারকে—দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করান। এমন কোনো ডাক্তার যদি থেকে থাকেন যিনি গর্ভসঞ্চারের পূর্বেও আপনাকে পরীক্ষা করেছেন, তবে তাঁকে দিয়ে পরীক্ষা করানোই সবচেয়ে ভালো। এই শেষোক্ত চিকিৎসক সম্ভবত গর্ভসঞ্চারের পর চতুর্থ কি পঞ্চম সপ্তাহেই প্রায় নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন গর্ভসঞ্চার বা গর্ভাধান যথার্থ হয়েছে কিনা। এটা সম্ভব এই জন্যে যে ডাক্তাববাবু যেহেতু গর্ভসঞ্চারেব আগেকার অবস্থায় আপনার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদিব স্বাভাবিক আকার ও অবস্থানেব সঙ্গে পরিচিত, সেই হেতু গর্ভসঞ্চাবের ফলে সে-সমস্ত জিনিসের সামান্য পরিবর্তনও এঁর পক্ষে বুঝতে পাবা সম্ভব। এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ওই চার-পাঁচ সপ্তাহের আগেই ডাক্তাববাবুব পক্ষে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা বলতে পারাও অসম্ভব নয়। তবে আপনি যদি এমন কোনো চিকিৎসকের কাছে যান যিনি এব আগে আপনাকে পরীক্ষা করার সুযোগ পাননি, তাঁব পক্ষে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার দ্বারা গর্ভসঞ্চার নির্ণয় করতে হলে গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে অন্তত পক্ষে পাঁচ সপ্তাহ কিংবা তাব চেয়েও বেশি সময়েব দরকার হবে।

আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত মেয়েবা নিজেদের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির কারণে ডাক্তারের কাছে যাওয়া পছন্দ করেন না। তাছাড়া ডাক্তার দেখানোর সঙ্গে আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নও জড়িত। সহজে ডাক্তারের কাছে না-যেতে চাওয়ার সেটাও একটা গুরুতর কারণ

বটে। তবে আজকাল অন্তত শহরাঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে এবং হাসপাতালগুলির প্রসূতি-বিভাগে কিংবা স্বতন্ত্র প্রসূতি-সদনগুলিতে ভর্তি হওয়ার ও প্রসবের ব্যবস্থা করানোর সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। আগে থাকতে এই ধরনের কোনো হাসপাতালের 'আউটডোর'-বিভাগে প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করানোয় এবং গর্ভসঞ্চার হয়েছে প্রমাণিত হলে সে-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আবেদন জানিয়ে কার্ড করিয়ে রাখায় কোনো বাধা নেই। এইভাবে অপেক্ষাকৃত কম সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থবধূর পক্ষে বিনা ডাক্তারের ফি-তে হাসপাতালের চিকিৎসকের দ্বারা গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনমতো একাধিক বার পরীক্ষিত হওয়া চলে। সঙ্গতিপন্ন মহিলাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র ; তাঁরা ইচ্ছামতো ফি দিয়ে বিশেষজ্ঞ নামজাদা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন এবং প্রসবের সময় স্বতন্ত্র নার্সিং হোম কি প্রসূতি-সদন কিংবা বড় হাসপাতালের প্রসূতি-বিভাগে ভর্তি হতে পারেন। মোট কথা, গর্ভসঞ্চার হয়েছে সন্দেহ হলে যেখানে হোক ডাক্তারেব দ্বারা প্রসূতিকে পরীক্ষা করানো দরকার।

তবে উপরোক্ত কারণগুলি বাদ দিলেও আরো একাধিক কারণে মেয়েরা সাধাবণত গর্ভসঞ্চারের গোড়ার দিকে ডাক্তারের কাছে যেতে চান না। যেমন, গর্ভসঞ্চাবেব পববর্তী সম্ভাব্য ঋতুস্রাবের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এবং ঋতুস্রাব যে হল না, বন্ধ রইল, এটা না দেখে প্রায়শই ডাক্তারের কাছে যান না। অনেকে তো ঋতুস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহই করেন না। এর প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে গর্ভিণীদের মধ্যে অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ কেউই ঋতুস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে নিশ্চিত হন না। এবং নিশ্চিত যে হওয়া চলে না, তাও ঠিক। শরীরে কোনো অস্বাভাবিক উপসর্গ যদি দেখা না দেয় ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য মোটামুটি বজায় থাকে তাহলে এর আগে নিশ্চয়ই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকারও পড়ে না।

কিন্তু গর্ভসঞ্চারের গোড়ার দিকে ডাক্তার দেখানোর অনিচ্ছার পেছনে অনেক সময় কোনো কোনো মেয়ের মানসিক সংস্কারও কাজ করে। এঁরা মনে করেন, এসময়ে শরীরে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলে গর্ভপাত ঘটবে। বহু মেয়ের মনে এই ভয়টা বদ্ধমূল দেখা যায়। এটা খুবই দুঃখের কথা। মেয়েদের মনে রাখা দরকার, এটা কোনো কাজের কথা নয়, নিছক সংস্কারমাত্র। এই ভয় বা সংস্কারের বশে বহু স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়েছেন বুঝেও এবং পরবর্তী সম্ভাব্য ঋতুস্রাবের সময় থেকে অল্পস্বল্প রক্তক্ষরণে ভুগছেন জেনেও কিছুতেই ডাক্তার দেখান না। কিংবা যদিও বা ডাক্তারের কাছে যান কিছুতেই তাঁরা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় রাজী হন না। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষার ফলে গর্ভপাতের এই ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। বরং এ-সময়ে শরীরে অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখলে প্রথমেই ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত। মনে রাখবেন, বিলম্বে গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই: প্রথমবার মাসিক ঋতুস্রাব না-হওয়া বা বন্ধ থাকার পব সপ্তাহখানেক বা তাব কিছু বেশি সময়ের মধ্যে শরীরে যদি কোনোরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাভাবিক উপসর্গ ইত্যাদি না দেখা দেয় অথচ আপনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বলে মনে করেন তাহলে, অন্তত ওই সময় পর্যন্ত, ডাক্তারের দ্বারা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা না করালেও চলে। অসুবিধা বোধ না করলে আপনি এমন কি আরো দুই থেকে তিন সপ্তাহ ডাক্তার দেখানো থেকে বিবত থাকতে পারেন। অতঃপব ডাক্তাবের কাছে যান। ওই সময়ে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ ডাক্তারি পরীক্ষার দ্বারাই প্রায়শ গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব।

তবে মনে রাখবেন, শরীরে কোনো অস্বাভাবিক উপসর্গ বা অস্বাচ্ছন্দ্য দেখলে ডাক্তার দেখাতে বিলম্ব করা একেবারেই উচিত হবে না।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে গর্ভাধান পরীক্ষা—আভ্যন্তরীণ ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়া সত্যি সত্যিই গর্ভাধান হয়েছে কিনা তা জানবার অন্যবিধ

বিজ্ঞানাগারিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা পরীক্ষাও প্রচলিত আছে। এই পরীক্ষাগুলি প্রধানত জীবতাত্ত্বিক এবং রাসায়নিক। তবে কার্যক্ষেত্রে এ-ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে খুব কমই। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, গর্ভসঞ্চারের পর অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির প্রথম মাসিক ঋতুস্রাবের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, অর্থাৎ সে-ঋতুস্রাব বন্ধ থাকার পর, তিন বা চার সপ্তাহের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাক্তাররা নির্ভুলভাবে গর্ভসঞ্চার ঘটার কথা বলে দিতে পারেন। কাজেই বেশির ভাগ মেয়ের ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার জন্যে আভ্যন্তরীণ ডাক্তারি পরীক্ষাই যথেষ্ট, তার জন্যে পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক (জীবতাত্ত্বিক কিংবা রাসায়নিক) পরীক্ষার দরকার করে না। কেবলমাত্র যে-সব মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন কিনা জানবার জন্যে অতিমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তাঁরাই কাজে লাগান। এছাড়া গর্ভসঞ্চারে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে—যেমন, গর্ভসঞ্চারের পর ভ্রূণ ডিম্বকোষ কিংবা ফ্যালোপিয়ন নলীর গায়ে আশ্রয় নিয়েছে বলে সন্দেহ করবার কারণ ঘটলে—এই ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা ডাক্তাররা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চান। এবং এই ব্যাপারে চিকিৎসকরা যত দ্রুত নিশ্চিত হতে পারেন গর্ভিণীর পক্ষে ততই মঙ্গল বলে গর্ভসঞ্চারের কয়েকদিনের মধ্যেই এ-রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

এইসব বৈজ্ঞানিক গর্ভাধান-পরীক্ষাগুলির বেশির ভাগই জীবতাত্ত্বিক জাতের। এখন, এইসব পরীক্ষার ভিত্তি কি তাই নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। অবশ্য এ আলোচনার অসুবিধাও আছে। শারীরবিদ্যা (Physiology) ও শারীর-সংস্থানবিদ্যা (Anatomy) আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বলে নারীদেহের গঠন, তার জননতন্ত্র (Reproductive System) ও গর্ভাধান বা গর্ভসঞ্চারের শারীরবিদ্যাগত কার্যকারণের আলোচনা এ-বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে রাখা হয়েছে। ফলে গর্ভাধান-পরীক্ষার বিষয়টি আলোচনা

করতে গিয়ে আমাদের উপরোক্ত বিষয়গুলি জানা আছে বলে ধরে নিতে হচ্ছে। যাই হোক, এক্ষেত্রে শুধু এইটুকু জানলে চলবে যে নারী-ডিম্বকোষ বা ওভারি থেকে ওভাম বা ডিম্ব উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ওভারি থেকে নির্গত আরো কতকগুলি কোষ (বা cell) মিলে কর্পাস লিউটিয়ম নামে ছোট্ট একটি গ্রন্থি-জাতীয় জিনিস তৈরি হয় এবং এই কর্পাস লিউটিয়ম থেকে এক ধরনের হর্মোন বা উত্তেজক পদার্থ তৈরি হয় যার নাম হল প্রোজেস্‌টিন। প্রতিবারই ডিম্ব-স্ফোটনের সঙ্গে এই কর্পাস লিউটিয়ম ও প্রোজেস্‌টিন হর্মোন তৈরি হয় নারী-জননতন্ত্রে। কিন্তু গর্ভসঞ্চার না হলে কর্পাস লিউটিয়ম নামের গ্রন্থিটি নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভাধান ঘটলে পুরো গর্ভাবস্থা ধরে এই গ্রন্থিটি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং মেয়েদের দেহে প্রোজেস্‌টিন সরবরাহ করে। কাজেই সম্ভাব্য গর্ভসঞ্চারের পর প্রথম ঋতুস্রাবের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও---অর্থাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ আছে কিংবা সামান্য রক্ত-ক্ষরণমাত্র হয়েছে দেখার পরও -মেয়েদের দেহে প্রোজেস্‌টিনের সরবরাহ যথেষ্ট আছে কিনা তাই দেখে বোঝা যাবে কর্পাস লিউটিয়ম নামের গ্রন্থিটি অক্ষুণ্ণ আছে কিনা। কর্পাস লিউটিয়ম গ্রন্থি বজায় থাকলে বুঝতে হবে গর্ভসঞ্চার ঘটেছে। এখন, কোনো অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের জননতন্ত্রে প্রোজেস্‌টিনেব সরবরাহ যথেষ্ট আছে কিনা তা বোঝার উপায় ওই মেয়েটির প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখা। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, প্রস্রাবে বেশ বেশি পবিমাণে প্রোজেস্‌টিন হর্মোন রয়েছে। গর্ভসঞ্চারের পর তিন মাস পর্যন্ত প্রস্রাবে এই প্রোজেস্‌টিনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চরমে ওঠে এবং তার পর থেকে ক্রমে ক্রমে তা কমতে থাকে।

মনুষ্যেতর জীবজন্তুর মধ্যে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের দেহে প্রস্রাবের মধ্যেকাব এই হর্মোন কিছু কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কাজেই যে মেয়েটির গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাঁর প্রস্রাব এমনি কোনো প্রাণীর দেহে ঢুকিয়ে দিতে পারলে ওই প্রাণীর দেহের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যাবে মেয়েটির প্রস্রাবে প্রোজেস্‌টিন

হর্মোন আছে কিনা, অর্থাৎ মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা কিনা। যাঁর গর্ভসঞ্চার পরীক্ষা করতে হবে তাঁর প্রস্রাব এমন একটা স্ত্রী-খরগোস যে ইতিপূর্বে যৌন-সংসর্গ করেনি তার কানের শিরায় ইন্‌জেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে খরগোসটা কেটে তার ওভারি বা ডিম্বকোষ পরীক্ষা করে দেখা হয় ওভারিতে কি কি ধরনের পরিবর্তন হল। এই পরিবর্তন দেখে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন ওই মেয়েটির প্রস্রাবে প্রোজেস্টিন ছিল কিনা, অর্থাৎ মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন কিনা।

তবে একথাও মনে রাখা দরকাব যে এ-পর্যন্ত এই ধরনের জীবতাত্ত্বিক গর্ভাধান-পরীক্ষা শতকরা একশো ভাগ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতি ছাড়া গর্ভাধান-পরীক্ষাব নানারকমের রাসায়নিক পদ্ধতিও আছে। কিন্তু সেগুলি ঐ জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষার চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য বলে বিশেষজ্ঞবা মনে কবেন।

দুই | প্রসূতি-চিকিৎসক-হাসপাতাল

গর্ভসঞ্চার ও চিকিৎসক-নির্বাচন

আগেই বলেছি, গর্ভে সন্তান এসেছে এমন সন্দেহ হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো ডাক্তারকে দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করান। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি?—প্রথম পরিচ্ছেদে গর্ভসঞ্চারের যে-সমস্ত স্বাভাবিক লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলি ছাড়া আরো কোনো এক বা একাধিক অস্বাভাবিক উপসর্গ বা অস্বাচ্ছন্দ্য শরীরে দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নিন। এই উপরোক্ত কারণে ডাক্তার দেখাবার কোনো বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া চলে না। সম্ভাব্য গর্ভসঞ্চারের পর প্রথমবার মাসিক ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবার আগেই যদি এ-রকম কোনো অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দেয় তো তখুনি ডাক্তার দেখাতে হবে। আবার, ধরুন, ওই উপরোক্ত প্রথম ঋতুস্রাবের আগে পর্যন্ত কিছুই টের পাওয়া গেল না কিন্তু ঋতুস্রাবের নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত কোনো স্রাব দেখা গেল না শুধু অল্প অল্প রক্তক্ষরণ ঘটল মাত্র এবং কাপড়ে ক্ষীণ দাগ লাগার মতো সেই রক্তক্ষরণ সমানে ক-দিন চলল। এ-রকম অবস্থায় ওই সময়েই বিলম্ব না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং সেই পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। এই তো গেল অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে কী করতে হবে সে-কথা। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায়?—স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভাব্য গর্ভসঞ্চারের পর প্রথমবার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কোনোই ক্ষতি নেই। এবং তার পরও অন্তত আরো দু-এক সপ্তাহ পার হবার আগে, এমন কি আপনার পূর্ব-পরিচিত ডাক্তারবাবুর পক্ষেও, গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা নির্ভুলভাবে বলতে পারা সম্ভব হবে না। ডাক্তারবাবু আপনার

অপরিচিত হলে তো কথাই নেই, তাঁর পক্ষে নির্ভুলভাবে গর্ভসঞ্চার প্রমাণ করতে হলে প্রথমবারের ঋতুস্রাব বন্ধ থাকার সময় থেকে আরো তিন কিংবা চার সপ্তাহ সময় পাওয়া দরকার। অতএব, স্বাভাবিক অবস্থায়, আপনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন কিনা জানবার জন্যে যদি খুব বেশি তাগিদ অনুভব না করেন অথবা অন্য কোনো কারণে তেমন প্রয়োজন বোধ না করেন তাহলে মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর অন্ততপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারেন এবং তারপর ডাক্তার দেখাতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল, গর্ভসঞ্চার পরীক্ষা করানোর জন্যে কোন্ ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার? – অবশ্য, যদি (১) আপনাদের এমন কোনো পারিবারিক চিকিৎসক থাকেন যিনি ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং যিনি এতাবৎ পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখাশোনা ও সুপ্রসবের ভার নিয়েছেন অতএব আপনিও তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকতে মনস্থ করেছেন, কিংবা (২) ইতিপূর্বে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার আগে, আপনাকে এক বা একাধিবার পরীক্ষা করেছেন এবং আপনার শরীর-মনের বিশেষ প্রকৃতি ও গঠনের সঙ্গে পরিচিত এমন কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের আপনি ইতিপূর্বেই শরণাপন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে নতুন করে এই ডাক্তার নির্বাচনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যদি আপনার ক্ষেত্রে এই উপরোক্ত দু-ধরনের ব্যাপার না ঘটে থাকে তাহলে এইবার আপনাকে চিকিৎসক নির্বাচনের সমস্যাটির সমাধান করে ফেলতে হবে।

বাড়িতে যদি আপনার শাশুড়ী বা মা কিংবা কাকীমা-পিসিমা জাতীয় গুরুজনস্থানীয় কোনো বয়স্ক মহিলা থাকেন এবং আপনি যদি এইবার প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হন তো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তাঁর বা তাঁদের শুশ্রূষা বা তত্ত্বাবধান আপনার পক্ষে খুবই উপকারে আসবে। এঁদের উপদেশও যথাসম্ভব মূল্যবান বলে গণ্য করবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ডাক্তার-নির্বাচন সম্বন্ধে এদের পরামর্শ যে সর্বদা ও সর্বত্র নির্ভুল হবে এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই।

এঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ—আজকের দিনেও—থাকতে পারেন যাঁরা হয়তো আপনাকে ডাক্তারের কাছে যাওয়া থেকে একেবারেই বিরত করতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এ-ধরনের সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টা থেকে এঁদেরই বিরত করা দরকার হবে। এছাড়া, আপনি হয়তো দেখবেন, এই সমস্যাটি আপনার হয়ে সমাধান করে দেবার জন্যে যাঁরা ইতিপূর্বেই সন্তানের জননী হয়েছেন এমন আত্মীয়া, বান্ধবী ও প্রতিবেশিনীরাও এগিয়ে আসবেন। এঁরা প্রত্যেকেই হয়তো নিজে যে ডাক্তারবাবুর তত্ত্বাবধানে থেকে সুপ্রসব করেছেন তাঁকেই সবচেয়ে ভালো বলে মতপ্রকাশ করবেন। কিন্তু এতে আপনার বিচলিত হলে বা সবকিছু গুলিয়ে ফেললে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে আপনাকে ও আপনার স্বামীকে এই অসংখ্য নাম ও কৃতিত্বেব তালিকা থেকে মনোমতো চিকিৎসক খুঁজে বের করতে হবে।

মনে রাখবেন, সব মেয়েব পক্ষেই সমান মনোমতো বা সমান "ভালো" ধাত্রীবিৎ চিকিৎসক মেলা দুষ্কর। প্রত্যেক প্রসূতিকে নিজের পছন্দসই চিকিৎসক খুঁজে বেব কবতে হয়। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে এমন একজন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দবকাব যিনি প্রসূতি মেয়েদের সঙ্গে অন্তবঙ্গ শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুব মতো ব্যবহার করেন, পবীক্ষা ও প্রশ্নোত্তবেব জন্যে অন্য চিকিৎসকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ব্যয় কবেন, বেশি যত্ন নেন এবং এইভাবে প্রসূতির মনে আস্থা ও নির্ভরতার ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন। প্রসূতি ও ডাক্তারের মধ্যে এই হৃদ্যতার ভাব সৃষ্টি করা শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। কেননা এর ফলে ডাক্তারের সঙ্গে প্রসূতিব সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং ভালো ডাক্তার ও প্রসূতি সহযোগী হলে সন্তানপ্রসবের কাজ অনেকখানি নিরাপদ ও সহজসাধ্য হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের মেয়েরা নানা কারণে একটু বেশি লজ্জাপরায়ণ। আজকের দিনেও এমন মেয়ে যথেষ্ট দেখা যায় যাঁরা পুরুষ ডাক্তারকে

দিয়ে গর্ভপরীক্ষা করাতে ও প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে কুণ্ঠিত হন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও আধা-শহরাঞ্চলে এরকম মেয়ের সংখ্যা যথেষ্ট। সম্ভবস্থলে ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ মহিলা চিকিৎসকদের দিয়ে এঁরা পরীক্ষিত হতে পারেন। আজকাল এদেশে এ-ধরনের মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে; এমন কি উচ্চ ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ মহিলা চিকিৎসকেরও অভাব নেই। তাছাড়া স্ত্রী-স্বভাববশত এঁদের পক্ষে একটু বেশি স্নেহপ্রবণ হওয়া স্বাভাবিক এবং পুরুষের চেয়ে এঁদের পক্ষে রোগিনীর অন্তরঙ্গ হওয়াও অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে এ-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। নিছক লজ্জার আধিক্যবশত মহিলা বলেই মহিলা চিকিৎসক নির্বাচন করাটা কোনো কাজের কথা নয়। তারও আগে দেখা দরকার সে-চিকিৎসক ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কিংবা অন্তুতপক্ষে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কিনা এবং দ্বিতীয়ত তিনি কাছাকাছি কোনো ভালো প্রসূতি-সদন বা নার্সিং হোম কিংবা হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত কিনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে চিকিৎসক নির্বাচন করতে হলে আপনাকে প্রথমত কয়েকটি জরুরী বিষয় দেখে নিতে হবে। নির্বাচিত চিকিৎসক মহিলা বা পুরুষ যাই হোন না কেন, তাঁকে মনোনয়নের আগে খোঁজ করে দেখুন—(১) ডাক্তারবাবু ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কিংবা অভিজ্ঞ কিনা এবং অন্যান্য প্রসূতির ক্ষেত্রে সুপ্রসবের ব্যাপারে তাঁর "হাতযশ" কেমন; (২) "ডাক্তারবাবু লোক ভালো" বা ঐ ধরনের কোনো বিশেষ গুণের কথা তাঁব সম্পর্কে বাজারে শোনা যায় কিনা; (৩) আপনার বাড়ির কাছাকাছি যে বা যে-সমস্ত ভালো বা পছন্দসই হাসপাতাল বা প্রসূতি-সদন কিংবা নার্সিং হোম আছে, ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে কিংবা তার কোনো একটির সঙ্গে সংযুক্ত আছেন কিনা। অবশ্য মোটামুটি যাঁদের দেখে-শুনে ডাক্তার নির্বাচনের সঙ্গতি আছে, এ হল তাঁদের কথা। এছাড়া আরো অসংখ্য প্রসূতি আমাদের দেশে আছেন, যাঁদের ক্ষেত্রে এত ভেবেচিন্তে ডাক্তার নির্বাচনের প্রশ্ন

ওঠে না। এঁদের বেলায় প্রশ্ন হল প্রথমে ডাক্তার নির্বাচনের নয়, প্রথমেই হাসপাতাল নির্বাচনের।

প্রসূতি-সদন বা হাসপাতাল নির্বাচন

আপনার সন্তানপ্রসব হবে কোথায়? বাড়িতে না হাসপাতালে?— বাড়িতে যদি আপনার শাশুড়ী বা মা বা অন্য কোনো গুরুজনস্থানীয় বয়স্ক মহিলা থাকেন তবে হয়তো দেখবেন তাঁদের মধ্যে কেউ-না-কেউ কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে, এমন কি আজকের দিনেও, গর্ভাবস্থায় তত্ত্বাবধানের ভারই যে শুধু পুরোপুরি নিজের হাতে রাখতে চাইবেন তা নয়, সন্তানপ্রসবও হয়তো বাড়িতে, বড় জোর ধাত্রী ডেকে, করাতে চাইবেন। ডাক্তার দেখানোয় এঁদের বিশ্বাস নেই, হাসপাতালে অবিশ্বাস আরো বেশি। এতে অবাক হবার কিছু নেই। হয়তো আপনাদের বাড়িতে আপনার গুরুজনস্থানীয়রা মোটেই এমন অবুঝ নন। কিন্তু গ্রাম বা মফস্বল-অঞ্চলে তো বটেই এমন কি এই কলকাতা শহরেই আজো এমন অনেক "সেকেলে" বা পশ্চাদ্পদ পরিবার আছে যেখানে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা মোটেই বিরল নয়।

এর কারণ কি? একটি কারণ নিশ্চয়ই মনের কুসংস্কার। ডাক্তার ও হাসপাতাল সম্পর্কে অহেতুক ভয় ও বীতরাগ। কিন্তু আমরা যদি এই কুসংস্কারেব মূল কাবণটি খোঁজ কবি, তাহলে দেখব এই কুসংস্কারের মূলে আছে দেশব্যাপী শিক্ষার অভাব। বিশেষ করে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ যখন ইংরেজের অধীন ছিল তখন দীর্ঘকাল ধরে অন্যান্য সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব অগ্রগতিও ছিল বাধাগ্রস্ত। আর স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা তখন স্বভাবতই আরো শোচনীয় ছিল। ফলে যে-সব মেয়েব বয়স আজ পঞ্চাশোত্তীর্ণ কিংবা তারও বেশি, তাঁদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছেন। এবং এই শিক্ষার অভাবের ফলেই এঁরা নানা ধরনের অন্ধ সংস্কারের শিকার।

কিন্তু এই ধরনের বয়স্ক মহিলাদের হাসপাতাল-ভীতি কি নিছকই কুসংস্কারের ফল? তা কিন্তু নয়। এই ভয়ের খানিকটা সত্যিকার ভিত্তিও আছে। উপরোক্ত মহিলাদের মধ্যে কারো কারো এ-রকম ধারণা আজও দেখা যায় যে হাসপাতালে ভর্তি হলে মানুষ নাকি আর ফেরে না। অর্থাৎ, মারা যায়। আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে এই কলকাতারই বহু পরিবারে মেয়েদের মুখে এ-রকম কথা হামেশা শোনা যেত। কথাটা নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা বাড়িয়ে বলা। কিন্তু এ-রকম ধারণার ভিত্তি কি? এর ভিত্তি হল, ইংরেজের অধীনস্থ ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের তদানীন্তন স্বাস্থ্যদপ্তর ও হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় ঔদাসীন্য, হাসপাতাল-পরিচালনায় অব্যবস্থা, হাসপাতালগুলিতে অত্যধিক মৃত্যু-হার, ইত্যাদি। অবশ্য এই মৃত্যুর হার অত্যধিক হওয়ার জন্যে যে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও অব্যবস্থাই সে যুগে একমাত্র দায়ী ছিল তাও নয়। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও সন্তানপ্রসবের পর ছোঁয়াচ লেগে অন্য রোগের জীবাণুর সংক্রমণই ছিল সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার। সেযুগে উপযুক্ত জীবাণুনাশক ওষুধের অভাবে রোগজীবাণুর সংক্রমণের ফলে সন্তানপ্রসবের পর নানা জটিলতার সৃষ্টি হওয়াটা ছিল খুবই ব্যাপক ঘটনা। এবং তখন হাসপাতালগুলি ছিল এইভাবে রোগ-সংক্রমণের কেন্দ্রবিশেষ। কেননা সেখানে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সন্তানসম্ভবা ও সদ্য-প্রসূতির প্রায়-পাশাপাশি নানা ধরনের ছোঁয়াচে রোগেরও চিকিৎসা করা হত অথচ রোগ-সংক্রমণ নিরোধের কোনো নিশ্চিত ব্যবস্থা তেমন জানা ছিল না। ফলে সেযুগে বাড়ির চেয়েও হাসপাতালগুলিতে প্রসূতি ও নবজাত শিশু-মৃত্যুর হার ছিল অতিরিক্তরকম বেশি।

কিন্তু মা-ঠাকুমাজাতীয় বয়স্ক মহিলারা আজও যদি সেই ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো ধারণা নিয়ে বসে থাকেন তো তাঁদের আমরা বলতে পারি, যুগ অনেক পালটেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে, হাসপাতাল-পরিচালনায় অব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশের জনমত

প্রবলতর হয়েছে, দেশের গভর্নমেণ্টও হাসপাতালগুলির উন্নতিবিধানে মনোযোগী হয়েছেন। ফলে, এখনো পর্যন্ত নানা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে আমাদের হাসপাতালগুলির অবস্থা আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে বলা চলে। তাছাড়া, প্রসূতিদের জন্যে স্বতন্ত্র বিশেষ ধরনের হাসপাতাল বা প্রসূতিসদনও আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় গড়ে উঠেছে। এবং এর চেয়েও বড় কথা, বর্তমানে রোগজীবাণুব সংক্রমণেব উপযুক্ত প্রতিষেধক সাল্‌ফা-জাতীয় ও অ্যান্টি-বায়োটিক (পেনিসিলিন, ইত্যাদি) গ্রুপের ওষুধের আবিষ্কার চিকিৎসাব জগতে যুগান্তব ঘটিয়ে দিয়েছে। আজ আর তাই সন্তানপ্রসবেব পর রোগজীবাণুব সংক্রমণঘটিত জটিলতাসৃষ্টি মোটেই আগের মতো ভয়াবহ ব্যাপাব নয়।

উল্টো, আজকাল প্রসবান্তে প্রসূতিব পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে অতিবিক্ত বক্তপাত। যদিও খুব সম্প্রতি এ-ব্যাপাবটিও আর আগেকার মতো অতোটা ভয়াবহ নেই, তবু এখনো পর্যন্ত রোগ-জীবাণু সংক্রমণের বিপদ যতোটা কমানো সম্ভব হয়েছে এ-ভয়টি ততোটা নয়। এবং মনে বাখা দবকার, সন্তানপ্রসবের পরবর্তী এই রক্তপাত এবং গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন আবো নানাবকম জটিলতার সুচিকিৎসা বাড়িতে বসে মোটেই সম্ভব নয়। তার জন্যে বিশেষ দরকাব আধুনিক হাসপাতালের নানাবিধ সুযোগসুবিধা, সেখানকার অপারেশন-রুম ও ব্লাড ব্যাঙ্কের সাহায্য।

পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার অবস্থা থেকে এখন পরিস্থিতি তাই দাঁড়িয়েছে উল্টো। হাসপাতালে সন্তানপ্রসব আজকাল বাড়িতে ছেলে হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। এখন বরং বাড়িতে প্রসবের ফলে প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর হার হাসপাতালে সন্তানপ্রসবের পরবর্তী মৃত্যুহারের চেয়ে অনেক বেশি।

অতএব সুযোগসুবিবা থাকলে বাড়ির চেয়ে হাসপাতালে সন্তান-প্রসবের ব্যবস্থা করা সর্বপ্রকারেই ভালো ও নিরাপদ বলে জানবেন।

এই "সুযোগসুবিধা"-র কথায় আরো একটি গুরুতর প্রসঙ্গ এসে পড়ল। এ-বিষয়টি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করার সুযোগ মেলেনি, অথচ বিষয়টি একটি গোড়াকার প্রশ্ন। সেটি হল আমাদের দেশে হাসপাতালের অভাব। ইংরেজ-আমলে গভর্নমেণ্ট অন্যান্য বহু ব্যাপারের মতো আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও একান্ত উদাসীন ছিল, ফলে দেশে হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ভয়াবহরকম কম। আবার এই স্বল্পসংখ্যক হাসপাতালের মধ্যেও কিছু ছিল বেসরকারী, জনসাধারণের দানে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া এই হাসপাতালগুলির সবই ছিল কলকাতা ও বড় বড় জেলা শহরগুলিতে। ফলে গ্রামে-গাঁথা আমাদের এই বাংলাদেশের শতকরা প্রায় আশিজন লোক দীর্ঘকাল হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসা করানো ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের মা-ঠাকুমাদের কারো কারো মনে যে দৃঢ়মূল বিতৃষ্ণার কথা এর আগে বিস্তারিতভাবে বলেছি—তাহলে দেখা যাচ্ছে—তার মূলে শুধুমাত্র কুসংস্কার বা বাস্তব ভয়ই নেই, সুযোগের অভাব থেকে সঞ্জাত কৌতূহলের অভাব, কিংবা অনভ্যস্ততার ফলে জাত অনিচ্ছাও সে-বিতৃষ্ণার পিছনে অনেকখানি কাজ করেছে। অবশ্য ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ভারত ও রাজ্য গভর্নমেণ্টের যত্নে দেশে হাসপাতালের সংখ্যা বেশ কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে মহকুমায় মহকুমায়, কল-কারখানা অঞ্চলে ও এমন কি গ্রামাঞ্চলেও কোথাও কোথাও ইতিমধ্যে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে কিংবা উঠছে। ফলে দেশের জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ বর্তমানে হাসপাতালের সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বললে ভুল হবে না যে দেশের বিশাল প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতালের বর্তমান সংখ্যা এখনও যথেষ্ট কম।

অর্থাৎ, আমাদের দেশে শহর ও গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা আজ পর্যন্তও হাসপাতালে ও অভিজ্ঞ

ডাক্তারের সাহায্যে সন্তানপ্রসবের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ-ধরনের মেয়েদের কাছে ডাক্তার বা হাসপাতাল-নির্বাচনের প্রশ্নটি শুধু অবান্তরই নয়, হাস্যকরও বটে।

কিন্তু এঁরা ছাড়াও শহর ও গ্রামাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বেশি সঙ্গতিপন্ন (এঁরা সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) পরিবারের ও কিছু কিছু কলকারখানা অঞ্চলেব অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক-কারিগর ঘরের মেয়েরা বর্তমানে (অন্তত আগের চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণে) হাসপাতালে সন্তানপ্রসবের সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন। অথচ এঁদের অনেকের পক্ষে হয়তো আলাদা ভাবে ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পবামর্শ নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে নির্বাচনেব সুবিধা থাকলে, প্রথমে হাসপাতাল নির্বাচন করাই এঁদের পক্ষে সমীচীন হবে। তাবপব ওই হাসপাতালেই সন্তানপ্রসবের সময় ভর্তি হবেন এই মর্মে দবখাস্ত করে কিংবা আংশিকভাবে টাকা জমা দিয়ে হাসপাতালে নিয়মিত নিজেকে পরীক্ষা কবানোব জন্যে কার্ড করিয়ে নিতে হবে। এই সময়েই প্রসূতিকে স্থিব করতে হবে, তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের কোন্ ডাক্তাবের পরামর্শাধীনে থাকতে চান। অবশ্য ডাক্তার মনোমতো না হলে পবে নাম বদলে নিয়ে অন্য কোনো ডাক্তারেব চিকিৎসাধীনেও থাকা চলে।

হাসপাতাল কি প্রসূতি-সদন কি নার্সিং হোম—যাই হোক না কেন—নির্বাচন করতে হলে (অবশ্য যদি নির্বাচন সম্ভব হয়, অর্থাৎ যদি কাছাকাছি ওই ধবনেব একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহলে) প্রথমেই দেখা দরকার প্রতিষ্ঠানটি আপনার বাড়ির কাছাকাছি কিনা। "কাছাকাছি" বলতে বোঝাতে চাইছি, আপনার বাড়ি থেকে হাসপাতাল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছনো যায় কিনা। সময় এর চেয়ে কম লাগলে অবশ্যই ক্ষতি নেই কিন্তু বেশি লাগলে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। বাড়ি থেকে হাসপাতালের দূরত্ব বেশি হলে বহু স্বামী-স্ত্রীর বেলায়ই তা ঝঞ্ঝাট ও বিরক্তিব কারণ হয়ে দেখা দেয়। সবচেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট হল প্রসববেদনা দেখা দিলে স্ত্রীকে সময়মতো

হাসপাতালে স্থানান্তর করা। অবশ্য সাধারণত প্রসবের আগে মেয়েরা বেশ কয়েক ঘণ্টা যন্ত্রণা-ভোগ করে থাকেন, ফলে সময়মতো সাবধান হলে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হয় না। কিন্তু মেয়েটি যদি প্রথম প্রসূতি না হন কিংবা তাঁর প্রথম সন্তান অস্বাভাবিকরকম অল্প সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এমন পূর্ব-ইতিহাস থেকে থাকে, তাহলে এমন কি বাড়ি থেকে হাসপাতালের ওই এক ঘণ্টার দূরত্বেও মুশ্‌কিলে পড়তে হতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রে যদি আরো কাছাকাছি কোনো হাসপাতাল থাকে তো সেখানেই ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে, আর তা না থাকলে প্রসববেদনার সূচনা দেখা দেওয়া মাত্রই আগে থেকে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। কেননা বাড়ি থেকে হাসপাতালের পথে রাস্তায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার মতো ঘটনাও একেবারে বিরল নয়।

আর যদি ইতিপূর্বেই কোনো ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আপনাব তত্ত্বাবধানের জন্যে নির্বাচন করে থাকেন তো হাসপাতাল বা প্রসূতি-সদন কিংবা নার্সিং হোম ইত্যাদি নির্বাচনেব ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা সবচেয়ে ভালো। তিনিই সব দিক বিবেচনা করে আপনার মনোমতো প্রসূতি-প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে দিতে পারবেন।

আমাদেব হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণত ফ্রি (free) ওয়ার্ড, পেয়িং (paying) ওয়ার্ড ও স্বতন্ত্র কেবিনের (cabins) বন্দোবস্ত থাকে। ফ্রি-ওয়ার্ডে সাধারণত মূল্যবান ওষুধ ইত্যাদি কিনে দেওয়া ছাড়া থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসা ইত্যাদির যাবতীয় ব্যবস্থা বিনা পয়সায় করা হয়। পেয়িং ওয়ার্ডে থাকা-খাওয়া ও চিকিৎসাব খরচ বাবদ কিছু টাকা দিতে হয়, তাছাড়া দামী ওষুধপত্রও রোগিণীর পরিবারকে কিনে দিতে হয়। তবে পেয়িং ওয়ার্ডে থাকা ও চিকিৎসাবাবদ হাসপাতালের ফি-র পরিমাণ মোটামুটি আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয়-ক্ষমতার সীমার মধ্যেই থাকে। ফ্রি ও পেয়িং ওয়ার্ডে এক ঘরে একাধিক রোগীকে (আমাদের দেশে

বিশেষ করে ফ্রি-ওয়ার্ডে ঠাসাঠাসি করে বহু রোগীকে) থাকতে হয়। এ-ছাড়া যে-সব রোগিণী বা প্রসূতি একা থাকতে চান তাঁদের জন্যে স্বতন্ত্র কেবিনের ব্যবস্থা। এইসব কেবিনে থাকা ইত্যাদির খরচ সাধারণত পেয়িং ওয়ার্ডের বেডের চেয়ে অনেক বেশি। কিছু কিছু হাসপাতালে ও নার্সিং হোমগুলিতে এই খরচ এত বেশি যে তা বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধ্যের বাইরে।

হাসপাতালে স্থান বা খালি বেড আছে কিনা, ভিজিটিং আওয়ার (visiting hours) ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা কিরকম এবং সর্বোপরি সেখানকাব বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড ও কেবিনের খরচখরচা কি ও প্রসূতি ও তাঁব পবিবাবের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে তা কেমন খাপ খায় ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করে তবেই হাসপাতাল নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিক ডাক্তারি পরীক্ষা

একবার আপনার মনোমতো ডাক্তার নির্বাচন করা হয়ে গেলে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর জীবনের দশ থেকে বারো মাস আপনাব স্বাস্থ্যের জন্যে প্রধানত ডাক্তারবাবুই দায়ী। কাজেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ও তার পরেও কিছুকাল আপনার শরীরে যে-কোনো উপসর্গ বা অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিক না কেন তার সঙ্গে গর্ভাবস্থার বা সন্তানপ্রসবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে নিজমনে গবেষণা না কবে প্রথমেই ডাক্তারবাবুকে সেকথা জানান, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করুন। ডাক্তারবাবুই সে-ব্যাপারে আপনাকে সবচেয়ে সুপরামর্শ দিতে পারবেন।

ডাক্তারবাবুর কাছে কোনো কিছু গোপন করার চেষ্টা করবেন না। তাঁকে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সম্পর্কে সব কিছু ভালোভাবে জানতে চাইবেন। প্রথমবার তাঁব কাছে গেলে তিনি আপনার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা, এবং

আগে কখনো কোনো অসুখবিসুখ হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে সে-সম্পর্কে ও তার চিকিৎসার ব্যাপারে পুরো তথ্য—অর্থাৎ আপনার স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বর্তমান ও পূর্ব-ইতিহাসটি জানতে চাইবেন। খোলা মন নিয়ে, অহেতুক লজ্জাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক-ঠিক ও বিস্তারিত উত্তর দিন।

আপনার শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা কি—ডাক্তারবাবুর পক্ষে তা জানা সবিশেষ প্রয়োজন। স্বাভাবিক অবস্থাটি জানলে পরেই অস্বাভাবিক কোনো কিছুর প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র তিনি তা ধরতে পারবেন। আর তা ধরতে পারলেই দ্রুত ও ঠিক-ঠিক চিকিৎসা চালানো সম্ভব হবে। একথা ভুলেও মনে করবেন না যে সাধারণ অবস্থায় শরীরে যে-সমস্ত ছোট-বড় রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বুঝি আপনা-আপনি তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়! আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। অন্তঃসত্ত্বা নারীর আপনা থেকে রোগের আক্রমণ এড়ানোর কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। সে-অবস্থায় কোনো কোনো সময়ে এমন-এমন রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে যার চিকিৎসার জন্যে অন্য রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেরও ডাকতে হতে পারে।

প্রথমবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে তিনি আপনার সম্পর্কে কী কী জানতে চাইবেন?—প্রথমত, অতীতে আপনার যা কিছু অসুখবিসুখ, অস্ত্রোপচার বা অপারেশন ও দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক আপদবিপদ যা কিছু ঘটেছে তার পুরো তথ্য বা ইতিহাস ডাক্তারবাবু জানতে চাইবেন। শরীরে এমন-এমন রোগ বা তজ্জনিত ফলাফল দীর্ঘদিন, এমন কি চিরকাল, বর্তমান থেকে যায় গর্ভাবস্থায় যেগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত সাবধানতা ও ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে তা ফের জোর পেয়ে চাগিয়ে উঠতে পারে। এবং ডাক্তারবাবুকে প্রসূতির এই ধরনের অসুখবিসুখ সম্পর্কে আগে থাকতে সতর্ক হতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরুন, একটি মেয়ের পেটে আগে কোনো এক সময়ে কোনো কারণে অস্ত্রোপচার হয়েছিল।

এবং সে-সময়ে পেটের ক্ষুদ্রান্ত্রের (খাদ্য-পরিপাকযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি নলীর) একটি অংশ কোনো কারণে জরায়ুর (জননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সন্তানবহনের অঙ্গ) গায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। এতদিন হয়তো এতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গর্ভস্থ সন্তান ধীরে ধীবে বেড়ে ওঠার সঙ্গে জরায়ু নামের অঙ্গটিও বড় হয়ে উঠল, ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্ম বাধা পেতে লাগল, খাদ্য-পরিপাকে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হল। কিন্তু যে-ডাক্তারবাবু মেয়েটির তত্ত্বাবধান করছেন তিনি যদি ঐ অস্ত্রোপচারের ইতিহাস না জানেন তাহলে তাঁর পক্ষে শুধুমাত্র মেয়েটির বমি ও গা-বমির ভাব দেখে কিছুতেই বোঝা সম্ভব হবে না যে ভিতবে এ-রকম একটি গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছে - কেননা বমি ও গা-বমির ভাব অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একটি অতি স্বাভাবিক উপসর্গ। ফলে সময়মতো চিকিৎসাও হবে না এবং এর ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে।

এছাড়া ডাক্তারবাবুব পক্ষে আপনার পারিবারিক—মানে, পিতৃকুলের—স্বাস্থ্যের ইতিবৃত্তও আনুপূর্বিক জানা দবকার। কেননা পরিবারে যদি বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস্-এর মতো রোগের ইতিহাস থেকে থাকে তাহলে গর্ভিণীব শরীবে এই সময়েই তা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করতে পারে। অতএব এ-সম্পর্কে আগে থাকতে সাবধান হওয়া দরকার।

প্রথমত প্রসূতির স্বাস্থ্যের পূর্ব-ইতিহ।স জানা, তারপর বর্তমান স্বাস্থ্য পরীক্ষা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা মানে যেমন-তেমন পরীক্ষা নয়, একেবারে পায়ের নখ থেকে মাথাব চুল অবধি পরীক্ষা। শরীরের ওজন, চোখ, নাক, গলা, থাইরয়েড গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড, দুটি ফুসফুস, প্রস্রাব, রক্ত ও রক্তচাপ সব কিছু ভালো কবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা। এমন কি শরীরে রক্তাল্পতা-দোষ আছে কিনা দেখার জন্যে রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন-এর পবিমাণ পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়।

একটা কথা। ডাক্তারবাবুব পক্ষে আপনার স্তনেব গঠন ও ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করা এবং সারা গর্ভাবস্থাকাল জুড়ে মাঝে মাঝে এদের

আকৃতি ও অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। চিকিৎসক মহিলা হলে তো কথাই নেই, অন্য ক্ষেত্রেও এটি সম্ভব কিনা প্রসূতি যেন বিবেচনা করে দেখেন। এ-পরীক্ষার গুরুত্ব কতখানি সে-সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি। এই প্রাথমিক ডাক্তারি পরীক্ষায় আপনার শরীরে রক্তাল্পতা কিংবা অন্য যা যা ত্রুটি ধরা পড়বে, ডাক্তারবাবু সেই অসুখগুলি নিবাময় করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এ-পরীক্ষায় বাধা দিলে কিংবা রোগ গোপন করলে ভবিষ্যতে সেজন্যে বিপদে পড়তে হতে পারে। অতএব ডাক্তাববাবুর সঙ্গে রোগ-পরীক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক।

অন্তঃসত্ত্বা নারীর রক্তপরীক্ষা একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বিশেষ করে শরীবে গুপ্তভাবে কোনো যৌনব্যাধি আছে কিনা রক্তপরীক্ষা করে আগে থাকতে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। এরকমটি হওয়া খুবই সম্ভব যে, কোনো মেয়ে সিফিলিস্ বা উপদংশ নামের যৌনব্যাধি দ্বাবা আক্রান্ত অথচ তিনি নিজেই তা জানেন না। এক্ষেত্রে রক্তপরীক্ষায় যদি রোগ ধরা পড়ে এবং গর্ভাবস্থায়ই মেয়েটির যদি ঠিকমতো চিকিৎসা চলে ও তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান সুস্থদেহে ভূমিষ্ঠ হবে। আর তা না হলে, গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে মাতৃদেহ থেকে প্লাসেণ্টা বা গভফুল মারফত সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা এবং শিশুটি হয়তো একদিন জন্মগত সিফিলিস নিয়েই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবে।

এছাড়া এ-সময়ে আরো এক ধরনের বক্তপরীক্ষা করা হয়। একে বলা হয় রক্তের শ্রেণীবিচাব ও আব-এচ্ ফ্যাক্টব (Rh factor) নির্ধারণ। গর্ভাবস্থায় কিংবা প্রসবকালীন সময়ে একমাত্র প্রসূতির দেহে অন্য কারো দেহ কিংবা ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্তদানের প্রয়োজন পড়লে তবেই এই পরীক্ষাটি কাজে লাগে, অন্যথা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কিছু প্রয়োজনে আসে না। তবু ভবিষ্যতে প্রয়োজনে লাগতে পাবে এই আশঙ্কায় এটি সর্বক্ষেত্রেই করিয়ে রাখা ভালো।

আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রসূতিরাই নবজাত শিশুদের স্তন্যদান করে থাকেন। এর জন্যে ভাড়া-করা ধাত্রী (ইংরেজিতে যাকে বলে wet nurse) রাখার কিংবা বোতলজাত কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর রীতি এখনো এদেশে বিশেষ চালু হয়নি। এ-কারণে ডাক্তারবাবুর পক্ষে অন্তঃসত্ত্বা নারীর স্তনের ক্রমবিকাশ ও স্তনাগ্রের বিশেষ গঠনটি লক্ষ্য করা দরকার। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার একেবারে শেষের কয়েকটি সপ্তাহে তিনি প্রসূতিকে বুঝিয়ে দিতে পারেন কিভাবে স্তনদ্বয় ও স্তনাগ্রগুলি ভাবী জাতকের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে।

ডাক্তারবাবু প্রসূতির শরীরের শিরাগুলির বিশেষ প্রকৃতিও পরীক্ষা করে দেখবেন। এই পরীক্ষা প্রসূতির শরীরে শিরাস্ফীতি কিংবা অর্শের প্রবণতা আছে কিনা দেখার জন্যে প্রয়োজন। এবং এ-রকম কোনো প্রবণতা দেখা গেলে তা কমানোর উপায় কি ডাক্তারবাবু সে-সম্পর্কে প্রসূতিকে পরামর্শ দেবেন।

বেশির ভাগ প্রসূতি প্রথমবার ডাক্তারের কাছে গিয়েই জানতে চান তাঁদের সুপ্রসবের সম্ভাবনা কতদূর বা সুপ্রসব হবে কিনা। তাঁদের জানা দরকার যে গর্ভসঞ্চারের এত প্রাথমিক অবস্থায় উপরোক্ত তথ্যটি খুব নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেননা এটি নিশ্চিত করে বলতে গেলে যে-ধরনের আভ্যন্তরীণ মাপজোক নেওয়া দরকার, এ-সময়ে তা সম্ভব হয় না। তবে এ-সময়ে বাইরে থেকে প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের (pelvis) যে মাপজোক নেওয়া হয় তা থেকে—অর্থাৎ বস্তি-অংশের হাড়ের কাঠামোর গঠন ও প্রশস্ততার পরিমাণ থেকে—সুপ্রসব হবে কিনা এ-সম্পর্কে মোটের ওপর খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে।

কিন্তু বস্তি-প্রদেশের আভ্যন্তরীণ মাপজোক সম্ভব না হলেও, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাতেই আভ্যন্তরীণ ডাক্তারি পরীক্ষাটি নিষ্পন্ন হওয়া দরকার। এই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলে প্রসূতির জরায়ুর আয়তন ও অবস্থান সম্পর্কে ডাক্তারবাবুর পরিষ্কার

ধারণা জন্মাবে। এর ফলে পরে যদি কখনো গর্ভপাতের আশঙ্কা দেখা দেয় তখন ডাক্তারবাবুর পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে ইতিমধ্যে জরায়ুর আয়তন কতটা বেড়েছে এবং গর্ভপাত সত্যিই ঘটবে কিনা। এছাড়া এ-পরীক্ষার ফলে প্রসূতির স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সম্ভাব্য অনেক বিপদ-আপদেব কথা আগে থেকেই আন্দাজ করা যায়।

এইভাবে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলে পর, সাবা গর্ভাবস্থাকাল ধরে আপনি কিভাবে চলবেন সেই সাধাবণ নিয়মগুলি ডাক্তারবাবু আপনাকে জানিয়ে দেবেন। যদি আপনার শরীরে কোনো বিশেষ ধরনের অপূর্ণতা বা অসুখবিসুখ পাওয়া যায় তাহলে তিনিই সেই সাধাবণ নিয়মের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় অদলবদল করে দেবেন। গা-বমির ভাব আপনাব কতখানি আছে তাব ওপর আপনার ওষুধ ও পথ্যতালিকা কী রকম হবে তা নির্ভব করছে।

পরিশেষে ডাক্তাববাবু হয়তো আপনাকে বলবেন যদি আপনার কিছু জানবার থাকে তো তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে। এ-সময়ে এবং এর পরে যখনই আপনি ডাক্তাববাবুকে দেখাতে আসবেন তখনই আপনার যা-কিছু জানবাব থাকবে বা আপনি যা-কিছু অসুবিধা বোধ করবেন বিনা দ্বিধায় তা তাঁকে জানাবেন। এ-সময়ে কোনো কিছু চেপে গেলে ভবিষ্যতে গুরুতর কষ্টভোগ ও ক্ষতিব সম্ভাবনা আছে জানবেন।

এই তো গেল ডাক্তারবাবুব সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎকারের বিববণ। এব পরবর্তী পবীক্ষাগুলির জন্যে অবশ্যই এই প্রথম পরীক্ষার মতো অত সময় লাগবে না। তবে প্রতিবারেই ডাক্তার দেখাতে এলে আপনার ওজন নেওয়া হবে, রক্তের চাপ পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং প্রস্রাব পবীক্ষা করা হবে। তাছাড়া অন্যান্য ডাক্তারি ও বিজ্ঞানাগারিক পরীক্ষাগুলিও সময়মতো করা হবে। এছাড়া প্রতিবারই ডাক্তাববাবু হয়তো বাইরে থেকে আপনার পেট পরীক্ষা কবে দেখবেন গর্ভস্থ ভ্রূণ ঠিকমতো বেড়ে উঠছে কিনা।

যদি কোনো অস্বাভাবিক উপসর্গ না দেখা দেয় তাহলে গর্ভাবস্থার

প্রথম সাত মাস মাসে একবার করে ডাক্তার দেখানোই যথেষ্ট হবে। কেবল আট মাসে দু-সপ্তাহ অন্তর ও ন-মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে ডাক্তার দেখানো বাঞ্ছনীয়।

"যন্ত্রণাহীন" প্রসব ও "স্বাভাবিক" প্রসব

ইওরোপ ও আমেরিকা-ভূখণ্ডে ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ও প্রসূতিদের মধ্যে আজকাল দুটি বিষয় নিয়ে খুব হৈ-চৈ চলছে, দেখা যায়। বিষয় দুটি হল "যন্ত্রণাহীন" প্রসব ও "স্বাভাবিক" প্রসব। এখন এই বিষয় দুটি নিয়ে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

"যন্ত্রণাহীন" প্রসব ব্যাপারটা কি? আধুনিক রসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মর্ফিন, ক্লোরোফর্ম, নাইট্রাস অক্সাইড, ট্রাইলিন ইত্যাদি এমন সব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্যে রোগীর যন্ত্রণা-বোধ লোপ করে দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়ানো কিংবা অজ্ঞান করে ফেলা সম্ভব। আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসায় ও খুব বেশি যন্ত্রণাদায়ক অসুখবিসুখে এই সব ওষুধ সাধারণত ব্যবহার করা হয়। এখন, খুব বিবেচনাসহ-কারে ব্যবহার কবলে এ-সব ওষুধ সন্তানপ্রসবেব সময় প্রসূতির ওপরও প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ইওরোপ ও আমেরিকায় ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একদল প্রতিটি প্রসবের ক্ষেত্রেই এ-ধরনের ওষুধ প্রসববেদনা শুরু হওয়ার সময় থেকে এমনভাবে ব্যবহার করে থাকেন যার ফলে প্রসূতি সন্তানপ্রসবের যন্ত্রণা প্রায় অনুভব করেন না বলা চলে। ফলে কিছু কিছু মেয়েমহলে এই ধরনের "ধন্বন্তরী" ধাত্রীবিদের ভয়ানক নামডাক। এঁরা বলেন, যে-ডাক্তাব প্রসূতিকে প্রসববেদনা ভোগ করতে দেয় সে কি মানুষ, সে তো মধ্যযুগীয় বর্বর!

কিন্তু ওই আমেরিকা ও ইওরোপেই আবার এই উপরোক্ত আন্দোলনের পাল্টা আরেক ধরনের আন্দোলন শুরু হয়েছে। এর নাম "স্বাভাবিক" প্রসব আন্দোলন। এর প্রবক্তা ডাক্তাররা বলেন যে কোনো কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার বা গণ্ডগোল ঘটলে শরীরে

তার যে লক্ষণ বা সংকেত প্রকাশ পায় তারই নাম হল যন্ত্রণা। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে সন্তানপ্রসব তো অতি স্বাভাবিক ও ন্যায্য একটি ব্যাপার, কাজেই অতিবিক্তরকম প্রসববেদনা অনুভব করাটাই অযৌক্তিক। সম্ভবত, এই অতি স্বাভাবিক সন্তানপ্রসবের ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রসূতিব মনে অযথা অতিরিক্ত ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে এবং তাঁকে উপযুক্ত পবিমাণে শারীরিক পরিশ্রম না করতে দিয়ে ও তাঁর উপযুক্ত খাদ্যেব ব্যবস্থা না কবে আমাদেব এই সমাজ ও সভ্যতাই নানা জটিলতার সৃষ্টি করে, যাব ফলে প্রসূতিব দেহমনে এত বেশি যন্ত্রণা ও অসহিষ্ণুতাব লক্ষণ দেখা যায়। কাজেই এই আন্দোলনের প্রবক্তাবা সন্তানপ্রসব নামেব স্বাভাবিক ব্যাপাবটি ও তার সমস্ত খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রসূতিকে ওয়াকিবহাল কবে তুলে প্রকৃত জ্ঞানের সাহায্যে প্রসূতিব মনে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলাব পক্ষপাতী। এটা ঠিকমতো সম্ভব হলেই—এঁবা বলেন—প্রসূতি যে শুধু যন্ত্রণাব সঙ্গে যুঝতে পাববেন তাই নয়, সমগ্র সন্তানপ্রসব ব্যাপাবটিই তাঁব কাছে সুখদায়ক অনুভূতি হয়ে দাঁড়াবে। যে সব প্রসূতি ওদেশে এই "স্বাভাবিক" প্রসবেব পক্ষপাতী তাঁবা আবার "যন্ত্রণাহীন" প্রসবের প্রবক্তা ডাক্তাবদেব হাতুড়ে বলে ব্যঙ্গ করে থাকেন।

ওদেশে যাঁবা বিচক্ষণ ও স্থিতধী চিকিৎসক তাঁবা যদিও শেষোক্ত "স্বাভাবিক" প্রসব আন্দোলনকে মোটেব ওপব সঠিক ও সমর্থন-যোগ্য বলে মনে কবেন, তাঁদেব মত এই যে ওই দু-ধরনেব পদ্ধতির মধ্যেই বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে। এঁরা যে সন্তানপ্রসবের সময় সর্বক্ষেত্রেই যন্ত্রণা-লাঘবকাবী ও ঘুমের ওষুধ প্রয়োগের বিপক্ষে তা নয়। বরং এঁদেব মধ্যে অনেকেই বিচাব-বিবেচনা করে ও সতর্কতা অবলম্বন করে প্রয়োজনমতো এ-ধরনের ওষুধ ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। তবে এঁবা বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যন্ত্রণা লাঘব করতে গিযে কোনোক্রমেই প্রসূতির নিরাপত্তা বিপন্ন কবলে চলবে না। অর্থাৎ যন্ত্রণা কমাতে গিয়ে প্রসূতির জীবন বিপন্ন

হলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। এঁরা মনে করেন, প্রসব-বেদনার একেবারে গোড়ার দিকে এরকম যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ দেওয়া অনুচিত। কারণ এ-সময়ে প্রসূতির জরায়ুর মাংসপেশীতে আক্ষেপ বা সংকোচন হয় মৃদু মৃদু এবং এ-বেদনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে এমন কিছু শক্ত নয়। অথচ এত প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধ পড়লে পরে ক্রমশ যখন যন্ত্রণার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে তখন ওষুধের মাত্রাও ক্রমশ চড়িয়ে যেতে হবে। ফলে, শেষকালে যখন জরায়ুব আক্ষেপ প্রবল বা চরম হয়ে উঠবে এবং যন্ত্রণা কমানোর ওষুধের প্রয়োজন যখন সত্যিই হবে, তখন হয়তো দেখা যাবে সে-যন্ত্রণা কমাতে গেলে যে-পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগ করা দরকাব তা ব্যবহার করলে প্রসূতির পক্ষে বিপদ ঘটবাব সম্ভাবনা। তখন ডাক্তারকে একটি গুরুতর উভয়সংকটের মুখে পড়তে হবে: যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে হয় প্রসূতিকে সেই অসহ্য বেদনা ভোগ করতে দেওয়া, আর নয়তো ওষুধের মাত্রা নিরাপদ সীমা ছাড়িয়ে এতটা চড়িয়ে দেওয়া যাতে প্রসূতির কিংবা গর্ভস্থ ভ্রূণের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। অতএব এ-ব্যাপারে বিদেশের বিচক্ষণ ডাক্তারদের মত হল এই যে, প্রসব-বেদনার কোনো ক্ষেত্রে কিংবা কোনো অবস্থাতেই যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ যে ব্যবহাব করা উচিত নয় এমন মতামত ঠিক নয়। কেননা অস্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে—যেখানে প্রসব করানোর জন্যে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, কিংবা এমন কোনো জায়গায় যেক্ষেত্রে প্রসূতি সন্তানপ্রসবের সময় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং যেখানে ওই যন্ত্রণাটাই প্রসূতিব পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে ওঠে, কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসবযন্ত্রণার একেবারে শেষের দিকে যন্ত্রণার তীব্রতা নিতান্ত বৃদ্ধি পেলে—ডাক্তাররা যন্ত্রণা কমানোর বা ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার না করতে চাওয়াটা নিছক গোঁড়ামি ও গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছু নয় এবং এতে বিপদের আশঙ্কাও সমধিক। তবে ওষুধ ব্যবহার করবার সময় সর্বদা এটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওষুধের মাত্রা যেন এতখানি চড়ে না যায়

যাতে প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। চিকিৎসকের চেষ্টা হওয়া উচিত প্রথমত প্রসূতির এবং দ্বিতীয়ত গর্ভস্থ শিশুর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা ; একমাত্র তার পরেই প্রসূতির শারীরিক আরাম ও যন্ত্রণাহীন প্রসবের প্রশ্ন ওঠে।

আমাদের দেশে অবশ্য এখনো পর্যন্ত এ-সমস্ত আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছয়নি। তাছাড়া এ-দেশের অসংখ্য প্রসূতি আজো সন্তান-প্রসবের সময় নিতান্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, হাসপাতাল ও ওষুধের সাহায্যটুকুই পান না, প্রসবকে "যন্ত্রণাহীন" করা তো তাঁদের কাছে স্বপ্নবিলাস। আর যাঁরা এসব সাহায্য পান তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশের স্বভাবজাত সহনশীলতা এমন আশ্চর্য বেশি যে স্বাভাবিক প্রসবেব ক্ষেত্রে যন্ত্রণা-লাঘবকাবী ওষুধেব ব্যবহাব আমাদের দেশে খুবই সামান্য বলা চলে। সুখেব কথা, "যন্ত্রণাহীন" প্রসব সম্পর্কে বাড়াবাড়িবকম আগ্রহও এ-দেশে তেমন দেখা যাচ্ছে না। আশা কবি এই সুস্থ মনোভাব আমাদেব প্রসূতিদেব মধ্যে বজায় থাকবে। আমাদেব ধাত্রীবিৎ চিকিৎসকবাও এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট সতর্কতা ও বিচক্ষণতাব সঙ্গে ক্ষেত্র বিবেচনা কবে এ-সমস্ত যন্ত্রণা-উপশমকাবী ওষুধ প্রয়োগ কবে থাকেন আবাব কোনো অবস্থাতেই ওষুধ না-দেওয়াব মতো গোঁড়ামিও তাঁবা দেখান না। এ-সমস্তই শুভ লক্ষণ।

তিন | গর্ভাবস্থার ক্রমবিকাশ

গর্ভধারণ-কালের স্থায়িত্ব

গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হবে কবে ?—মনে রাখবেন, সকলের বেলাতেই হুবহু মিলে যাবে গর্ভকালের এমন কোনো বাঁধাধরা সময় নেই, প্রসবেরও এমন কোনো ঘড়িধরা দিনক্ষণ নেই। তবে এ-ব্যাপারে বহুকালের প্রচলিত একটা গণনা-রীতি আছে, তা থেকে শিশু কবে নাগাদ ভূমিষ্ঠ হতে পারে মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। সে-গণনার ভিত্তি হল এই যে, মেয়েদের গর্ভকাল সাধারণত ২৮০ দিন স্থায়ী হয় এবং ধরেই নেওয়া হয় শেষ যেবার মাসিক ঋতুস্রাব হয়েছে তার অল্প কয়েকদিনেব মধ্যেই গর্ভসঞ্চার ঘটেছে। এই গণনাটি অতি সহজসাধ্য : অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির গর্ভসঞ্চারের ঠিক আগে শেষ যেবার ঋতুস্রাব হয়েছে সেই ঋতুস্রাবেব প্রথম দিনটি স্মরণ করুন। সেই তারিখটির সঙ্গে যোগ দিন সাত দিন এবং তাব সঙ্গে ফের পুরো একটি বছর বা বারো মাস যোগ করুন। এখন যে-তারিখটি পেলেন তা থেকে তিনটি মাস বাদ দিন। এবাব আপনি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার তারিখটি পেয়ে গেলেন।

একটি উদাহরণ দিলে গণনাটি আবো পরিষ্কার হবে। ধরুন, কোনো অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের গর্ভসঞ্চারের আগে শেষবার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়েছিল ২০শে অক্টোবর, ১৯৫৯ সালে। তাহলে ঋতুস্রাবের প্রথম দিনটি হল—২০শে অক্টোবর। এখন এর সঙ্গে সাত দিন যোগ দিন—পেলেন ২৭শে অক্টোবর, ১৯৫৯। এবার যোগ করুন পুরো বারোটি মাস—হল ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬০। এরপর এ-থেকে গুনে গুনে তিনটি মাস পেছিয়ে যান—সেপ্টেম্বর, আগস্ট, জুলাই—পেলেন ২৭শে জুলাই, ১৯৬০। তাহলে মেয়েটির সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে

আন্দাজ ২৭শে জুলাই, ১৯৬০ সালে।

তবে কার্যত দেখা যায় প্রসূতিদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরই গর্ভস্থ শিশু ওই উপরোক্ত হিসেবের দিনটি বাদ দিয়ে তা থেকে দশ দিন আগে থেকে দশ দিন পরের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে।

ওপরে যে হিসেবের কথা বলা হল তা অবশ্য বহু প্রাচীন। ইদানীং নারীর গর্ভে ডিম্বকোষ থেকে ডিম্বস্ফোটন ও গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে অনেক সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা গেছে। তাতে দেখা যায় আটাশ দিনে মাসিক ঋতুস্রাবের মতো স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মাসিক শুরু হওয়ার প্রথম দিনটি থেকে প্রায় চোদ্দ দিনের মাথায় নারীব ডিম্বস্ফোটন হয়ে থাকে। কিন্তু এই নবলব্ধ জ্ঞানের ফলেই যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনক্ষণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে তা নয়। এমন কি গর্ভসঞ্চারের সঠিক তারিখটি জানা থাকলেও ওই পুবনো কালের হিসেবের চেয়ে বেশি নিখুঁতভাবে সন্তানপ্রসবের সময় নির্ধারণ করা আজকেব দিনেও সম্ভব হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নাবীব গর্ভকালের স্থায়িত্ব ২৮০ দিনও হতে পারে, আবাব তার চেয়ে কম বা বেশি সময় হতেও বাধা নেই। এখন, এই গর্ভকাল যদি গর্ভসঞ্চারেব প্রথম দুই কি তিনমাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ গর্ভকাল যদি মাত্র দু-তিন মাসের মতো স্বল্পস্থায়ী হয়, তো ডাক্তাররা তাকে বলেন গর্ভস্রাব বা abortion। আবার গর্ভকাল তিন মাসের পব থেকে ছয় কি সাত মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে তাঁবা তার নাম দেন গর্ভপাত বা miscarriage। এই দুই ধরনের গর্ভপাতেব ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হয়ে বাঁচে না, কেননা এ-সময়ের মধ্যে ভ্রূণ বাঁচবার মতো যথেষ্ট পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে না। কিন্তু গর্ভকাল যদি ছ-মাসেরও পরে অথচ পুরো গর্ভকালের আগে শেষ হয় এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ সে-সময়ে এতটা বর্ধিত হয়ে থাকে যে ভূমিষ্ঠ হবার পর বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে বলা হয় অপরিণত বা অকালপ্রসব বা premature delivery। গর্ভকাল যদি আট মাসেরও বেশি স্থায়ী হয় এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর ওজন সাড়ে চার পাউণ্ডের

বেশি হয় তাহলে ডাক্তাররা মনে করেন প্রসূতি পূর্ণ গর্ভধারণ-কাল কাটিয়েছেন ও প্রসব স্বাভাবিক হয়েছে।

আবার নারীব গর্ভধারণেব কাল ২৮০ দিনেব বেশি হতেও বাধা নেই। এ-ব্যাপাবে অনেক সময় মেয়েদেব মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এবকম প্রসূতি কিছু দুর্লভ নন যাদের গর্ভধারণের সময় ডাক্তাব কর্তৃক নির্দিষ্ট তাবিখ পেবিয়ে দুই তিন কি চাব সপ্তাহ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় প্রসূতি নিজে কিংবা তাঁব আত্মীয়বা মনে কবছেন গর্ভধাবণেব দিন গণনায় নিশ্চয়ই কিছু ভুলচুক ঘটেছে --হয়তো মেযেটি যে-সময়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বলে মনে কবছেন আসলে তার পবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। গর্ভকাল যে নির্দিষ্ট সময় ছাড়িয়ে বেশি স্থায়ী হতে পাবে তা এঁবা মানতে চান না।

এটা কিন্তু ঠিক নয়। মনে বাখবেন, গর্ভধাবণেব কাল নির্ধারিত স্বাভাবিক সময় ছাডিযে এমন কি তিন থেকে চাব সপ্তাহ পর্যন্ত বেশি স্থায়ী হতে দেখা গেছে।

ভাবী মায়ের অভিজ্ঞতা

গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস—গর্ভাবস্থাব প্রথম তিন মাসে অধিকাংশ প্রসূতিব বেলাতেই দেখা যায় এমন একটি উপসর্গ হল, গা-বমির ভাব। একেই কখনো কখনো বলা হয "প্রত্যুষেব অসুস্থতা," যদিও দিন ও রাত্রিব যে-কোনো সময়ে এ দেখা দিতে পাবে। সাধাবণত তৃতীয় মাসেব পব, এমন কি বহু ক্ষেত্রে তাব আগেই, গা-বমিব ভাবটা সেবে যায়। তবে এমনও বহু মেয়ে আছেন যাঁবা সাবা গর্ভকাল জুড়েই গা-বমিতে ভোগেন। আবাব, উল্টোদিকে, অনেক মেয়েব বেলায় এই উপসর্গ গর্ভাবস্থাব গোড়াব দিকে কিছুদিনেব জন্যে দেখা দিয়ে সেবে যায় এবং পরে শেষ কয়েক মাসে আবাব হয়তো দেখা দেয়।

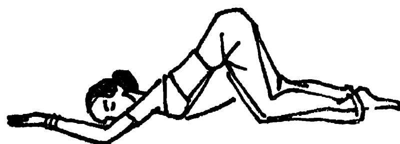
গর্ভাবস্থায় সম্ভবত প্রথম যে শাবীবিক পবিবর্তন আপনার খেয়ালে আসবে তা হল, স্তনদ্বয় আগেব চেয়ে ভাবী বোধ করা। এই

অনুভূতি গর্ভসঞ্চারের পর প্রথমবারের সম্ভাব্য মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকার আগেই হয়তো ঠাহর করা যাবে। প্রত্যেক মাসিক ঋতুস্রাবের আগে-আগে স্তনদ্বয়ে যে-ধরনের অনুভূতি আপনি লক্ষ্য করে থাকেন, প্রথম প্রথম এই ভারবোধ তার চেয়ে বেশি মনে হবে না। কিন্তু যত দিন যাবে দেখবেন স্তন দুটি ততই ভারী হয়ে উঠছে ও টনটন করছে। তারপর এক সময়ে খেয়াল হবে অঙ্গ দুটি আকারেও বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু স্তনের আকার কতটা বৃদ্ধি পাবে কিংবা কবে নাগাদ এই বড়-হয়ে-ওঠা ঠাহর করা যাবে তা নিশ্চিত করে বলা চলে না, ব্যক্তিবিশেষে এর তারতম্য হয়।

গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক সপ্তাহে আপনার শরীরে আরো একটা পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু তখনি আপনি তা ধরতে পারবেন না। এই পরিবর্তনটি ঘটবে আপনাব জবাযু নামের অঙ্গটিতে। প্রথমবার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকার এক সপ্তাহ কিংবা আরো কয়েক দিন পরে ডাক্তারবাবুকে দিয়ে অভ্যন্তবীণ পবীক্ষা করালে তিনি দেখতে পাবেন যে জরায়ু-মুখ (cervix) বা জরাযুব একেবারে নিচের দিকের যে-অংশ যোনির মধ্যে ঝুলে আছে সে-অংশের রঙ্ নীলচে হয়ে গেছে এবং অঙ্গটি স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কিছুটা নরম বোধ হচ্ছে। জরাযুব আকাব বড় হয়েছে কিনা তা কিন্তু ওই সময়ে অনুভব করা যাবে না; তা করতে গেলে এর পরে আরো দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময়ের দরকার।

গর্ভধারণের সময় দু-মাসের কম হলে গর্ভসঞ্চার পরীক্ষা করার একমাত্র সহজসাধ্য উপায় আভ্যন্তরীণ ডাক্তারি পরীক্ষা। এ-ছাড়া ওই স্বল্পকালের মধ্যে গর্ভসঞ্চার পরীক্ষার আর একটিমাত্র উপায় আছে, তা হচ্ছে পূর্বোক্ত বিজ্ঞানাগারিক বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। এরপর, তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি থেকে ওই মাসের শেষের মধ্যে প্রস্যুতির জরায়ু আকারে বৃদ্ধি পেয়ে এমন হয় যে একমাত্র তখনই বাইরে থেকে প্রস্যুতির পেট বা গর্ভ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। তৃতীয় মাসের শেষাশেষি প্রস্যুতির তলপেটের কাছাকাছি বাইরে থেকে

সামান্য একটু চাপ দিয়েই ডাক্তারবাবু বর্ধিষ্ণু গর্ভিণী জরায়ুটি হাতে অনুভব করতে পারেন। অবশ্য শুধুহাতে বাইরে থেকে জরায়ুর অবস্থান অনুভব করার এই ব্যাপারটি প্রসূতির স্বাস্থ্য ও দেহের গঠনের ওপর নির্ভর করে। তিনি রোগা হলে উপরোক্ত সময়ের আগেই এবং অতিরিক্ত মোটা হলে আরো কিছুদিন পরে এইভাবে জরায়ুর অবস্থান বুঝতে পারা যাবে। তাছাড়া জরায়ু যদি স্বাভাবিক স্থানে অর্থাৎ পেটের গহ্বরের সামনেব দিকে থাকে তাহলে পিছনের দিকে "হেলে-পড়া" জরায়ুব চেয়ে তা সহজে অনুভব কবা যায়। গর্ভাবস্থার গোড়ার দিকে আপনাব জবায়ু-যন্ত্রটি যদি এইবকম "হেলে-পড়া" অবস্থায় থাকে তাহলে তৃতীয় মাসের শেষাশেষি সেটির সামনের দিকে এগিয়ে আসার কথা। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ-ব্যাপাব ঘটে থাকে এবং এব জন্যে সাধারণত কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণেব প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এটি ঘটতে অস্বাভাবিক দেরি দেখলে ডাক্তাববাবু আপনাকে হয়তো প্রতিদিন কিছু সময় এক বিশেষ ধরনের ব্যায়াম কবাব উপদেশ দিতে পাবেন। এই ব্যায়ামটি



"হেলে পড়া" জবাযুকে সামনের দিকে সঠিক
অবস্থানে নিয়ে আসাব উপযোগী ব্যায়াম

আব কিছুই নয় কোনো নবম সমতল জায়গায়, ধরুন বিছানার ওপরই, হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে শোয়া। এই শোয়াটা এমনভাবে হওয়া চাই যেন ওপব দিকে বুক থেকে সমস্ত ঊর্ধ্বাঙ্গ এবং নিচের দিকে হাঁটু থেকে নিচের অংশ বিছানায় ভর দিয়ে থাকে, কেবল বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাঝের অংশটি বিছানা না ছুঁয়ে উঁচু হয়ে থাকে। এর ফলে আপনার শরীরের সমস্ত ভার এসে পড়বে বুক ও হাঁটুর ওপর এবং এদের মাঝের অংশটি শূন্যে ঝুলে থাকবে। এই ব্যায়ামের

ফলে পিছন দিকে "হেলে-পড়া" জরায়ুকে সামনেব দিকে এগিয়ে আসতে সাহায্য কবা হবে।

গর্ভাবস্থার মাঝের তিন মাস—গর্ভাবস্থাব মাঝেব তিন মাস সাধারণত প্রসূতিব পক্ষে সবচেযে স্বাচ্ছন্দ্যকব, সবচেয়ে আবামদায়ক। মনে হবে বুঝি জীবনে কোনোদিন আপনাব শবীব এত ভালো ছিল না। আগেব কয়েক মাসেব গা-বমিব ভাবটা এ-সময়ে অনেকখানি কেটে যাবে আবাব গর্ভস্থ শিশুও আকাবে এমন কিছু বড হয়ে উঠবে না বা নডাচড়া কববে না। এই স্বাচ্ছন্দ্যেব ভাব প্রায়ই প্রসূতিব বাহ্যিক চেহাবায়ও প্রকাশ পাবে। গর্ভাবস্থাব এই মাঝেব কটা মাসে বহু মেযেকেই বিশেষ রূপবতী বলে বোধ হয।

চতুর্থ মাসেব শেষাশেষি প্রসূতিব পেটে নাভিদেশেব নিচেব দিকটা উঁচু হয়ে উঠতে দেখা যাবে। এই সময় থেকে পঞ্চম মাসেব মাঝামাঝিব মধ্যে আপনি প্রথম গর্ভস্থ ভ্রূণেব নডাচডা অনুভব কববেন।

সাধাবণত পঞ্চম মাস নাগাদ ভিতবে বাডন্ত ভ্রূণেব জন্যে প্রসূতিব তলপেটেব ওপবেব দিকটা উঁচু হযে নাভিদেশেব সমান হযে দাঁড়াবে। অবশ্য এ-নিযম সকলেব ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যেতে পাবে না। কেননা, প্রথমত, সব মেযেব নাভিদেশ সমান উঁচু নয়, এবং দ্বিতীয়ত, তলপেটেব এই উচ্চতা প্রসূতি মেয়েটিব স্বাস্থ্য ও দেহেব গঠনেব ওপব নির্ভবশীল। ফলে স্বাস্থ্যবতী, লম্বা-চওডা চেহাবাব মেযেদেব চেয়ে ছোটখাট বোগা-গড়নেব মেয়েদেব পেটই আগে উঁচু দেখাবে।

প্রসূতি মেয়েদেব চেহাবায় উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছ-মাসে পডলে। পাঁচ মাসেব শেষাশেষি থেকে ছ-মাসেব শেষ —আগে থেকে না জানলে এই সময়েই সাধারণত প্রথম ঠাহর হয় কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। প্রসূতিব ব্যবহাবের উপযোগী ঢিলে জামা ইত্যাদিব প্রয়োজনও পড়ে এই সময় থেকে। পেটের

ক্রমশ-বেড়ে-ওঠা অংশটি এর আগে পর্যন্ত কোমরের খাঁজের নিচে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু এই সময় থেকে কোমরও স্ফীত হয়ে উঠতে শুরু করে।

গর্ভাবস্থার এই ষষ্ঠ মাসে পেটের ভিতর জরায়ু অঙ্গটি বেড়ে গিয়ে নাভিদেশ ছাড়িয়ে ওপরে উঠে আসে। গর্ভস্থ ভ্রূণের নড়াচড়াও এ-সময়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়।

গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাস—গর্ভাবস্থার শেষের তিন মাসে ভ্রূণের নড়াচড়া কখনো কখনো রীতিমতো অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিশুটি এ-সময়ে রীতিমতো নড়াচড়া করে এবং কখনো পাঁজরে কখনো বা নিচের দিকে যোনিদেশে গুঁতো মারতে থাকে। এ-তিন মাসে প্রায়ই প্রসূতির পেট এখানে-ওখানে হঠাৎ-হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠতে দেখা যায়। জানবেন, এ-সবই গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব ধাক্কাব ফল।

সপ্তম মাস নাগাদ গর্ভিণীব পেটেব ভিতব জরায়ুটি লম্বায় এতখানি বেড়ে ওঠে যে স্টার্নাম নামে বুকের মাঝখানে যে চ্যাপটামতো হাড়টি আছে তার তলাব দিক থেকে মাত্র তিন থেকে চার আঙুল ব্যবধানের মধ্যে সেটি এসে পড়ে। কিন্তু এব পর—অষ্টম ও নবম মাসে—জরায়ুর পক্ষে ওপব দিকে বেড়ে-ওঠা যখন আর সম্ভব হয় না তখন সেটি সামনের দিকে বাড়তে থাকে, ফলে এই শেষোক্ত দু-মাসে প্রসূতির পেটের আকার ক্রমশই বড় হয়ে উঠতে থাকে।

সারা নবম মাস জুড়ে পেট এইভাবে সামনেব দিকে বাড়ে। তারপর, জরায়ুব নিচের অংশ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়ে ওঠার ফলে গর্ভস্থ শিশুর মাথাটি ক্রমশ ঘুবতে ঘুবতে নিচে, প্রসূতির নিতম্ব ও বস্তি-প্রদেশের মধ্যবর্তী প্রশস্ত গহ্বরের দিকে, নামতে থাকে। এবং এর সঙ্গে হঠাৎ, যেন মন্ত্রবলে, প্রসূতির পাঁজরের ওপরকার চাপও কমে যায়। প্রসূতির মনে হয়, যে-বোঝা এতদিন তিনি বহন করছিলেন হঠাৎ বুঝি তার ভার হালকা হয়ে গেল!

অবশ্য "বোঝা হালকা" হওয়ার এই অনুভূতি যে শুধুমাত্র শিশুর অবস্থান পরিবর্তনেব ফলেই ঘটে তা নয়। ন-মাসের শেষাশেষি গর্ভাবস্থাব সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন শারীরিক উপসর্গ ইত্যাদিও কিছু কিছু কমতে শুরু কবে। প্রসূতির বক্ত-চলাচল ব্যবস্থার ওপর চাপ কমা ও শবীবে-জমা জলীয় পদার্থের পরিমাণ-হ্রাস এই সময় থেকেই শুরু হয়। এ-সময়ে প্রসূতিব নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট কমে, হৃদ্‌স্পন্দন সহজতব হয়ে ওঠে এবং সাধাবণ চলাফেবায় অস্বস্তিও কমতে থাকে।

আব এই সব লক্ষণ দেখে প্রসূতি বোঝেন, তিনি শীঘ্রই মা হতে চলেছেন।

ওপরে গর্ভাবস্থাকালীন যে-সব শাবীবিক উপসর্গ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা সংক্ষেপে বলা হল সে-সবই পববর্তী পবিচ্ছেদগুলিতে বিস্তাবিতভাবে আলোচিত হবে।

গর্ভস্থ ভ্রূণ কোথায় থাকে

আগে বলেছি, নাবী-জননতন্ত্রেব বিস্তাবিত পবিচয় ও গর্ভসঞ্চাব কি ভাবে ঘটে সে-সম্পর্কিত শাবীববিদ্যাগত আলোচনা যে-কোনো সাধাবণ যৌনবিজ্ঞানেব বইয়ে পাওয়া যায় বলে ও স্থানাভাবেব জন্যে এ-বইয়ে সে-সব স্থান পায়নি। আমবা ধরেই নিয়েছি, এ-বইয়ের পাঠিকাবা মোটামুটি উপবোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু তবু যে-সব প্রসূতি যৌনবিজ্ঞানের বইয়েব সঙ্গে তেমন পরিচিত নন তাঁদেব সুবিধাব জন্যে প্রয়োজনবোধে গর্ভস্থ সন্তান কোথায় থাকে ও কিভাবে বেড়ে ওঠে সে-সম্পর্কে খানিকটা প্রাথমিক আলোচনা নিচে করা গেল। কতকগুলি মনে রাখাব মতো জরুরী বিষয় সংক্ষেপে প্রসূতিদেব স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

গর্ভাশয় বা জরায়ু—গর্ভাবস্থায় শিশু যে-থলির মধ্যে থাকে ও বেড়ে

ওঠে তাকে বলে গর্ভাশয় বা জরায়ু। ছোট্ট এক টুকরো tissue বা কোষের সমষ্টি থেকে একটি পূর্ণ-পরিণত আসন্নপ্রসূত শিশু গড়ে ওঠার সময় গর্ভস্থ সন্তান ক্রমে ক্রমে যেভাবে বেড়ে ওঠে, মায়ের গর্ভাশয় নামের অঙ্গটিও তেমনভাবে বড় হয়ে উঠে ওই শিশুকে মাতৃগর্ভে থাকার জায়গা করে দেয়।

গর্ভাশয়ে থাকার সময় শিশু একটি জলীয় পদার্থে ভর্তি থলির ভিতর বাস করে। চলতি কথায় একে বলে "জলের থলি"। যে-অঙ্গের সাহায্যে এই থলির মধ্যেকার শিশুটি গর্ভাশয়ের দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তার নাম প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল (বা চলতি কথায় শুধুই "ফুল")। এই গর্ভফুলের মধ্যে দিয়েই প্রসূতির রক্তবহা ধমনী থেকে শিশু তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অক্সিজেন পায়।

"জলের থলি" গর্ভাশয়ে ভ্রূণটি বেড়ে ওঠার সময় দু-পর্দা ঝিল্লী বা পাতলা চামড়া দিয়ে চারিদিকে ঘেরা থাকে। বাইরের পর্দাটিকে বলে কোরিয়ন ; প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল এই পর্দারই একটা অংশমাত্র। ভিতর দিকে আরো একটি পর্দা থাকে, তার নাম অ্যাম্‌নিয়ন। এই দ্বিতীয় পর্দায় ঘেরা ভিতরের জায়গাটি একরকম জলীয় পদার্থে পূর্ণ, একে বলা হয় অ্যাম্‌নিয়টিক জল। গর্ভস্থ ভ্রূণ আগাগোড়াই কার্যত অ্যাম্‌নিয়টিক জলে ভেসে থাকে।

এই জলীয় পদার্থে ভ্রূণটি চারিপাশ থেকে গদির মতো এমনভাবে মোড়া থাকে যে ফলে অনেক আকস্মিক ঘর্ষণ ও ধাক্কার হাত থেকে সেটি রক্ষা পায়। একমাত্র জরায়ু বা গর্ভাশয় নিজে গুরুতর আঘাত পেলে কিংবা জলের থলি কোনো কারণে ফেটে গেলে তবেই গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব।

গর্ভাবস্থায় কোনো সময়ে জলের থলিটি ফেটে গেলে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কেননা এরকম ব্যাপার ঘটলে তার দু-এক দিনের মধ্যেই প্রসববেদনা শুরু হওয়ার ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। জলের থলি ফেটে গেলে (অর্থাৎ চলতি কথায় "জল ভাঙা" শুরু

হলে) অনেক সময় জলের পরিমাণ দেখে, কিংবা এ-অবস্থায় প্রসব-বেদনা শুরু হতে দেরি হলেও সমানে ক-দিন জল ভাঙতে দেখলে মেয়েরা অবাক হন। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অ্যাম্নিয়টিক থলিতে জলের পবিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। তাছাড়া থলিটি অক্ষত থাকা অবস্থায় সব সময়েই তার মধ্যে জলীয় পদার্থ সৃষ্টি হতে থাকে। তবে এতে অসুবিধা হয় না, কেননা একদিকে যেমন জল তৈরি হয়, অন্যদিকে সেই জল অল্পে অল্পে অ্যাম্নিয়ন প্রভৃতি পর্দার মধ্যে দিয়ে শবীর ফের শুষেও নেয়।

প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল— প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল আসলে গর্ভস্থ ভ্রূণেরই অংশবিশেষ। পুরুষ শুক্রকীটের সঙ্গে স্ত্রী-ডিম্ব মিলিত হয়ে ডিম্বটি গর্ভিণী হলে পর সেটি আপনাআপনি নিজেকে খণ্ডবিখণ্ড করে এক গুচ্ছ কোষের সমষ্টিতে বা একটি ছোট গোলাকাব পদার্থে পরিণত হয়। সেই গোলাকাব বস্তুটি তখন নিচে নেমে এসে জবায়ুব দেয়াল কামড়ে সেখানে বাসা বাঁধে এবং প্রসূতিব রক্তবহা ধমনী থেকে খাদ্য সংগ্রহ কবে। পরে এই কোষ-সমষ্টিব একটি অংশ আরো রূপান্তরিত হয়ে পবিণত হয় গর্ভফুলে। বাড়ন্ত ভ্রূণকে খাদ্য যোগানোই হল গর্ভফুলেব কাজ।

ভ্রূণের অপবাপর অংশ অবশ্য গর্ভফুল থেকে আলাদাভাবে বেড়ে ওঠে। তবে গর্ভফুলেব সঙ্গে এই অংশ গর্ভনাড়ি দিয়ে সংযুক্ত থাকে। এই গর্ভনাড়ি (বা umbilical cord) শুধুমাত্র একটি ধমনী, কয়েকটি শিবা ও কিছু তলতলে পিচ্ছিল পদার্থ দিয়ে তৈরি।

গর্ভফুল নামেব অঙ্গটি জবায়ূব দেয়ালে পর্দার সঙ্গে সাঁটা থাকে। এটি বক্তবহা ধমনী শিবা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। এই সব ধমনী-শিরা আবার গর্ভফুলের সরু সরু বোঁয়া বা শুঁড়ের মতো প্রত্যঙ্গের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম উপধমনী ও উপশিরায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এসব সত্ত্বেও মা ও শিশুব রক্ত কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোথাও মিশছে না। আসলে গর্ভফুল থেকে এইসব সরু শুঁড়ের মতো প্রত্যঙ্গ প্রসূতির রক্তবহা

ধমনী-শিরা ইত্যাদির মধ্যে হানা দিয়ে তাঁর রক্তস্রোতে ভাসতে থাকে। এবং মায়েব বক্তে-মেশা প্রায় সব পদার্থই এইসব শুঁড়ের মধ্যেকাব উপধমনীগুলিব দেয়ালেব আবরণ চুঁইয়ে এসে গর্ভস্থ শিশুব বক্তে মিশে যায়।

আব এই একই ভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণেব শবীবে যে-সব অপ্রয়োজনীয় পদার্থ জমা হয় সেগুলি তাব বক্তবহা শিবা বেয়ে গর্ভফুলে আসে এবং সেখান থেকে চুঁইয়ে গিয়ে ফেব মাযেব বক্তপ্রবাহে মিশে যায়। তাবপব সেগুলি মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্ক ও ফুসফুসেব সাহায্যে মায়ের শরীব থেকে বেবিয়ে যায়।

স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সাধাবণত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়াব পবেও কিছুক্ষণ গর্ভফুল প্রসূতিব জবাযুব মধ্যে থেকে যায। জবাযু থেকে গর্ভফুল বিচ্ছিন্ন হযে ভূমিষ্ঠ হয পবে, সাধাবণত সন্তান প্রসবেব কয়েক মিনিটেব ব্যবধানে। তবে কখনো কখনো প্রসবেব কয়েক সেকেণ্ডেব মধ্যেই "ফুল" পড়ে যেতে দেখা যায, আবাব কখনো বা কযেক ঘণ্টাও দেবি হয়। এই শেষেব ঘটনা অবশ্য নেহাত দুর্লভ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াব কয়েক মিনিট পবে সাধাবণত ফেব জবাযুব সংকোচন শুরু হয়, দেখে মনে হয় বুঝি আবাব প্রসববেদনা শুরু হল। দ্বিতীয় দফায় এই সংকোচনেব ফলেই গর্ভফুলটি জবাযু থেকে যোনিব মধ্যে নেমে আসে। অবশেষে প্রসূতি আধসেবটাক ওজনেব বক্তমাংসের একটি দলা শবীব থেকে বেব কবে দেন। একেই আমাদেব দেশে চলতি কথায় বলে, "ফুল পড়া"।

বক্তবাহিত হয়ে কোন্ কোন্ পদার্থ গর্ভফুলেব দেয়াল চুঁইয়ে ভাবী মা ও গর্ভস্থ সন্তানেব দেহে আনাগোনা কবে, এ-প্রশ্নেব এখনো পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। বক্তেব মধ্যেকাব অপেক্ষাকৃত সবল বাসায়নিক পদার্থগুলি যেমন অক্সিজেন, শর্কবাজাতীয় ও নানা জাতীয় লবণ, নাইট্রোজেনজাতীয় অপ্রয়োজনীয় ও ত্যাজ্য পদার্থসমূহ প্রভৃতি সহজেই এই দেয়ালেব বাধা অতিক্রম কবে যেতে পাবে। বোগেব ছোঁয়াচ ঠেকাতে পাবে বক্তবাহিত এমন বোগ-

নিরোধক পদার্থগুলি (বা antibodies)-ও এইভাবে মা থেকে সন্তানের শরীরে চলান যেতে পারে। এই কারণেই গর্ভিণী যদি হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের নিরোধক টিকা নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সন্তানও ওই সব রোগের নিরোধক পদার্থ রক্তে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে এবং যতদিন পর্যন্ত পদার্থগুলি শিশুর রক্তে বর্তমান থাকবে (অর্থাৎ, জন্মের পর আরো কয়েক মাস) ততদিন শিশুটি ওই সব রোগের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে পারবে। এছাড়া, উপরোক্ত পদার্থগুলি ব্যতীত নানা রকম ওষুধবিষুধও গর্ভফুলের দেয়াল চুঁইয়ে উভয়দিকে যাতায়াত করতে পারে। যেমন, ধরুন, ঘুম হচ্ছে না বলে মা যদি কোনো ঘুমের ওষুধের বড়ি খান, তাহলে গর্ভের শিশুটিরও কিছু পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খাওয়া ঘটবে। তবে, যেমন মায়ের রক্তপ্রবাহ থেকে তেমনি শিশুর রক্ত থেকেও এ-সব ওষুধ যথাসময়ে আবার বেরিয়েও যাবে।

ওষুধবিষুধ এইভাবে মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে সঞ্চারিত হয় বলে স্বভাবতই প্রসূতিরা জানতে চাইবেন, প্রসূতি কোন্ কোন্ ওষুধ ব্যবহার করলে শিশুর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু মায়েরা শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে মাত্র গুটিকয়েক ওষুধ বাদে প্রায় কোনো ওষুধেই শিশুর ক্ষতি হয় না। ওষুধের মাত্রা যতক্ষণ এতটা কম থাকছে যাতে মায়ের কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, ততক্ষণ সে-ওষধ শিশুর পক্ষেও নিরাপদ জানবেন। অ্যাসপিরিন, ঘুমের বড়ি, সাল্‌ফা, পেনিসিলিন ও অ্যান্টিবায়োটিক-জাতের অন্যান্য ওষুধও এইভাবে মাত্রা বজায় রেখে প্রসূতির ওপর প্রয়োগ করতে বাধা নেই।

অল্প যে কয়েকটি ওষুধ প্রসূতি ও গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বলে ডাক্তাররা মনে করেন তার মধ্যে একটি ওষুধের কথা এখানে বলা ভালো। এটি হল কুইনিন। আমরা জানি, কুইনিন খেলে সাধারণত কান ভোঁ-ভোঁ করে। ডাক্তাররা বলেন, এর কারণ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের নার্ভের ওপর কুইনিনের বিষক্রিয়া

হয়। ফলে প্রসূতির ওপর অল্পবিস্তর পরিমাণে কুইনিন প্রয়োগ করলে গর্ভস্থ শিশু বধির হয়ে যেতে পারে, ডাক্তাররা অনেকে এমন মতও পোষণ করেন। এছাড়া অন্য যে-সব ওষুধ গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর এখানে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সেগুলি কেবলমাত্র ক্যান্সাব বোগেব চিকিৎসায় কাজে লাগে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে প্রসূতির ওপব প্রয়োগ কবাব প্রয়োজন হয় না।

এ-প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার প্রসূতিদেব জানা দরকার। মদ-আফিম-তামাকজাতীয় জিনিসগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি কেউ কেউ ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে হয়তো এদের মধ্যে কোনো কোনো জিনিস ঘুমের ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, এ-সব প্রায়ই অভ্যাস বা নেশাব জিনিসে পরিণত হয়। প্রসূতিব এ-বকম কোনো নেশা থাকলে গর্ভস্থ শিশুর আর কোনো ক্ষতি হোক না-হোক নেশাটি শিশুব মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। বিশেষ কবে প্রসূতিব আফিমেব নেশা থাকলে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পব তাকে কিছু সময় চোখে-চোখে রাখতে হবে, কেননা আফিমের সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে শিশুব শরীবে আক্ষেপ বা খিঁচুনি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু মদ-আফিম ইত্যাদি ব্যবহার না কবলেও প্রতি রাত্রে যাঁরা নিয়মিত ঘুমেব ওষুধ ব্যবহাব কবেন তাঁদেব বেলা? ডাক্তাররা অনেকে বলেন, এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপাব। কেননা ঘুমেব ওষুধ নিয়মিত ব্যবহাব করলেও তা পবিণতবয়স্ক মানুষের নেশায় দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ। এবং তা যে গর্ভস্থ সন্তানের নেশায় পবিণত হয় না এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পবিশেষে আবো একটি ব্যাপাব প্রসূতিদের জেনে বাখা দবকার। সাধাবণত লোকেব ধারণা যে সব রকম বোগই বুঝি মায়ের শরীর থেকে শিশুর দেহে সংক্রামিত হয়। কিন্তু এ-ধারণা ঠিক বলে এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। কেবলমাত্র প্রসূতির সিফিলিস থাকলে প্রথমে গর্ভফুল ও পরে গর্ভস্থ শিশুর ওই রোগে আক্রান্ত হবার ভয়

থাকে বলে জানা গেছে। এছাড়া এক ধরনের বিদেশী হামও ওই ভাবে সংক্রামিত হয়ে থাকে বলে ইওরোপীয় ডাক্তাররা লিখছেন। কিন্তু এরকম দু-একটি রোগ বাদ দিলে ভাইরাসবাহিত অন্যান্য অসুখের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশু আক্রান্ত হয় বলে জানা যায় না। তবে, এ-ধরনের কোনো কোনো অসুখের ফলে প্রসূতির গর্ভপাত ঘটা বিচিত্র নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ কিভাবে বাড়ে

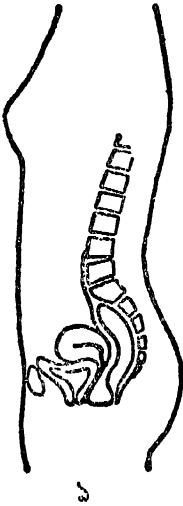
প্রথম মাস—গর্ভাবস্থায় প্রথম মাসের একেবারে গোড়ার দিকে ডিম্বকোষ বা ওভারিকে গর্ভাশয় বা জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত করছে যে ফ্যালোপিয়ন নলী গর্ভিণী স্ত্রী-ডিম্ব তারই মধ্যে থাকে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলে। স্ত্রী-ডিম্বের এই বাড় সম্ভব হয় তার মধ্যেকার কোষগুলি আপনাআপনি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে। এই বাড়ন্ত কোষসমষ্টিকে বলা হয় "ভ্রূণ"। স্ত্রী-ডিম্ব গর্ভিণী হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই—স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায়—ভ্রূণটি ফ্যালোপিয়ন নলী বেয়ে নিচে জরায়ুর মধ্যে নেমে আসে এবং সাধারণত জরায়ুর ওপর দিকের দেয়াল কামড়ে ধরে সেখানে বাসা বাঁধে। ভ্রূণের কোষসমষ্টির মধ্যে কিছুসংখ্যক কোষ মিলে তখন তৈরি হয় গর্ভফুল। গর্ভফুল আবার জরায়ুর শ্লেষ্মাঝিল্লী বা পর্দার মধ্যে দিয়ে প্রসূতির রক্তের সঙ্গে ভ্রূণের অন্যান্য অংশের সম্পর্ক স্থাপন করে। ভ্রূণের এই অন্যান্য কোষসমষ্টির কিছু অংশ থেকে তৈরি হয় অ্যাম্নিয়টিক জলের থলি ও বাকি অংশ থেকে শিশুর দেহ।

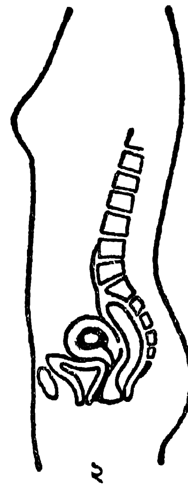
দেখা গেছে, প্রথম কয়েক দিন গর্ভস্থ ভ্রূণ অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমন কি স্ত্রী-ডিম্ব গর্ভিণী হবার মাত্র তিন দিন পরেই ভ্রূণটি এত বড় হয়ে উঠে যে তা খালি চোখে দেখা যেতে পারে। অবশ্য এই "দেখা যাওয়া"র ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল; প্রসূতিকে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তারবাবু বাইরে থেকে নিশ্চয়ই এটি দেখতে পান না। যাই হোক, ওই তিন দিন পরেই চওড়ায় ভ্রূণটির

মাপ দাঁড়ায় '০৪" ইঞ্চির মতো। সাত কিংবা আট দিনের দিন ওই মাপই বেড়ে দাঁড়ায় '১৫" ইঞ্চির মতো।

প্রথমবার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া বা বাদ পড়ার সময় নাগাদই আপনার গর্ভস্থ শিশুর মাথা ও মাথার ভিতরকার মস্তিষ্ক তৈরি হতে শুরু করে। ভ্রূণের দেহাংশের মধ্যে এই মাথাটাই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। এমন কি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময়েও তার মাথা শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে আকারে বড় থাকে।

প্রথম মাসের শেষাশেষি ভ্রূণের শরীরে আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তৈরি হতে শুরু হয়েছে দেখা যায়। হৃদ্‌পিণ্ডটি এই সময় একটি ছোট্ট নলের মতো দেখতে লাগলেও তার ধুকধুকি এর মধ্যেই শুরু হয়ে যায়। ভ্রূণের শিরদাঁড়াও এ-সময়ে বেড়ে উঠতে শুরু করে এবং তার নিচের দিকে লেজের মতো একটা অংশ দেখা দেয়। ভ্রূণের শরীরে ইতিমধ্যে চারটি ছোট ছোট কুঁড়ির মতো প্রত্যঙ্গও দেখা যায়। এগুলিই পরে শিশুর হাত-পা রূপে বেড়ে ওঠে।





১। গর্ভসঞ্চারের আগে

২। গর্ভসঞ্চারের পর প্রথম মাসের শেষে

এই প্রথম মাসের শেষে আপনার ভ্রূণশিশুটি জরায়ুর মধ্যে কুঁকড়িয়ে

গোল পাকিয়ে থাকে। আর লম্বায় সেটি বেড়ে হয় আনুমানিক এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ থেকে প্রায় আধ ইঞ্চির মতো।

দ্বিতীয় মাস– এই দ্বিতীয় মাস নাগাদ আপনার শিশুর হাত-পা ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া কনুই ও হাঁটু এবং পাতলা-চামড়া-দিয়ে-জোড়া হাতের ও পায়ের আঙুল তৈরি হয়। শিরদাঁড়ায় লেজের অংশটাও পুরোপুরি তৈরি হয়ে ওঠে এবং বেশ বড় দেখায়। এ-ছাড়া ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃৎ ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রগুলি এ-সময়ে শিশুর দেহের ভিতরে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় ক্রমশ সরে যেতে শুরু করে। শিশুর মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ, যেমন চোখের কোটর, চোখেব পাতা, কান ইত্যাদিও এ-সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

এ-অবস্থায় ওই সমস্ত অবয়ব ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার এমন অসম্ভবরকম ছোট থাকে যে ভাবতেও মজা লাগে। অথচ সত্যি সত্যিই এতে অবিশ্বাস করার কিছুই নেই, কেননা এ-সময়ে আপনার গর্ভস্থ শিশু লম্বায় মাত্র ইঞ্চিখানেকের কিছু বেশি আর তার ওজন এক আউন্সের দশ ভাগেব এক ভাগের চেয়েও কম।

এই দ্বিতীয় মাসের শেষাশেষি গর্ভফুলটি বিকশিত হয়ে পরিণত আকার পায় এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ জলের থলির মধ্যে ডুবে থাকে।

তৃতীয় মাস— এ-সময়ে আপনাব শিশুর লেজ (যেটি দ্বিতীয় মাসে পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় ছিল) আকারে কমতে শুরু করে এবং মাসের শেষে সেটি সম্পূর্ণ লোপ পায়। শিশুর হাতের ও পায়ের আঙুলের মধ্যেকার পাতলা চামড়ার জোড়গুলিও এই সময়ে খসে পড়ে। হাত-পায়ের আঙুলে খুব পাতলা নখ এবং মুখের মাড়িতে ছোট ছোট মাংসের কুঁড়ি দেখা দেয়। এই কুঁড়িগুলিই পরে শিশুর দাঁতের গোড়ায় পরিণত হয়। গর্ভস্থ শিশুর ওজন এ-সময়ে এক আউন্স কিংবা তারও কম হয়ে থাকে।

তৃতীয় মাসের শেষে শিশুর যৌন-অঙ্গগুলি প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ফলে এই প্রথম গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ-নির্ণয় সম্ভব হয়। কিছু কিছু ডাক্তারের অভিমত এই যে, এ-সময়ে কিংবা পরবর্তী কালে প্রসূতির রক্ত পরীক্ষা করে গর্ভস্থ শিশুর সম্ভাব্য লিঙ্গ সম্পর্কে খানিকটা হদিস পাওয়া সম্ভব। তবে এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঠিক বলে এখনো পর্যন্ত কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়নি। শিশুটি যদি মেয়ে হয়ে থাকে তবে এই তৃতীয় মাসের শেষে তার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ জরায়ুও তৈরি হয়ে যায়।

চতুর্থ মাস—এ-সময়ে গর্ভস্থ সন্তান দ্রুত বাড়তে থাকে। এই মাসের শেষাশেষি শিশুটি চার থেকে ছ-ইঞ্চির মতো লম্বা হয় এবং তার ওজন বেড়ে প্রায় চার আউন্সের মতো দাঁড়ায়। ভ্রূণটিকে এখন একটি পূর্ণাঙ্গ, পুরোদস্তুর শিশুর মতোই দেখতে লাগে, যদিও সেটি এখনো পর্যন্ত নেহাত অপরিণত থাকে এবং আরো অনেকখানি পরিণতির অপেক্ষা রাখে।

এই মাসেই শিশুর মাথায় চুল ও গায়ে লোমের আভাস দেখা দেয়। চার মাসের শেষে তার মাংসপেশীগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিশুটি একটু-আধটু নড়াচড়া করতে ও হাত-পা ছড়াতে শুরু করে। তবে এই নড়াচড়া এতই ক্ষীণভাবে হয় যে প্রসূতিদের মধ্যে অনেকে তা বুঝতে পারেন না।

পঞ্চম মাস— এই মাসে আপনার গর্ভস্থ শিশু চঞ্চল হয়ে উঠবে। আপনি বেশ অনুভব করবেন শিশুটি পেটের মধ্যে রীতিমতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। এই মাসেই স্টেথোস্কোপের সাহায্যে ডাক্তার-বাবু সম্ভবত আপনার শিশুর হৃদস্পন্দন প্রথম ধরতে পারবেন।

ষষ্ঠ মাস—এ-মাসে এবং এর পরবর্তী মাসগুলিতে আকারে ও ওজনে গর্ভস্থ শিশু খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। প্রসূতির পেটের আয়তন

বৃদ্ধি দেখেই এই বেড়ে-ওঠা টের পাওয়া যায়। এ-মাসের শেষাশেষি আপনার শিশু লম্বায় দশ ইঞ্চির মতো হবে এবং তার ওজন বেড়ে দাঁড়াবে দেড় পাউণ্ড বা তাব কিছু কম-বেশি।

এই সময় নাগাদ আপনাব শিশু একটু বেশি-বেশি "আড়মোড়া" ভাঙতে থাকবে। এতে আপনার হয়তো একটু কষ্টই হবে। শুধু আড়মোড়া ভাঙা নয়, শিশুটি তাব পা ও মাথা দিয়ে গুঁতো মাববে, সমস্ত শরীব ঘুবিয়ে ঘুবিয়ে অবস্থান পবিবর্তন করতে থাকবে। ফলে কখনো সে আড়াআড়িভাবে নড়বে, কখনো মনে হবে "বসছে", কখনো বা বুঝি "মাথাব ওপব ভব দিযে দাঁড়াচ্ছে"। এই ষষ্ঠ মাস থেকে সাবা গর্ভাবস্থা জুড়ে এই বকম নড়চড়া ও গুতোগুঁতি চলতে থাকবে, তবে সাবাক্ষণ বা অবিচ্ছিন্নভাবেই যে চলবে, তা নাও হতে পাবে। আবাব এবকম হওয়াও সম্ভব যে সময়-সময় আপনি একেবাবেই এই নড়াচড়া অনুভব কববেন না। অর্থাৎ এবকম মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে শিশুটি বুঝি কিছুদিন "ঘুমিয়ে" ও কিছুদিন "জেগে" কাটাচ্ছে।

সপ্তম মাস--সন্তানপ্রসবেব সময গর্ভস্থ শিশুব অবস্থান যেবকমটি থাকে সপ্তম মাসে শিশু সাধাবণত সেই অবস্থানে আসতে চেষ্টা কবে। এই অবস্থান সাধাবণত মাথা-নিচেব-দিকে-কবা অবস্থা ; তবে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে পাছা-নিচেব-দিকে-কবা অবস্থা, এবং আবো স্বল্প দু-চাবটি ক্ষেত্রে আড়াআড়ি-শোয়া অবস্থাও হতে পাবে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এই অবস্থানও যে প্রসবেব সময় পর্যন্ত স্থিতিশীল থাকবে তার কোনো মানে নেই। এও ওই সময়েব মধ্যে যে-কোনো দিন বদলে যেতে পারে। এছাড়া গর্ভস্থ শিশু এ-সময়ে অন্য নানাদিকে ও নানাভাবেও নড়াচড়া কবতে থাকে। যেমন, ধরুন, হাত-পা ছোঁড়া, মাথা-ঝাঁকুনি দেওয়া, নড়েচড়ে পাছাব দিকটা কখনও প্রসূতির নাভিমূল কখনো বা তাঁব শিবদাঁড়াব দিকে ঘোরানো, ইত্যাদি।

গর্ভস্থ শিশুর শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি এই সপ্তম মাসে প্রায়,

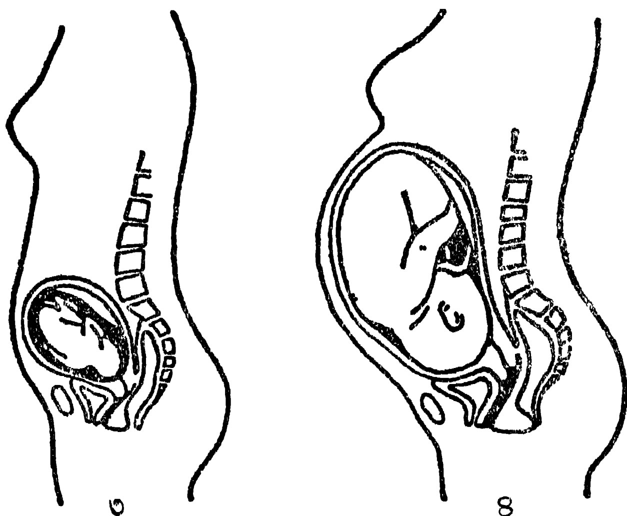
পুবোপুরি বিকশিত হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলি মায়েব শবীব থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীনভাবে কাজ কববারও উপযোগী হয়। ফলে প্রসবেব পব উপযুক্ত ডাক্তাবেব তত্ত্বাবধানে থাকতে পাবলে এই মাসেব শেষাশেষি অকালপ্রসূত শিশুও অনেকসময় বেঁচে যায়।

অষ্টম মাস—এই মাসে আপনাব গর্ভস্থ শিশুব দেহে একটু-একটু কবে মেদ বা চর্বি জমতে শুরু কবে। শিশুটিব ওজন বেড়ে দাঁড়ায চার পাউণ্ডেব মতো। অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ হলে সন্তানেব পক্ষে বেঁচে থাকাব সম্ভাবনাই বেশি।

নবম মাস—এ-মাসে শিশুব মাথা সরু সরু সুন্দব চুলে ভবে যায় এবং সাবা শবীব ছেয়ে ইতিপূর্বে বোঁযাব মতো যে চুল দেখা গিয়েছিল তা বেশিব ভাগই খসে যায। এই শেষ মাসটিতে শিশু দ্রুত বড় হযে ওঠে। জন্মেব সময আমাদেব দেশে সাধাবণ একটি শিশুব ওজন থাকে পাঁচ থেকে ছ-পাউণ্ডেব মধ্যে আব শিশুটি লম্বায় হয ষোলো থেকে আঠাবো ইঞ্চিব মতো। অবশ্য দেশ বা ব্যক্তি-ভেদে এই হিসেবেব তাবতম্য হযে থাকে। যেমন ভাবতীয় ইউনিযনেবই উত্তব-পশ্চিম অংশে কিংবা ইওবোপে বা আমেবিকায় এই ওজন ও মাপজোখ বেশি হওযা সম্ভব। তাছাডা, আমাদেব দেশেব মধ্যেও, প্রসূতিব শ্বশুব ও পিতৃকুলেব বংশপবম্পবাগত গডন, স্বাস্থ্য, প্রসূতিব আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অনুযাযী এই ওজন ও মাপজোখেব তাবতম্য হযে থাকে। তবে, মোটেব ওপব, আমাদেব দেশে নবজাত শিশুব ওজন সাডে চাব পাউণ্ডেব কম হলে তাকে অকালপ্রসূত বা অপুষ্ট এবং সাড়ে সাত পাউণ্ডেব বেশি হলে তাকে একটু অস্বাভাবিক "বডসড়" শিশু বলা হয়।

*আট মাস পূর্ণ হবাব পব আপনাব শিশু যে-কোনো সময়ে জন্মাক

না কেন, জানবেন পূর্ণ ন-মাসে প্রসূত শিশুর সমানই তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা



৩। গর্ভসঞ্চারের পর ষষ্ঠ মাসে ৪। পরিণত গর্ভাবস্থা : সন্তান-জন্মের অব্যবহিত আগে

যমজ সন্তান নির্ণয়—বিশেষ সন্দেহের কারণ না ঘটলে সাধারণত গর্ভে যমজ সন্তান আছে কিনা পরীক্ষা করা হয় না। হাসপাতাল বা প্রসূতি-সদনগুলিতে প্রয়োজন বোধ করলে সন্তানপ্রসবের কাছাকাছি সময়ে এ-রকম পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কিন্তু নিয়ম করে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ-ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না এবং তা সম্ভবও হয় না।

গর্ভে যমজ সন্তান এসেছে কিনা গর্ভাবস্থার প্রথমদিকে তা বোঝবার একমাত্র উপায় হল লক্ষ্য করা—প্রসূতির পেটের আয়তন সময় অনুপাতে যেভাবে বা যতখানি বাড়া স্বাভাবিক তার চেয়ে তাড়াতাড়ি বা বেশি বাড়ছে কিনা। অবশ্য এটা বোঝা সম্ভব একমাত্র সেই ডাক্তারবাবুর পক্ষে, যিনি এ-পর্যন্ত প্রসূতিকে নিয়মিত ভালো করে পরীক্ষা করে আসছেন।

গর্ভে যমজ সন্তান থাকলে এই শেষোক্ত ডাক্তারবাবুর পক্ষে এমন কি আপনার গর্ভাবস্থার চতুর্থ মাসেই তা সন্দেহ করা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তিনি বুঝবেন কী করে? তখনো পর্যন্ত পেটের মধ্যে আপনি কোনো নড়াচড়া অনুভব করছেন না, এবং স্টেথোস্কোপ লাগিয়েও তিনি আপনার শিশুর হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন না তো। তবে? বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে নয়, শুধুমাত্র বাইরে থেকে সাদা চোখে দেখেই ডাক্তারবাবুর সন্দেহ হবে—গর্ভকাল তো মাত্র চার মাসের অথচ পেটের আয়তন দেখে মনে হচ্ছে তা অন্তত পাঁচ কিংবা ছ-মাসের। অবশ্য শুধুমাত্র এইটুকু দেখেই গর্ভে যমজ সন্তান এসেছে বলে সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। কেননা, যমজ সন্তান থাকা ছাড়া আরো নানাবিধ কারণে প্রসূতির পেটের আয়তন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে পারে। যেমন পেটের মধ্যে জল জমা, গর্ভস্থ (একটিই) শিশু আকারে অতিরিক্ত বড় হওয়া, এমন কি প্রসূতির দেহের অস্বাভাবিক গড়নের জন্যে পেটের আয়তন অস্বাভাবিক বড় বলে ভ্রম হওয়া, ইত্যাদি।

ডাক্তাররা সাধারণত গর্ভে যমজ সন্তান আছে বলে সন্দেহ করলেও স্থিরনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা প্রকাশ করেন না। আর এই স্থিরনিশ্চয় হওয়ার একটি প্রধান উপায় এক্স-রে যন্ত্রে প্রসূতির গর্ভস্থ সন্তানের ছবি নেওয়া। কিন্তু ছ-মাস গর্ভকালের আগে ভ্রূণের শরীরে কঙ্কালভিত্তি এতটা ভালোভাবে গড়ে ওঠে না যে এক্স-রে যন্ত্রে তার ছবি উঠবে। আর গর্ভাবস্থার ছ-মাস কেটে যাওয়ার পর শুধুমাত্র গর্ভে যমজ সন্তান আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যেই এক্স-রে পরীক্ষা করতে ডাক্তাররা সাধারণত রাজি হন না। কেননা গর্ভে যমজ সন্তান আছে কিনা নির্ণয় করা সম্ভব হলেও যমজ সন্তানের জন্ম বা বৃদ্ধি রোধ করার কোনো বিশেষ চিকিৎসা ডাক্তারি শাস্ত্রে জানা নেই।

অবশ্য গর্ভাবস্থার শেষের দিকে সাত কিম্বা আট মাসে—বাইরে থেকে প্রসূতির পেট টিপে পরীক্ষা করে এবং স্টেথোস্কোপের সাহায্যে গর্ভস্থ শিশুর হৃদ্‌স্পন্দন শুনে (অর্থাৎ একাধিক ভ্রূণের

হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পেলে) ডাক্তারদের পক্ষে প্রায়ই যমজ সন্তানের উপস্থিতির কথা বলতে পারা সম্ভব হয়।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত—গর্ভাবস্থায় প্রসূতির যে-সমস্ত আপদবিপদ ঘটতে পারে তার মধ্যে প্রধান হল দুটি ঘটনা—গর্ভ বা গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং তার অকাল-প্রসব।

এই প্রথম ব্যাপারটিকে (অর্থাৎ গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিকে) ডাক্তাররা আবার সময়ের অনুপাতে দু-ভাগে ভাগ করে থাকেন -প্রাথমিক অবস্থায় গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব এবং বিলম্বিত গর্ভপাত। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে নিম্নরূপ : (ক) গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসের মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হলে তাকে বলে গর্ভস্রাব বা abortion ; (খ) গর্ভধারণেব চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ মাসের মধ্যে ভ্রূণ নষ্ট হলে তাকে বলে গর্ভপাত বা miscarriage ; এবং (গ) সপ্তম মাস থেকে পূর্ণ গর্ভধাবণকালেব আগে অর্থাৎ গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসের মধ্যে কোনো সময়ে গর্ভস্থ শিশু অপুষ্ট অবস্থায় অথচ জীবিত ও বেঁচে-যাওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত হয়ে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে বলা হয় অপূর্ণ বা অকাল-প্রসব কিংবা premature delivery। ইংবেজিতে miscarriage শব্দটি অবশ্য খাঁটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা প্রাথমিক অবস্থায় গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব এবং বিলম্বিত গর্ভপাত এই দুই ক্ষেত্রেই abortion শব্দটি ব্যবহার করেন, কেবল অবস্থাব তারতম্য বোঝানোর জন্যে যথাক্রমে early abortion ও late abortion শব্দ দুটি ব্যবহার করে থাকেন। বাংলায় আমবা গর্ভপাতের ঐ প্রাথমিক ও বিলম্বিত দুটি পর্যায়কে যথাক্রমে শুধুমাত্র গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত নামেই অভিহিত করব। এছাড়া অকাল-প্রসব বা premature delivery নামের ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আপাতত আলোচনা করব না, পরে সন্তান-প্রসব-সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের উপসর্গ—গর্ভধারণেব প্রথম তিন মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব বা early abortion ঘটলে সূচনা হিসেবে সাধারণত প্রথমে দেখা দেয় যোনিমুখ থেকে বক্তপাত ও সেই সঙ্গে পেটে ও কোমরে খানিকটা প্রসব-বেদনা ধবনেব বেদনা। অবশ্য এই ব্যথা সচবাচব প্রসব-বেদনাব মতো অত তীব্র হয় না।

গর্ভাবস্থাব মাঝেব তিন মাসে গর্ভপাত বা late abortion ঘটলে তাব সূচনা হিসেবে ওই গর্ভস্রাবেব সমস্ত লক্ষণ তো দেখা যায়ই, উপবন্ত কখনো কখনো আবো একটি উপসর্গ প্রথমেই দেখা দিয়ে থাকে। সেটি হল একেবাবে গোড়াতেই প্রসূতিব জবায়ুব মধ্যেকার অ্যাম্‌নিয়টিক্ জলেব থলিটি ফেটে যাওয়া। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে যোনিমুখ থেকে অনববত জল ভাঙতে থাকে, কখনো কখনো তার সঙ্গে এক-আধটুকু বক্তমোক্ষণও হয়, আবাব কখনো বা তাও হয় না। এ-সব ক্ষেত্রে গর্ভপাত সাধাবণত দু-চাব দিন কিংবা বড জোব এক সপ্তাহেব মধ্যে ঘটে যায। অবশ্য, এক-আধটি ক্ষেত্রে, জলেব থলি জবায়ুব ওপব দিকে কোনো জাযগায চিড খেয়েছে বলে এমন ঘটে থাকলে, দেখা যায়, জল ভাঙা ক্রমে বন্ধ হযে গেছে এবং প্রসূতি গর্ভপাতেব হাত থেকে বেহাই পেযেছেন। তবে এ-বকম ঘটনা খুবই বিবল।

যে-কোনো ক্ষেত্রে যোনিমুখ থেকে বক্ত পডা কিংবা পেটে-কোমবে বেদনা অনুভব কবলে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটতে চলেছে বলে মনে কবতে হবে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে উপবোক্ত এক বা একাধিক উপসর্গ গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতেব প্রাথমিক লক্ষণ তা নাও হতে পাবে। অন্য নানাবিধ কাবণেও গর্ভাবস্থায অল্পস্বল্প বক্তক্ষরণ কিংবা পেটে-কোমবে বেদনা দেখা দিতে পাবে। কিন্তু তবু গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত সর্বথাই অবাঞ্ছিত ও মাবাত্মক ঘটনা এবং এব ফলাফল প্রসূতিব পক্ষেও গুরুতব হয়ে উঠতে পাবে বলে সাবধানেব মাব নেই। একই সঙ্গে বক্তক্ষবণ দেখা দিলে ও পেটে-কোমবে বেদনা অনুভব কবলে—বিশেষ সে-বক্তক্ষবণ নজবে পডবাব মতো ও অনবরত হতে

থাকলে এবং আনুষঙ্গিক বেদনা কষ্টদায়ক হয়ে উঠলে—জানবেন আব ভুল নেই, এরকম ক্ষেত্রে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত প্রায়ই অবধারিত হয়ে থাকে। তখন অবিলম্বে ডাক্তার ডাকবেন বা হাসপাতালের শবণাপন্ন হবেন।

এখন দেখা দবকাব, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হয় না অথচ গর্ভাবস্থায় কোনো-না-কোনো সময়ে বক্তক্ষবণ কিংবা পেটে-কোমরে বেদনা দেখা দেয। গর্ভাবস্থাব একেবাবে গোড়ার দিকে কয়েক মাস যোনিমুখ থেকে বক্তক্ষবণ হতে দেখলেই তাকে সম্ভাব্য গর্ভস্রাবের সূচনা বলে ধবতে হবে। তবে, আগে আলোচনা কবা হয়েছে যে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাক্তাবদেব মতে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদেব মধ্যে শতকবা প্রায পঁচিশ জনেবই গর্ভাবস্থাব প্রথম তিন মাসে অল্পস্বল্প বক্তক্ষবণ হযে থাকে, অথচ এই পঁচিশ জনেব তিন ভাগেব দু-ভাগ মেয়েই স্বাভাবিকভাবে গর্ভধাবণ ও শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক সুপ্রসব করে থাকেন। কখনো কখনো প্রথমবাবেব বাদ-পড়া মাসিক ঋতুস্রাবেব সমযটায় কিংবা সম্ভাব্য দ্বিতীয ঋতুস্রাবেব সময় নাগাদ এইবকম বক্তক্ষবণ দেখা দেয। তবে এ-ধবনেব বক্তক্ষরণ যদি অপেক্ষাকৃত স্বল্পকাল স্থাযী হয—অর্থাৎ দু-চাব দিনেব মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায, পবিমাণেব দিক থেকে স্বাভাবিক ঋতুস্রাবেব চেয়ে বক্তক্ষবণ কম হয় এবং এব সঙ্গে যদি পেটে-কোমবে মোচড়ানো-ব্যথা না থাকে তাহলে মনে কবতে হবে গর্ভাবস্থা মোটেব ওপব স্বাভাবিকই আছে এবং স্বাভাবিক সুপ্রসবেব সম্ভাবনাও প্রবল।

আবাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায হঠাৎ বেশ বেশি পবিমাণে স্রাব হতে শুরু হল এবং বক্তক্ষবণ প্রসূতিব স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের পবিমাণের চেয়েও বেশি। স্রাবেব পবিমাণ ও হু-হু করে রক্তক্ষবণ হতে দেখে ভয় হলেও এ-ধবনেব বক্তস্রাব আবার হঠাৎ-ই একদিন বন্ধ হয়ে যায়। তাবপর কয়েকদিন শুধু কাপড়ে অল্পবিস্তর দাগ লাগতে দেখা যায় এবং পবে তাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রসূতির জরায়ুর দেযালে প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল নামের অঙ্গটি ক্রমশ নিজেকে

বিস্তার করার সময় কখনো কখনো গর্ভফুলের সীমানার কাছাকাছি জরায়ুর দেয়ালের কোনো রক্তবহা নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার জন্যেই এই শেষোক্ত ধরনের রক্তস্রাব ঘটে। তবে এরকম রক্তস্রাবের সঙ্গে আনুষঙ্গিক পেটে-কোমবে বেদনা দেখা যায় না এবং এ-ধবনের আকস্মিক ঘটনাব পব থেকে গর্ভ আবাব স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হতে থাকে।

এছাড়া পেটে-কোমবে মোচড়ানো-ব্যথা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রসূতিব জানা দবকাব যে গর্ভাবস্থাব গোড়াব দিকে ওই ধবনেব বেদনা দেখা দিলেও, যদি তাব সঙ্গে আনুষঙ্গিক বক্তক্ষবণ না থাকে, তবে খুব বেশি চিন্তিত হবাব কাবণ নেই। তবে এ-কথা গর্ভাবস্থাব গোড়াব কযেক মাস সম্পর্কেই শুধু প্রযোজ্য, জানবেন।

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের ধরন—যোনিমুখ থেকে বক্তক্ষবণ যদি দু-চাব দিনে বন্ধ না হয, বক্তক্ষবণ স্বাভাবিক ঋতুস্রাবেব পবিমাণেব সমান হচ্ছে বলে সন্দেহ হয, যদি সেই স্রাবেব বঙ্ একদিন কালচে-লাল, একদিন বাদামি, ফেব একদিন কালচে-লাল হতে থাকে—তখন, এমন কি পেটে-কোমবে বেদনা অনুভব না কবলেও জানবেন, বিপদ সমূহ। হযতো দেখবেন এবই সঙ্গে গর্ভাবস্থাব অন্যান্য উপসর্গগুলি হঠাৎ উবে গেছে। গা-বমিব ভাব আচমকা কমে গেছে, স্তনদ্বয় দেখতে আগেব চেযে ছোট লাগছে, তাদেব স্পর্শকাতবতাও কমেছে। বক্তক্ষবণেব সঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণ দেখলেই জানবেন ইতিমধ্যে আপনাব গর্ভস্থ ভ্রূণটি নষ্ট হযে গেছে এবং এখন সেটি জবাযু থেকে বেবিযে যাবাব অপেক্ষায আছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবাব বক্তক্ষবণ হযতো নামমাত্র হবে কিন্তু পেটে-কোমবে কন্‌কনে কিংবা মোচডানো ব্যথাটা হয়তো মাবাত্মক হয়ে উঠবে। এ-সব ক্ষেত্রে অবশ্য ভ্রূণ নষ্ট হযে গেছে কিনা তা ডাক্তারবাবুব পক্ষেও নিশ্চয় কবে বলা সম্ভব নয়। কেননা, এই উপবোক্ত যন্ত্রণার কাবণটি বোঝা তাঁব পক্ষেও সহজ নয়। সাধারণ

ক্ষেত্রে অবশ্য প্রসবের সময়ে যে-কারণে বেদনা ওঠে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের সময়েও সেই একই কারণে বেদনা অনুভূত হয়। সেই কারণটি হল জরায়ুর সংকোচন। ক্রমাগত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে জরায়ু তার নিজের শরীরের ভিতর থেকে মৃত ভ্রূণটিকে প্রথমে ও গর্ভফুল ইত্যাদিকে পরে বের করে দিতে চায়। কিন্তু উপরোক্ত কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই সংকোচন জরায়ুর না হয়ে প্রসূতির ক্ষুদ্রান্ত্র ইত্যাদি পরিপাকযন্ত্রেরও হতে পারে।

এছাড়া আরো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুদিন ধরে অল্পঅল্প অথচ অনবরত রক্তক্ষরণের পর প্রসূতির শরীরে গা-ম্যাজমেজে ভাব, শীতবোধ, জ্বরভাব এবং কখনো কখনো এর সঙ্গে আচমকা বমি কিংবা গা-বমির ভাব দেখা দিতে পারে। এ-সব ক্ষেত্রে এর পরেও হয়তো রক্তক্ষরণ চলতে থাকবে এবং এক সময় খেয়াল হবে যে জরায়ু স্বভাবত যতটা বড় হওয়া উচিত তা হয়নি। এ-ধরনের ব্যাপার ঘটলে বুঝতে হবে, ভ্রূণটি ইতিপূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে, উপরন্তু সেই মৃত ভ্রূণ ইত্যাদির বিষ প্রসূতির শরীর শুষে নিচ্ছে বলে এই বিপত্তি। এক্ষেত্রে মৃত ভ্রূণটি দ্রুত প্রসূতির শরীর থেকে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার এও দেখা যায়, কোনো প্রসূতির পেটে-কোমরে বেদনাও অনুভূত হচ্ছে, রক্তক্ষরণও হচ্ছে এবং তাঁর গর্ভাবস্থা যে আর বিকশিত হচ্ছে না (অর্থাৎ, জরায়ু আকারে বাড়ছে না, স্তনদ্বয় ছোট ও শিথিল হয়ে গেছে এবং গর্ভাবস্থার সমস্ত লক্ষণ অন্তর্হিত হয়েছে) তাও বোঝা যাচ্ছে, অথচ গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত হচ্ছে না। অর্থাৎ, জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণটি নষ্ট হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু জরায়ু সক্রিয় হয়ে উঠে ওই মৃত ভ্রূণ ইত্যাদিকে বের করে দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা কতদূর এগিয়েছে ইতিকর্তব্য তার ওপরই নির্ভর করছে। গর্ভধারণ-কাল যদি তিন বা চার মাসের হয় এবং রক্তক্ষরণ যৎসামান্য হতে থাকে তাহলে ডাক্তার-বাবু প্রসূতিকে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেবেন। কেননা অসময়ে জবরদস্তি জরায়ুকে খালি করে ফেলার চেষ্টা এ-সমস্ত ক্ষেত্রে

অনেকসময় জটিলতার সৃষ্টি করে। সাধারণত এ-রকম ক্ষেত্রে অপেক্ষা করার ফল·ভালোই হয়, কেননা সময় উপস্থিত হলে জরায়ু আপনা থেকেই নিজেকে খালাস করে ফেলে।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের চরম পরিণতি হচ্ছে জরায়ু খালি করে মৃত ভ্রূণটির বেরিয়ে যাওয়া। ভ্রূণ বেবোনোব সময় নিকটবর্তী হলে পেটের-কোমরের বেদনা বাড়তে থাকে। কখনো কখনো এই বেদনা স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুস্রাবের কিংবা দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তীকালীন ডিম্বস্ফোটনেব সময়কাব মতো হয়, কখনো বা এব তীব্রতা প্রায় প্রসববেদনারই সমান হয়। সঙ্গে সঙ্গে যোনিমুখ থেকে রক্তক্ষরণও বৃদ্ধি পায় এবং বড় বড় চাপবাঁধা রক্ত পড়তে থাকে। অবশেষে মৃত ভ্রূণটি জবায়ু থেকে জবায়ুমুখ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং যোনির মধ্যে দিয়ে বাইবে বেবিয়ে আসে। ভ্রূণ বেবিয়ে যাবাব পর গর্ভফুল ইত্যাদিও বেবিয়ে যায়। এইভাবে জবায়ুটি ফাঁকা হয়ে গেলে বক্তস্রাব আপনিই কমে আসে।

এভাবে জবায়ুটি দ্রুত পুবোপুবি খালি হয়ে গেলে অবশ্য খুব কিছু লম্বা-চওড়া চিকিৎসাব বা ডাক্তাব-বদ্যি ও হাসপাতালের দবকার কবে না। কিন্তু যদি তা না হয়? যদি দেখা যায় মৃত ভ্রূণটি জরায়ু থেকে সহজে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে না, সময় নিচ্ছে, অথচ ইতিমধ্যে গুরুতর বক্তক্ষবণ হচ্ছে ও যন্ত্রণা উত্তবোত্তব বেড়ে চলেছে; কিংবা মৃত ভ্রূণ বেবিয়ে এলেও গর্ভফুল যদি বেবিয়ে না যায় এবং বক্তস্রাব ইত্যাদি অনেকক্ষণ ধবে চলে তাহলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকা দরকার এবং প্রয়োজনমতো হাসপাতালেও স্থানান্তব কবাব ব্যবস্থা করা দবকাব। কেননা এ-ধবনেব বিভ্রাট একমাত্র বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা হাসপাতালেব সাহায্যেই মেটানো সম্ভব। এই বিভ্রাট মেটাতে ডাক্তাববাবুকেও খুব সম্ভব হাসপাতালেব সাহায্য নিতে হবে। সাধাবণত এ-সব ক্ষেত্রে গর্ভফুল বা তার অংশবিশেষ বের করার জন্যে ডাক্তারবাবুকে ছোট্ট একটি অস্ত্রোপচাবেব সাহায্য নিতে হয়। ইংরেজিতে এই অস্ত্রোপচারের নাম কিউরেট করা বা curettage।

এর জন্যে প্রসূতিকে প্রথমে ওষুধের সাহায্যে অজ্ঞান বা মোহাচ্ছন্ন করে নেওয়া হয়, তারপর অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারটি আর কিছুই নয়, জরায়ুর মুখ সামান্য একটু ফাঁক করে নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে জরায়ুর ভেতরকার দেয়াল বা আবরণটি আস্তে আস্তে চেঁচে গর্ভফুল বা তার অংশবিশেষ বের করে ফেলা। এই অস্ত্রোপচারে কোনো কাটা-ছেঁড়ার ব্যাপার নেই এবং এব ফলে প্রসূতিকেও কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের কারণ—বিদেশী বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় দশ জনের গর্ভকাল গর্ভাবস্থার প্রথম ছ-মাসেব মধ্যে, অর্থাৎ গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতে, শেষ হয়। এই শতকবা দশ জনেব মধ্যে আবার অধিকাংশেরই গর্ভকাল শেষ হয় গর্ভস্রাবে বা প্রথম তিন মাসের মধ্যে। এ-ছাড়া আরো একটা ব্যাপাব লক্ষ্য কবা যায়। নানাবিধ কাবণে প্রসূতিদের মধ্যে কাবো কাবো দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি গর্ভসঞ্চারের চেয়ে প্রথম-বারের গর্ভসঞ্চারই গভস্রাব-গর্ভপাতে পবিণত হয় বেশি।

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত নানা কাবণে হতে পাবে। সাধারণত একটা চলতি ধারণা দেখা যায় যে এব জন্যে বুঝি প্রসূতির স্বাস্থ্যবিধি পালন না করাই দায়ী—যেমন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত বা দূর পাল্লার ভ্রমণ, মাত্রা-ছাড়ানো স্বামী-সহবাস ইত্যাদি, কিংবা বড় জোর পেটে আঘাত পাওয়া, পড়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা। অর্থাৎ, এক কথায়, গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের জন্য প্রসূতিকেই দায়ী করা হল সাধারণ মানুষের রীতি। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে উপরোক্ত কারণগুলির জন্যে কখনো যে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটে না তা নয়, তবে এটা বিরল ঘটনা; প্রসূতির কিছু করা বা না-করার ওপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাত ইত্যাদি আসলে নির্ভর করে না।

যেমন, ধরুন, গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যে-সমস্ত গর্ভস্রাব ঘটে সাধারণত তার কারণ নারীর জনন-অঙ্গজনিত বিভ্রাট।

এরকম ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষ শুক্রকীটের সঙ্গে মিলিত হবার পর গর্ভিণী স্ত্রী-ডিম্বটি জরায়ুর দেয়ালে ঠিকমতো বাসা বাঁধতে পারেনি। ফলে ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন অল্প-অল্প রক্তক্ষরণ দেখা দেবার কয়েকদিন আগে, এমন কি এক বা একাধিক সপ্তাহ আগেই, স্ত্রী-ডিম্বটি মরে গেছে। এছাড়া প্রসূতির শরীরে এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির কোনো রকম গোলমাল ঘটলে, গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে কর্পাস লিউটিয়ম নামের অঙ্গটি নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরণে গোলমাল দেখা দিলেও গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সর্বোপরি, প্রসূতির শরীরে কোনো কোনো ধরনের অসুখ কিংবা নারী-জননঅঙ্গের অসুখ থাকার জন্যেও গর্ভপাত ঘটা আশ্চর্য নয়।

প্রসূতির অত্যধিক মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা বিশেষ করে হিস্টিরিয়া প্রবণতা থাকলেও তা গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের একটা কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। আমরা দেখেছি, গুরুতর চিত্তচাঞ্চল্যের ব্যাপার ঘটলে মানুষের মুখ হয় মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায় নয়তো টকটকে লাল হয়ে ওঠে। এমন কি, এ-কারণে মাথায় রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে মানুষ জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি অত্যধিক মানসিক চাঞ্চল্যের দরুন জরায়ুতে রক্ত-সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটলে সে-অঙ্গটি এত জোরে সংকুচিত হতে পারে যে তার জন্যে গর্ভফুলটি জরায়ুর দেয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। ফলে রক্তক্ষরণ, পেটে-কোমরে বেদনা এবং অবশেষে গর্ভপাত ইত্যাদি সবকিছুই ঘটার সম্ভাবনা।

সবশেষে, সচরাচর যে-দুটি কারণে গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটতে দেখা যায় সে দুটি কারণ ভালোভাবে উল্লেখ করা দরকার। তারা হল— (১) স্বামী সিফিলিস বা উপদংশ নামের যৌনব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হলে ও সেই রোগ স্ত্রীর শরীরে সংক্রামিত করে থাকলে; এবং (২) স্ত্রীর জননঅঙ্গে অপরিণতি থেকে থাকলে, অর্থাৎ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জননঅঙ্গ যতখানি বড় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক তা না

হলে। অবশ্য সবক্ষেত্রেই গর্ভপাত ইত্যাদির কারণ যে ওই উপরোক্ত সিফিলিস কিংবা স্ত্রীর জননঅঙ্গের অপরিণতি, তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তবু বারবার প্রসূতির গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটছে দেখলেই প্রথমে ওই দুটি কারণের অস্তিত্ব সন্দেহ করা ভালো এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ভালোভাবে পরীক্ষা করানো দরকার।

পৌনঃপুনিক গর্ভস্রাব—প্রসূতি যদি মোটের ওপর সুস্থদেহ ও নীরোগ হন—অর্থাৎ তাঁর সিফিলিস রোগ বা জননঅঙ্গের অপরিণতি কিংবা অন্য কোনো গুরুতর অসুখ বা স্ত্রী-রোগ না থেকে থাকে—তাহলে গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে একবার কি দু-বার গর্ভস্রাব ঘটলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা এরকম ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় দ্বিতীয় কি তৃতীয় গর্ভকাল শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে যায় এবং সুপ্রসব হয়। যেমন অন্যান্য প্রসূতির বেলায় তেমনি এই প্রথমোক্ত প্রসূতিরও পববর্তী গর্ভকালের ক্ষেত্রে, গর্ভাবস্থা স্থায়ী হবার সম্ভাবনা শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগের মতোই।

কিন্তু যদি কোনো প্রসূতির পর পর তিনবার গর্ভস্রাব ঘটে যায় তাহলে অবশ্য সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। গর্ভস্থ ভ্রূণ জরায়ুর দেয়ালে প্রোথিত হবার মুখেই যেহেতু গর্ভকাল স্থায়ী হবে কিনা সে-প্রশ্নের প্রাথমিক মীমাংসা হয়ে যায়, সেইহেতু প্রথম বারের বাদ-পড়া মাসিক ঋতুস্রাবের সময় আসার আগেই—গর্ভসঞ্চার হয়েছে বা হতে পারে এমন সন্দেহ হওয়ামাত্রই—এ-ধরনের প্রসূতির চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া দরকার। এই চিকিৎসার ভিত্তি খুবই বিস্তারিত ও কষ্টসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রসূতির শরীরে বা মনে কোনো রকম অসুখবিসুখ, জননঅঙ্গের অপবিণতি বা রোগ, এণ্ডোক্রিন ইত্যাদি গ্রন্থিগুলির ক্ষরণে গোলমাল ইত্যাদি আছে কিনা সমস্তই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, কোনো কোনো প্রসূতির মধ্যে এরকম

পৌনঃপুনিক গর্ভস্রাব ঘটার দিকে একটা প্রবণতা দেখা যায়। "প্রবণতা" বলা হচ্ছে এই কারণে যে এ-রকম পৌনঃপুনিক দুর্ঘটনার শারীরিক-মানসিক কোনো স্পষ্ট কারণ অনেক সময় পাওয়া যায় না। এ-প্রবণতাকে অস্বীকার না করেও বলা যায়, পৌনঃপুনিক গর্ভস্রাব কিন্তু অনেক সময়ই ঠিক প্রবণতার নয়, আকস্মিকতার ফল। এমন কি, পর পর তিনবারও নিছক আকস্মিকভাবে গর্ভস্রাব ঘটতে পারে। এ-কারণে তিনবাবের পৌনঃপুনিকতা দেখে ও তার কোনো শারীরিক-মানসিক কারণ খুঁজে না পেয়ে, প্রসূতির মধ্যে গর্ভস্রাব ঘটার দিকে প্রবণতা আছে মনে করা এবং তাঁব কষ্টলাঘবেব উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ গর্ভসঞ্চারের পথরোধ করার ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে ঠিক সমীচীন নয়।

পৌনঃপুনিক গর্ভপাত—গর্ভাবস্থাব প্রথম তিন মাসে গর্ভস্রাবের চেয়ে মাঝের তিন মাসে গর্ভপাতেব মতো ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। ফলে পৌনঃপুনিক গর্ভস্রাবেব চেয়ে পৌনঃপুনিক গর্ভপাতও অপেক্ষাকৃত বিরল। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের পক্ষে এটা একটা খুব বড় ভবসার কথা।

অবশ্য যে-কোনো মেয়েবই কোনো-না-কোনো গর্ভকালে এক-আধবার গর্ভপাত ঘটতে পাবে। এ-দেখে সাংঘাতিক বিচলিত হবার কিছু নেই। কেননা হয়তো দেখা যাবে যে সেই বিশেষ মেয়েটির পববর্তী গর্ভ ঠিকভাবেই বেড়ে উঠল ও সুপ্রসব হল।

তবে, এমন কিছু ভাগ্যহীন মহিলাও আছেন, যাঁদের মধ্যে পৌনঃপুনিক গর্ভপাতেব প্রবণতা দেখা যায়। এই ধবনেব কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসূতির দেহে খুব বেশি রক্তচাপ (high blood pressure) কিংবা বৃক্ক (kidney) বা মূত্রগ্রন্থিব গোলমাল পাওয়া যায়। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো কিছুই পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয়, এ-পর্যন্ত এ-রকম পৌনঃপুনিক গর্ভপাতের ফলপ্রদ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। কেবলমাত্র প্রসূতির সাধারণ স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার উন্নতিবিধান

এবং পথ্য সবরকমের খাদ্যগুণযুক্ত ও ত্রুটিহীন করা ছাড়া এ-বিভ্রাটে ডাক্তারদের আর কিছু করার নেই, এর আর কোনো ওষুধ বা চিকিৎসাও নেই। প্রসূতির যদি একেবারেই কোনো সন্তানাদি না থাকে, সন্তানলাভের জন্যে তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হন এবং তাঁর শরীর সুস্থ ও সক্ষম থাকে তাহলে এ-দুর্ভাগ্যের চিকিৎসার ভার অংশত প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি (অর্থাৎ পরের বার আকস্মিকভাবে গর্ভকাল স্থায়ীও হয়ে যেতে পারে এই আশায়) ধৈর্য ধরতে পারেন। এর ফলে, বলা যায় না, তৃতীয়, চতুর্থ বা পববর্তী কোনো এক গর্ভ টিকেও যেতে পারে। কিন্তু শরীর যথেষ্ট সুস্থ ও সক্ষম না হলে এরকম ক্ষেত্রে হয় গর্ভসঞ্চার একেবারে রোধ করা, নয়তো গর্ভাবস্থার একেবাবে গোড়ার দিকে উপযুক্ত চিকিৎসকের পবামর্শে ও তত্ত্বাবধানে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব ঘটানোই নিরাপদ। কেননা, তা না করলে প্রসূতির জীবনই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত—কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত ঘটানো আইনসম্মত ব্যাপাব নয়। প্রসূতির জীবনরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া অন্য কোনো কাবণে ভ্রূণহত্যা নিশ্চয়ই অবৈধ। কিন্তু অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ধাত্রীবিৎ যদি প্রসূতির প্রাণবক্ষাব জন্যে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটানো প্রয়োজন মনে করেন তো তাতে কোনো বাধা হয় না। আগেই বলেছি, এইরকম একটি প্রয়োজনের ক্ষেত্র হল, যে-প্রসূতিব পৌনঃপুনিক গর্ভপাতের প্রবণতা রয়েছে এবং যাঁর স্বাস্থ্য উদ্বেগজনক, দরকার বোধ করলে কৃত্রিম উপায়ে তাঁর গর্ভস্রাব ঘটিয়ে প্রসূতির প্রাণরক্ষা করা। এছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রেও, প্রসূতির কোনো কঠিন অসুখ হয়ে থাকলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক যদি বোঝেন যে তাঁকে ওই অসুখের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে এমন ওষুধপত্র দেওয়া দরকার যার ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণ মারা যেতে পারে বা নিশ্চয়ই মারা পড়বে, তাহলে শুধুমাত্র ভ্রূণটিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রসূতিকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া থেকে তিনি কখনোই

বিরত হন না। কেননা, তিনি জানেন, এর ফলে বিপদ আরো গুরুতর হতে পারে, প্রসূতি ও ভ্রূণ দুজনেই মারা পড়তে পারে। এক্ষেত্রে ওই সব কড়া ওষুধের ক্রিয়ায় ভ্রূণটি মারা গেলে প্রসূতির জরায়ু সাধারণত আঁপনা থেকে সংকুচিত হয়ে মৃত ভ্রূণটিকে বের করে দেয়। '

সম্ভাব্য গর্ভস্রাব ও গর্ভপাতের চিকিৎসা—ডাক্তারবাবুর সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব-গর্ভপাত অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ঘটনাটা সমস্ত পক্ষের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে ঘটে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে গর্ভস্রাব-গর্ভপাতের মতো অনিচ্ছাকৃত ও আকস্মিক দুর্ঘটনা রোধ করার উপায় কি? চিকিৎসা কি?

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রথমেই অবশ্য ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে। প্রসূতিকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্র শুশ্রূষা ইত্যাদির সমস্ত ব্যবস্থা তিনিই দেবেন। তবু রোগিণীর অবশ্য-পালনীয় দু-একটি কর্তব্য নিয়ে এখানে কিছুটা আলোচনা করলে ক্ষতি নেই।

আমরা জানি, বিশ্রামই হল এ-উপসর্গের প্রাথমিক চিকিৎসা। সম্ভাব্য গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়ামাত্রই বিছানা নেওয়া ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ -এই হল চিকিৎসার একেবারে গোড়ার কথা। এরপর যতদিন পর্যন্ত কাপড়ে দাগ লাগবে, অর্থাৎ রক্তক্ষরণ হতে থাকবে, প্রসূতিকে ততদিন পুরোপুরি শয্যাশায়ী থাকতে হবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে অবশ্য গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের সম্পর্কের ব্যাপারে খুব নিশ্চিত নন। তাঁরা এও বলেন যে একবার গর্ভপাত ইত্যাদির লক্ষণ দেখা দিলে শারীরিক বিশ্রাম বা বিশেষ বিশেষ ওষুধবিষুধ তা নিবারণ করতে কতদূর সক্ষম তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। বরং ডাক্তারদের মধ্যে যাঁরা শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্রঘরের প্রসূতিদের চিকিৎসা

করেছেন তাঁরা বলেন, ওই সমস্ত ঘরের মেয়েরা রক্তক্ষরণ হতে দেখলেও তাঁদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করেন না বা করতে পারেন না। অথচ এঁদের মধ্যে একটা বড় অংশই পূর্ণ গর্ভধারণকাল যাপন করেন ও পরিণত পুষ্ট শিশুর জন্ম দেন।

তবে মনে রাখতে হবে এ-ব্যাপারে এখনো নানা মুনির নানা মত। এমনিতে অবশ্য দেখা যায়, সাধারণত কোনো প্রসূতির গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের আশঙ্কা দেখা দিলে আত্মরক্ষার তাড়নায় আপনা থেকেই (তাঁর আর্থিক-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী) তিনি অন্য সময়ের চেয়ে কম পরিশ্রম করেন বা পূর্ণ বিশ্রাম নেন। মোট কথা এ-সময়ে কাজ করার চেয়ে বিশ্রাম নেওয়াটা অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ এবং এতে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাটাই বেশি বলে গর্ভস্রাব ইত্যাদির সম্ভাবনা দেখা দিলে সম্ভবস্থলে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়াই ভালো।

সম্ভাব্য গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতেব সূচনা দেখা দিলে প্রসূতিকে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া আরো একটা ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। তাঁকে স্বামীর সঙ্গে সমস্ত যৌন-সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা, প্রথমত, যৌন-সংসর্গের ফলে প্রসূতির উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে জরায়ুর সংকোচন প্রবল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর যে-জরায়ু ইতিপূর্বেই উত্তেজিত অবস্থায় আছে তাকে আরো বেশি উত্তেজনা যোগালে জরায়ু থেকে ভ্রূণটি বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এ-সময়ে জরায়ুমুখ অল্পবিস্তর খুলে যায় বলে স্বামী-সহবাসের ফলে প্রসূতির দেহে নতুন করে রোগজীবাণুর সংক্রমণও ঘটতে পারে কিংবা জরায়ুর মধ্যে খানিকটা মৃত কোষসমষ্টি বা বিজাতীয় পদার্থ ঢুকে পড়তে পারে।

গর্ভপাত-নিরোধক ওষুধবিষুধ—গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের লক্ষণ দেখা গেছে এমন প্রসূতিদের তিন ভাগের এক ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়,

রক্তক্ষরণের সূচনা হওয়ার সময়েই ভ্রূণটি হয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অতএব এঁদের ক্ষেত্রে আর কোনো চিকিৎসাই ফলপ্রদ হয় না। এছাড়া অপর দু-ভাগ প্রসূতির বেলায় সম্ভবত কোনো চিকিৎসার দরকারই পড়ে না। কেননা, এঁদের বেলায় যে অল্পস্বল্প রক্তক্ষরণ দেখা যায় তা হল গিয়ে জরায়ুর দেয়ালের আবরণের ওপর ক্রমবর্ধিষ্ণু গর্ভফুলের কামড়ের ফলাফল মাত্র। কেবলমাত্র নারী-জননঅঙ্গের কিছু কিছু অপূর্ণতার জন্যে এবং বলকারক পথ্যের অভাবে যে সামান্য কিছুসংখ্যক ক্ষেত্রে গর্ভস্রাব ইত্যাদির লক্ষণ দেখা দেয়, ওষুধবিষুধ সম্ভবত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়াতে খানিকটা সাহায্য করে।

বেশ কয়েক বছর ধরে নানা জাতের ওষুধবিষুধ, হর্মোন এবং ভিটামিন সম্ভাব্য গর্ভস্রাব ইত্যাদির চিকিৎসায় আশু প্রয়োজনীয় বলে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু এর কোনো একটি যে সর্বত্র ও সর্বদা সমান ভাবে কার্যকরী, এমন কথা জোর করে বলা শক্ত। ভিটামিন-ই, প্রোজেস্টিরোন হর্মোন, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি স্টিলবেস্‌ট্রেরল নামে একরকম ইস্ট্রোজেনজাতীয় তীব্র উত্তেজক হর্মোন, 'ফ্ল্যাভো-নয়েড'-মিশ্রিত এক ধরনের ভিটামিন-সি—এমনি নানা ধরনের ওষুধবিষুধের মধ্যে এক-একটা একেক সময়ে ডাক্তারমহলে রীতিমতো সোরগোল তুলেছে। যেমন বর্তমানে স্টিলবেস্‌ট্রেরল বা আরো সম্প্রতি 'ফ্ল্যাভোনয়েড'-মিশ্রিত এক ধরনের ভিটামিন-সি নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক যে এদের মধ্যে কোনো একটিকে সর্বক্ষেত্রে "মহৌষধ" বলে গণ্য করা চলে না। বরং বলা চলে, নারী-জননতন্ত্রের একেক ধরনের অপূর্ণতায় কিংবা একেক ধরনের গ্রন্থিক্ষরণ বা হর্মোনের অভাবে গর্ভস্রাব ইত্যাদি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে উপরোক্ত একেকটি ওষুধ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খানিকটা কাজে লাগে। কোনো এক ক্ষেত্রে যদি স্টিল্‌বেস্‌ট্রেরল কাজে লাগে তো প্রোজেস্টিরোন্ উপকারে আসে অন্য এক ক্ষেত্রে; ভিটামিন-ই এক জায়গায় খেটে গেলে, সিট্রাস ফ্ল্যাভোনয়েড্‌স্

কেরামতি দেখায় আরেক জায়গায়। কিন্তু যেহেতু গর্ভস্রাব ইত্যাদির বিশিষ্ট কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, চিকিৎসককে সময়-সময় একাধিক ওষুধ প্রয়োগ করে তাই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে হয়।

চার। ভাবী মায়ের স্বাস্থ্যবিধি

গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব সম্পর্কে অনেক মেয়ের মনে অনেকরকম অমূলক ভয় আছে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাকে কেউ কেউ বলেন 'সুস্থ থেকেও এ একরকম অসুস্থ অবস্থা'। আবার অনেকে একে রীতিমতো অসুস্থ অবস্থা মনে করে ভীত হয়ে পড়েন।

ভাবী মাকে কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার মনে রাখতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা মোটেই অসুস্থ অবস্থা নয়। তাহলে অসুস্থ অবস্থা কাকে বলে? তার আগে দেখা যাক সুস্থ অবস্থাটাই বা কী। মানুষের শরীরের ভেতরকার ও বাইরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহযোগিতা করে ও শরীরটাকে সচল রাখে তখন সেই অবস্থাকে আমরা বলি সুস্থ অবস্থা। এই সামঞ্জস্য ও সহযোগিতাই যখন বাধা পায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তখন তাকে বলি আমরা অসুস্থ অবস্থা। মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা কিন্তু মোটেই এই সামঞ্জস্যের অভাবের ফলে ঘটে না; এ অবস্থায় সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার ধরনটা খালি পাল্‌টে যায়, সামঞ্জস্যের রকম-ফের হয় মাত্র। এমন কি অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানী এরকম কথাও বলে থাকেন যে স্বাধীন বাধামুক্ত বিকাশের জন্যে মেয়েদের শরীরে যে বিশেষ ধরনের সামঞ্জস্য ঘটার প্রয়োজন থাকে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাটি ঠিক সেই ধরনের সামঞ্জস্যই ঘটিয়ে দেয়।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা মোটেই অসুস্থ অবস্থা নয়, এ হল সুস্থ অবস্থার রকম-ফের মাত্র। এই রকম-ফের ঘটার দরুন নানা ধরনের উপসর্গ অবশ্য দেখা দেয়, কিন্তু তাই বলে সেই উপসর্গ-গুলিকে অসুখের লক্ষণও বলা চলে না। তবে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা তো সুস্থ অবস্থার রকম-ফের, তাই গর্ভবতী হবার আগে স্বাভাবিক

অবস্থায় মেয়েদের শরীর যে রকম সব নিয়ম মেনে চলে, এ অবস্থায় সেই সব নিয়মও কিছু কিছু পাল্‌টে যায়। ফলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভাবী মা-কে কিছু কিছু বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি পালন করে চলতে হয়।

শারীরিক পরিশ্রম

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম করবার সময় দুটো কথা মনে রাখা কর্তব্য : (১) আপনার শরীরের অবস্থা কেমন, অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে, গুরুতব কোনো উপসর্গ দেখা দিয়েছে কিনা এবং বর্তমান অবস্থায় আপনার কাজ করবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি কতখানি আছে ; এবং (২) শারীরিক পরিশ্রম আপনি মাত্রা রেখে করছেন কিনা। এ সময়ে গৃহস্থালিব কাজকর্ম, চাকরিবাকরি, খেলাধুলো, স্বামীর সঙ্গে যৌন-সংসর্গ প্রভৃতি যে-কোনো ধরনেব শারীরিক পবিশ্রম করুন না কেন, সবই আপনার বর্তমান শরীরের অবস্থা বুঝে, ধীবেসুস্থে, মাত্রা রেখে কববেন। মাত্রা ছাড়িয়ে কোনো কিছু করা নয়– এ-সময়ে এইই হবে আপনার জপমন্ত্র।

কিন্তু ঠিক কতটা পরিশ্রম করবেন ? এক কথায় এব জবাব দেওয়া শক্ত। প্রসূতিভেদে, অর্থাৎ প্রসূতির স্বাস্থ্যের অবস্থা, শারীরিক সামর্থ্য ও কাজ করবার ইচ্ছাভেদে, কাজের মাত্রাবও তারতম্য হয়ে থাকে। যিনি স্বভাবতই স্বাস্থ্যবতী এবং অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ও যিনি বেশ স্বাভাবিক সুস্থ আছেন তাঁর কাজ করবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নিশ্চয়ই ক্ষীণজীবী দুর্বল প্রসূতির চেয়ে বেশি হবে ; ফলে তাঁর কাজের মাত্রাও দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তবে যে-কথাটা এঁদের সকলের পক্ষেই খাটে, সেটা হল : কাজ ততটাই করবেন যতটা আপনার সামর্থ্যে কুলোয় বা করতে ভালো লাগে। খেয়াল রাখবেন, কাজ করতে গিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়েন। অর্থাৎ, ক্লান্ত হয়ে না-পড়া পর্যন্ত কাজ করে যাবেন, এমন যেন না হয়। কাজ করতে করতে কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ করলেই, অন্তত

সাময়িকভাবেও, কাজ করা বন্ধ করুন। কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করলেই তৎক্ষণাৎ বিশ্রাম নিন। মনে রাখবেন, সাধারণ অবস্থার চেয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আপনার বিশ্রামের দরকার বেশি।

এ-থেকে আবার এরকম ভুল ধাবণা কেউ যেন না মনের মধ্যে গড়ে তোলেন যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিশ্রামের প্রয়োজন যখন বেশি তখন বিছানায় শুয়ে-বসে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া আরো ভালো। সত্যি সত্যিই কিন্তু কিছু কিছু মেয়ের মধ্যে এ-ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। মনে রাখবেন, এ-ধারণা যে শুধু ভিত্তিহীন তাই নয়, প্রসূতির পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। বাড়িতে মা বা শাশুড়ীর মতো অভিজ্ঞ বয়স্ক মহিলা থাকলে তাঁদেব মুখেও অনেক সময় এ-রকম আলসেমিকে নিন্দা করতে শুনে থাকবেন। তাঁরা বলবেন, যে-প্রসূতি শারীরিক পরিশ্রম একেবারে বন্ধ করে শুয়ে-বসে দিন কাটায় তার "সুপ্রসবে ব্যাঘাত ঘটে"। কথাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও এর পিছনে খানিকটা যুক্তি অবশ্যই আছে। ডাক্তাররাও এ-রকম আলসেমিকে সমর্থন কবেন না। তাঁরা বলেন যে আর কিছু না হলেও, অন্ততপক্ষে প্রসূতির --এবং সেই সঙ্গে গর্ভস্থ ভ্রূণের—সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিবে প্রতিদিন কিছুটা পবিশ্রম করা একান্ত দরকার। এতে ঘুম ভালো হয়, হজমের কাজ ঠিকমতো চলে, শরীরের পেশী মজবুত থাকে এবং মনও চাঙ্গা থাকে। তাছাড়া, দিবারাত্র শুয়ে-বসে কাটালে প্রসূতির পক্ষে অতিরিক্ত মোটা হয়ে পড়া ও তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। ডাক্তাবরা আরো বলেন, পরিশ্রমের মধ্যে গৃহস্থালিব হালকা কাজকর্ম, কিংবা কম খাটুনির চাকরিবাকরি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিদিন নিয়ম করে খোলা হাওয়ায় খেলাধুলো করা কিংবা অন্ততপক্ষে হেঁটে বেড়ানো খুব ভালো।

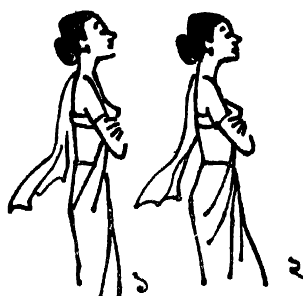
প্রতিদিন নিয়ম বেঁধে কিছুটা পরিশ্রম প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দরকার। কিন্তু আগেই বলেছি, সত্যি সত্যিই কিছুটা পরিশ্রম, অতিরিক্ত পরিশ্রম নয়। কেন? প্রসূতির পক্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রমে কী ক্ষতি হয়? অনেকের ধাবণা, শারীরিক পরিশ্রম করলে প্রসূতির

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের সম্ভাবনা। এটা কিন্তু ভুল। শুধুই শারীরিক পরিশ্রম নয়, বাড়াবাড়ি রকমের পরিশ্রম বা ব্যায়াম করলে। বিশেষ করে, গর্ভসঞ্চারের পরই, গর্ভাবস্থার প্রথম মাস দুয়েক অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে গর্ভস্রাব ঘটে যাওয়ার ভয় থাকে। ওই সময়ে প্রসূতি যদি সংসারের কাজে উদয়াস্ত খাটতে থাকেন, কিংবা দৌড়-ঝাঁপ, সিঁড়ি বেয়ে অনবরত ওপর-নিচ করা, ট্রেনে, মোটরে বা পায়ে হেঁটে দীর্ঘ রাস্তা ঘোরা প্রভৃতি করেন, কিংবা ভারী জিনিস তোলা-নামানো, পেটের কোনোরকম কষ্টসাধ্য ব্যায়াম ইত্যাদি করতে থাকেন তাহলে গর্ভস্রাব ঘটা কিছু বিচিত্র নয়।

তাছাড়া অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেয়েরা অপেক্ষাকৃত সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এবং ক্লান্ত হয়ে পড়লে শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর উপসর্গ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে গর্ভাবস্থার যে-সব স্বাভাবিক উপসর্গ থাকে সেগুলিই বেড়ে ওঠে ও তার ফলে প্রসূতির মধ্যে অবসন্নভাব ও অন্যান্য ধরনের স্নায়বিক ও মানসিক গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষের কয়েক মাসে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এ-সমস্ত উপসর্গ ছাড়াও আরো এক বিপত্তি দেখা দিতে পারে। ডাক্তাররা অনেকে বলেন, যে-সমস্ত প্রসূতি এই সময়ে মাত্রা-ছাড়ানো পরিশ্রম করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গর্ভকাল পূর্ণ হবার আগে অকালে প্রসব করে থাকেন। আর অকালে প্রসব করার অর্থ হল অপুষ্ট, অপরিণত, ক্ষীণজীবী শিশুর জন্ম দেওয়া। এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জন্মের পর জীবনীশক্তির অভাবে শিশুর মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। অতএব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষের কয়েক মাস যত বেশি বিশ্রাম নিতে পারেন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্লান্তি যত এড়িয়ে চলতে পারেন ততই ভালো।

খেলাধুলো, হাঁটা, সাঁতার কাটা, গাড়িতে ভ্রমণ—খোলা হাওয়ায় প্রতিদিন অল্পস্বল্প, সহজসাধ্য ব্যায়াম বা খেলাধুলো কিংবা এমনিই

হেঁটে বেড়ানো প্রসূতির স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, নিজেকে কোনোমতেই ক্লান্ত করে ফেললে চলবে না। নিজেকে ক্লান্ত না করে তুলে এ-ধরনের ব্যায়াম বা খেলাধুলো চালিয়ে গেলে প্রসূতির শরীর-মন বরং সুস্থ থাকবে, শরীরের ভেতরকার কাজকর্মও ভালোভাবে চলবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রসূতির পক্ষে অবশ্য খোলা হাওয়ায় ব্যায়াম বা খেলাধুলোর সুযোগ-সুবিধা কম; কাজেই তাঁরা যদি প্রতিদিন খোলা হাওয়ায়



গর্ভাবস্থায় দাঁড়ানো ও হাঁটাচলার সঠিক ভঙ্গি

১। এইটিই সঠিক ভঙ্গি। সর্বক্ষণ সজাগ থেকে দেহটিকে টানটান সোজা করে—কাঁধ দুটি খাড়া, পিঠ সোজা, বুক ও পেট টান করে রাখতে হবে। এর ফলে সন্তানবহনের অস্বস্তি ও কষ্ট বেশ খানিকটা কমার সম্ভাবনা।

২। এটি বেঠিক ও অনুচিত ভঙ্গি। এইভাবে পিঠ বাঁকিয়ে, কাঁধ দুটি নামিয়ে ও পেট আলগা করে দিয়ে দাঁড়ানো ঠিক নয়। এতে সন্তানবহনের অস্বস্তি বাড়ে।

কিছুক্ষণ হাঁটা অভ্যাস করেন তো খুব ভালো হয়। তবে এ-ক্ষেত্রেও ওই একই নিয়ম। অতিরিক্ত হেঁটে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলা কিংবা পিঠে-কোমরে ব্যথা ধরিয়ে ফেলা ঠিক নয়। শহুরে অবস্থাপন্ন ঘরের কিংবা গ্রামের যে-সব মেয়েদের সাঁতার কাটার সুযোগ-সুবিধা ও অভ্যাস আছে তাঁরা অল্পস্বল্প সাঁতারও দিতে পারেন। তবে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে জলে পড়া, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটা কিংবা সঙ্গী ছাড়া একা-একা সাঁতার কাটা এ-সময়ে

উচিত হবে না। কিন্তু আপনি ব্যায়াম কিংবা খেলাধুলো করুন, হাঁটুন কিংবা সাঁতার কাটুন, খেয়াল রাখবেন কোনো কিছুই যেন কষ্টসাধ্য না হয় কিংবা অতিরিক্ত পরিমাণে না ঘটে। কেননা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এমনিতেই মাথা ঘোরা বা ঝিম্‌ঝিম্ করা, এলিয়ে-পড়া অবসন্নভাব, শরীরের মাংসপেশীতে আক্ষেপ বা "খিল ধরা" ইত্যাদি উপসর্গ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া খোলা জায়গায় ব্যায়াম ইত্যাদির সময়ে আরো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন। প্রসূতির পক্ষে কড়া রৌদ্রে ঘোরাফেরা করা ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে স্নান দুইই ক্ষতিকর।

ট্রেনে, প্লেনে কিংবা মোটরে চেপে দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ প্রসূতির পক্ষে উচিত কিনা এ নিয়ে ডাক্তারদের মধ্যেও মতভেদ আছে। তবে একটা ব্যাপারে সকলে একমত যে এ-ধরনের দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণ প্রসূতির পক্ষে কষ্টদায়ক ও ক্লান্তিকর হবার সম্ভাবনা থাকলে তা বাদ দেওয়াই নিরাপদ। যদিও বর্তমানে ট্রেন, প্লেন বা মোটর-ভ্রমণ বিশ-পঁচিশ বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি আরাম-দায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবু দীর্ঘ ভ্রমণের আনুষঙ্গিক ক্লান্তি ইত্যাদি এখনো আছে। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন না হলে, অন্তত পক্ষে গর্ভাবস্থার একেবারে গোড়ার ও শেষের দিকে কয়েক মাস, এই ধরনের দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই ভালো। বিশেষ করে যাঁদের এক বা একাধিক গর্ভ ইতিপূর্বে নষ্ট হয়ে গেছে, সেইসব প্রসূতির পক্ষে দূরদেশ ভ্রমণ বর্জন করতে পারলেই ভালো হয়।

গৃহস্থালির কাজ ও চাকরি—সারা গর্ভাবস্থা প্রসূতি নিশ্চয়ই শুয়ে-বসে আল্‌সেমি করে দিন কাটাবেন না। প্রথমত, এ তাঁর ভালো লাগবে না ; দ্বিতীয়ত, এ ভাবে দিন কাটানো তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভবও হবে না। সাধারণত কিছু-না-কিছু কাজ তাঁকে করতে হবেই। যদি তিনি অন্তঃপুরিকা হন তো গৃহস্থালির কাজ, আর যদি চাকুরে হন তো আপিস বা কারখানায় যাওয়া।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গৃহস্থালির কাজ করতে কোনো বাধা নেই। তবে কষ্টসাধ্য ও ক্লান্তিকর কাজ যত কম করা যায় ততই ভালো, না করতে হলে আরো ভালো। জল তোলা, কয়লা ভাঙা, দু-বেলা উনুনের সামনে বসে রান্না করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করার মতো লোক যদি সংসারে থাকেন তো কথা নেই। ঝি-চাকর থাকলে তো আরো সুবিধে। কিন্তু এ-সব কিছুই না থাকলে নানা বুদ্ধি বের করে প্রসূতিকে এইসব পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজের ঝামেলা কমাতে হবে। তবে, সম্ভব হলে, গর্ভাবস্থার শেষের মাস দুই-তিনের জন্যে সংসারের কাজে একজন সাহায্যকারী যোগাড় করে নেওয়া সবচেয়ে ভালো।

বর্তমানে আমাদের দেশেব শহর ও কলকারখানা-অঞ্চলে চাকুরিজীবী মেয়ের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কাজেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চাকরি করা উচিত কিনা এ-প্রশ্ন আলোচনারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রশ্নটি নিয়ে অবশ্য ধাত্রীবিদ্‌দের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। বিশেষজ্ঞদের একদল নানা রকম সংখ্যা, হিসেব ইত্যাদি দেখিয়ে বলছেন, যে-সব প্রসূতি পরিবারে কিংবা বিশেষ করে ক্ষেত-খামাব বা কলকারখানায় শক্ত খাটুনির কাজ করেন কিংবা তেমন খাটুনির কাজ না হলেও যাঁদের প্রতিদিন বাঁধা নিয়মে আপিসের কাজ করতে হয়, তাঁবা সাধারণত অন্যান্য প্রসূতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত অপুষ্ট, ক্ষীণজীবী শিশুব জন্ম দেন। যেমন, যে-মেয়ে খামাবে, ঘবে বা কারখানায় ভারী খাটুনির কাজ করেন তিনি যদি ওই কাজ সাবা গর্ভাবস্থা জুড়ে চালিয়ে যান তাহলে তাঁব যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হবে সাধারণত তাব ওজন, যে-প্রসূতি নিয়মিত বিশ্রাম নিয়েছেন তাঁর শিশুর ওজনের চেয়ে অন্ততপক্ষে আধ পাউণ্ড কম হবে। এমন কি, যে-প্রসূতি এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা কাজ, যেমন সেলাই-ফোঁড়াই বা আপিসের চাকরি করেন—এ-কাজ তিনি নিয়মিত করুন কিংবা কখনো-সখনো করুন—এ তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তাব করতে বাধ্য। আর নবজাত সন্তান

অপুষ্ট ও ক্ষীণজীবী হলে তাব ফলাফল খারাপ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তাই এই বিশেষজ্ঞদেব মতে প্রসূতি মেয়েদেব পক্ষে কল-কারখানা ইত্যাদিতে ভাবী খাটুনিব কাজ কিংবা আপিসের চাকরি—সাময়িকভাবে হলেও—না কবাই বাঞ্ছনীয়। আবেক দল বিশেষজ্ঞ কিন্তু বলেছেন, না, ব্যাপাবটা অত ভয়ংকব কিছু নয়। প্রসূতি গর্ভাবস্থায় আপিস ইত্যাদিতে কাজ কবতে চান তো কোনো বাধা নেই। যদি সে কাজ খুব বেশি খাটুনিব না হয, তেমন বিপদ-আপদের সম্ভাবনা না থাকে কিংবা প্রসূতিব শবীব-মনে গর্ভাবস্থাকালীন কোনো জটিল উপসর্গ দেখা না দিযে থাকে তাহলে এতে আপত্তি কবাব কিছু নেই। প্রসূতি স্বচ্ছন্দে চাকবি কবতে পাবেন। কিন্তু তিনি কি সাবা গর্ভাবস্থা ধবেই চাকবি কবে যেতে পাবেন? শেষোক্ত বিশেষজ্ঞবা বলছেন, এ-প্রশ্নেব উত্তব হচ্ছে, প্রসূতি গর্ভাবস্থায় যতদিন পর্যন্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে আপিসে যাতাযাত কবতে ও কাজ করতে পাববেন ঠিক ততদিনই চাকবি কবতে পাবেন। তাবপর প্রয়োজনমতো তিনি ছুটি নেবেন কিংবা চাকবি ছাডবেন। অবশ্য প্রসূতিব আপিস বা কাবখানা ইত্যাদিব কাজ যদি খুব বেশি খাটুনিব হয় তাহলে গর্ভাবস্থাব গোডাব দিকেই তিনি চাকবি করবেন কিনা ভাবতে হবে। কিন্তু চাকবি যদি কেবানি, টাইপিস্ট কিংবা ওই ধবনেব হয় তাহলে অসুবিধা বোধ না কবলে প্রসূতি এমন কি গর্ভাবস্থাব নবম মাসেও আপিসে যেতে পাবেন অবশ্য যদি দশটা-পাঁচটার ট্রাম-বাসেব ভিড ঠেলে তাঁব পক্ষে আপিস যাওয়া সম্ভব হয়।

আমরা এই শেষোক্ত বিশেষজ্ঞদেব মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করি। কেননা, এই মতটি সহজ বাস্তববুদ্ধি-সম্মত। শবীবে গর্ভাবস্থা থেকে সঞ্জাত কোনো অস্বাভাবিক উপসর্গ না থাকলে, মোটেব ওপব শবীব সুস্থ থাকলে এবং চাকরিতে খুব বেশি খাটুনি না থাকলে কোনো প্রসূতিব পক্ষে চাকবি কবতে বাধা কি? আসল কথা হল, কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হবাব পব চাকবি কববেন কি

ছাড়বেন তা প্রধানত তাঁর নিজের ওপরই নির্ভর করে। কেননা আমাদের দেশে মেয়েরা এখনো পর্যন্ত নিতান্ত দায়গ্রস্ত (আর্থিক সংকটগ্রস্ত) হয়েই চাকরি নেন ; সখের চাকরি করেন এমন মেয়ের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এবং এই পূর্বোক্ত শ্রেণীর মেয়েরা আর্থিক কারণেই ততদিন পর্যন্ত চাকরি ছাড়েন না, যতদিন তাঁদের আপিস করতে বিশেষ কষ্ট না হয়। তবে দেখা যায় বেশির ভাগ মেয়েই গর্ভাবস্থার ছয় কি সাত মাস থেকে (অর্থাৎ শরীরে গর্ভলক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠার সময় থেকে) আপিস-কারখানা যাওয়া পছন্দ করেন না।

যে-সব প্রসূতিকে গর্ভাবস্থায়, বিশেষ করে তার শেষের দিকে, আপিস ইত্যাদিতে যেতে হয় স্বভাবতই তাঁদের সংসারের কাজকর্ম যথাসম্ভব কম করে করা উচিত। সংসারের ভারী খাটুনির কাজগুলি, সম্ভব-স্থলে, কোনো সাহায্যকারীর ওপর ন্যস্ত করলে ভালো হয়। এবং এঁদের পক্ষে আপিসের ছুটির পর সন্ধ্যায় ও সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনগুলিতে বিশ্রাম—প্রচুর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

যৌন-সংসর্গ, স্বামী-সহবাস—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যৌন-সংসর্গ ও স্বামী-সহবাসের ব্যাপারটি নিয়ে চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। কারো কারো মতে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বামী-সহবাসের ফলে প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশু উভয়ের পক্ষেই গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা। এমন কি এর ফলে—এঁরা মনে করেন প্রসূতির গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত পর্যন্ত ঘটতে পারে। এছাড়া অন্য কেউ কেউ বলেন, প্রসূতির পক্ষে খুব সাবধানে এবং বেশি সময়ের ব্যবধানে অল্পস্বল্প মাত্রায় স্বামী-সহবাস করা চলতে পারে। আবার তৃতীয় আরেক পক্ষ মনে করেন যে অন্য সময়ে তত আপত্তি না থাকলেও গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস ও শেষের দু-মাস প্রসূতির পক্ষে স্বামী-সহবাস একান্ত অনুচিত।

আসলে এই সমস্ত মত কতখানি বিজ্ঞানসম্মত তা নিয়ে চতুর্থ আরেক

দল বিশেষজ্ঞ গভীর সন্দেহ পোষণ করেন। এবং এঁদের মতটাই সহজবুদ্ধিতে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। এঁরা বলেন, এত ভয় ও সতর্কবাণীর বিশেষ কোনো ভিত্তি নেই। রতিবিহারের সময়ে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা হলে অবশ্য অন্য কথা ; তা না হলে স্বাভাবিক সুস্থ প্রসূতির পক্ষে স্বামী-সহবাসের ফলে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটতে পারে, এ-ধরনের তত্ত্বের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ নেহাতই দুর্বল। উল্টো, বরং গর্ভাবস্থায় যৌন-সংসর্গ বা স্বামী-সহবাস যতদিন পর্যন্ত আনন্দদায়ক বোধ হবে এবং প্রসূতি এর জন্যে শারীরিক কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করবেন ততদিন প্রায় সমস্ত প্রসূতির পক্ষেই রতিবিহার ইত্যাদিতে কোনো বাধা নেই। তবে এক্ষেত্রেও সেই মৌলিক একটি প্রশ্ন : যাই করুন, মাত্রা রেখে চলতে হবে। এক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে পারলে ভালো হয়—যেমন, অতিরিক্ত ঘন ঘন সহবাস না কবা, রতিবিহারের সময় স্বামী-স্ত্রী কোনো পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ না করা, এবং গর্ভাবস্থাব একেবাবে শেষেব দিকে প্রসবকাল ঘনিয়ে আসার মুখো-মুখি সময়ে (প্রসূতির জবায়ুমুখ অল্পবিস্তর খুলে যাওয়ার ও সহবাসের সময় বোগবীজাণু ইত্যাদি জরায়ুর মধ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে বলে), বা গভাবস্থার যে-কোনো সময়ে প্রসূতি স্বামী-সহবাসে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে কিংবা গর্ভকালীন কোনো উপসর্গে বা অন্য কোনো গুরুতর অসুখে পীড়িত হয়ে পড়লে, সাময়িক কিংবা প্রয়োজন হলে তখনকাব মতো স্থায়ীভাবেই, রতিবিহার বন্ধ রাখা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রসূতির পক্ষে প্রায় সাবা গর্ভকাল জুড়ে মাত্রা রেখে স্বামী-সহবাসে কোনো আপত্তি নেই। তবে এ-নিয়ম সাধারণ সুস্থ প্রসূতির পক্ষেই প্রযোজ্য, সমস্ত প্রসূতির পক্ষে নয়। অর্থাৎ, প্রসূতি যদি অসুস্থ হন (নিতান্ত সাময়িক তুচ্ছ অসুখ নয়, তার চেয়ে গুরুতর কোনো অসুখে ভোগেন) তা হলে তাঁর সম্পর্কে এ-নিয়ম নাও খাটতে পারে। অন্তত কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, অসুস্থ প্রসূতির পক্ষে, এ-নিয়ম খাটবে কি খাটবে না তা স্থির করবেন

ডাক্তারবাবু—যিনি ওই প্রসূতির তত্ত্বাবধান ও তাঁর অসুখের চিকিৎসা করছেন। এখানে প্রসূতির আরো এক ধরনের অসুস্থতা ও অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বলা বিশেষ দরকার। সেটি হল, গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের লক্ষণ দেখা দেওয়া কিংবা ওই ধরনের কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা। প্রসূতির গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের লক্ষণ দেখা দিলে—অর্থাৎ যোনিমুখ থেকে রক্তক্ষরণ, কি পেটে-কোমরে মোচড়ানো ব্যথা কিংবা ওই দুই উপসর্গ একসঙ্গে প্রসূতির শরীরে প্রকাশ পেলে—স্বামী-সহবাস তখনকার মতো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এছাড়া আরো এক ধরনেব প্রসূতির ক্ষেত্রেও স্বামী-সহবাসের ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এটা ভাবতে হবে তাঁদের ক্ষেত্রে, যাঁদেব মধ্যে পৌনঃপুনিক গর্ভপাত ও অকাল-প্রসবের প্রবণতা রয়েছে। কেননা, উত্তেজনা যে-কোনো ধরনের হোক না কেন, প্রসূতি বেশিরকম উত্তেজিত হলে তার ফলে তাঁর জরায়ুর সংকোচন শুরু হয়ে যেতে পারে। মেয়েবা নিজেরাও লক্ষ্য করে থাকবেন, কোনো কারণে শবীর বা মনের দিক থেকে উত্তেজিত হয়ে উঠলে তাঁদের জবায়ুও বহুক্ষণ ধবে প্রবলভাবে সংকুচিত হতে থাকে। কাজেই এব ফলে আকস্মিকভাবে সম্ভাবা গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়।

পোশাক-পরিচ্ছদ

দেহের আকৃতি পবিবর্তনের সঙ্গে প্রসূতির জামাকাপড়ও খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকাব। তাছাড়া এ-সময়ে বক্ত-চলাচলে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয় তাও দেখতে হবে। অতএব সবদিক বিবেচনা করে আঁটসাট পোশাক না-পবাই এ-সময়ে প্রশস্ত। গর্ভাবস্থার ক্রমবিকাশের সঙ্গে, বিশেষ করে পেটের আয়তন বড় হতে শুরু করলে, শাড়ির কষি ও পেটিকোটের কোমরবন্ধ অতিরিক্ত কষে না-বাঁধা ভালো। এ-সময়ে স্তনদ্বয়ও ক্রমশ বেশি ভারী ও বড় হয়ে উঠতে থাকে, তাই ভেতরে পরবার কাঁচুলি বা ব্রেসিয়ার এবং ব্লাউজ

ইত্যাদি বদলে এমন বড় মাপের জামা পরতে হবে যাতে স্তনদ্বয়ের আকৃতি পরিবর্তনের জন্যে অসুবিধা না হয়। যে-সব প্রসূতির জুতো পরার অভ্যাস আছে এ-সময়ে জুতো কিনতে গিয়ে তাঁদের দেখতে হবে জুতোটি যেন বেশ মজবুত হয়, হিল্ বা গোড়ালি বেশি উঁচু না হয় এবং গোড়ালির দিকটা অন্তত এতটা চওড়া হয় যাতে জুতোর গোড়ালি থেকে পা পিছলে নেমে না যায়। মোট কথা, এ-সময়ে প্রসূতির ওজন আগের চেয়ে প্রায় কুড়ি পাউণ্ডের মতো বৃদ্ধি পায়, কাজেই জুতোর যে সেই অতিরিক্ত পরিমাণ ভার বহনের ক্ষমতা আছে তা দেখে নেওয়া দরকার।

গর্ভাবস্থায় প্রসূতির পেট বেঁধে বাখার জন্যে বিশেষ ধরনের বেল্ট প্রভৃতি ব্যবহার কবা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে অবশ্য এইভাবে পেট বাঁধাব তেমন চল নেই। এ-দেশের অধিকাংশ প্রসূতিই এতে অভ্যস্ত নন। পেট না-বেঁধে সারা গর্ভকাল তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেন। তাছাড়া অধিকাংশ সাধারণ সুস্থ প্রসূতিব পেটের মাংসপেশী এতটা সবল যে গর্ভাবস্থায় তাঁদের পেট বাঁধার বিশেষ দবকাবও পড়ে না। পেট না-বেঁধে যাঁদের কোনো অসুবিধে নেই তাঁদেব অবশ্য সখ কবে উপরোক্ত বেল্ট প্রভৃতি ব্যবহার করাবও দবকাব নেই। তাছাড়া এও জেনে রাখা ভালো যে গর্ভাবস্থায় বেল্ট ব্যবহাব কবাব সঙ্গে পেটের বৃদ্ধি বা চামড়ার প্রসাবণ বোধ করাব কোনো সম্পর্ক নেই। পেটের বৃদ্ধি গর্ভস্থ শিশুর আকার ও জরায়ুর মধ্যেকাব জলের পবিমাণের ওপরই নির্ভর করে। আমাদের দেশে ডাক্তাররা সেইসব প্রসূতিকেই পেট বেঁধে রাখতে পরামর্শ দেন, যাঁদের পেটের আকার গর্ভাবস্থায় অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায়, যাঁদের পেটের মাংসপেশীব দুর্বলতা-জনিত নানাবকম বিপদ-আপদেব সম্ভাবনা থাকে, কিংবা যাঁদের গর্ভস্থ সন্তান ইত্যাদি স্থানচ্যুত হতে দেখা যায়। যে-সব প্রসূতি পেট বেঁধে রাখতে চান তাঁবা কী ধরনের বেল্ট ব্যবহার করবেন তা নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, এই বেল্ট খুব

সাবধানে বাঁধতে হবে। কেননা বেল্ট শক্ত করে কষে বাঁধলে পেটের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে গর্ভস্থ সন্তানের বিপদ ঘটতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রসূতির অসুবিধে না-হলে একটু-আধটু কষে বেল্ট বাঁধলেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা গর্ভস্থ শিশু তো জরায়ুর মধ্যে জলের ওপর ভাসছে, তাই বাইরে থেকে অল্পবিস্তর চাপে তার কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের মনে হয়, এ-ব্যাপারে প্রসূতি যদি তাঁর ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুসারে চলেন তো সবচেয়ে ভালো হয়।

স্বাস্থ্য

স্নান—সারা গর্ভাবস্থায়ই প্রতিদিন ভালো করে তেল মেখে ও সারা শরীর ভিজিয়ে প্রসূতির স্নান করা দবকার। এমন কি, শহরের যে-সব মেয়ে স্নানের ঘরে টবেব জলে স্নান করেন, তাঁরাও গর্ভকালের একেবারে শেষের কয়েক সপ্তাহ বা মাসখানেক বাদ দিয়ে সারা সময়টা টবের জলেই স্নান কবতে পাবেন। তবে, গ্রামের পুকুরে কিংবা নদীতে, শহরে স্নানের ঘরে কলেব জলে কিংবা টবে, যেখানেই স্নান করুন না কেন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন। স্নানের জল যেন অতিরিক্ত গরম কিংবা অত্যধিক কনকনে ঠাণ্ডা না হয়। জল বেশি গরম হলে প্রসূতিব শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে পারে, আবার অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হলে তাঁর রক্ত-সঞ্চালনে ক্ষতিকর ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রতিদিন স্নানের আগে কিছুক্ষণ ধরে সারা শরীরে, বিশেষ করে পেটে, তেল মালিশ কবা খুব ভালো।

দাঁতের যত্ন—গর্ভাবস্থায় অনেক প্রসূতির দাঁত খাবাপ হতে ও ক্ষয়ে যেতে দেখা যায়। অনেকেব আবার দাঁতেব গোড়া ফুলতে ও দাঁত মাজার সময় মাড়ি থেকে রক্ত পড়তেও দেখা যায়। যাঁদের দাঁত আগে থেকেই খারাপ থাকে, এ-সময়ে তাঁদের আরো দ্রুত দাঁত নষ্ট হয়ে যায়।

অনেকের ধারণা, এর কারণ গর্ভে সন্তান আসায় মায়ের শরীরে ক্যাল্‌সিয়ম-এর ঘাটতি। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন, তা নয়, খুব সম্ভবত গর্ভাবস্থায় প্রসূতির শরীরে কিছু কিছু রাসায়নিক ও অন্যান্য ধরনের পরিবর্তনের ফলে দাঁত আক্রান্ত হয়। আর দাঁতের গোড়া বা মাড়ি ফোলার কারণ—গর্ভাবস্থায় সাধারণভাবে দেহের সর্বত্র কোষসমষ্টি বা tissues রসস্থ (অর্থাৎ অতিরিক্ত রক্ত ইত্যাদি সঞ্চালনের ফলে রক্ত ও অন্যান্য ধরনের দেহরসেও পূর্ণ) হয়ে ওঠে। ফলে কোনো ক্ষেত্রে প্রসূতির প্রায়ই নাক বন্ধ হয়ে যায়, কোথাও-বা মাড়ি ফুলে ওঠে ও রক্ত পড়ে।

গর্ভাবস্থায় দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া ও মাড়ি ফুলে ওঠার প্রবণতা দেখা যায় বলে প্রত্যেক প্রসূতির পক্ষে দাঁতের যত্ন নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। এই কারণেই প্রসূতি গর্ভসঞ্চারের পর প্রথম যখন ডাক্তার দেখাতে যান, তখন ডাক্তারবাবু তাঁর দাঁতও ভালো করে পরীক্ষা করেন, এবং প্রয়োজন মনে করলে প্রসূতিকে দাঁতের ডাক্তারের সাহায্য নিতে বলেন।

প্রতিদিন টুথব্রাশ কিংবা দাঁতন দিয়ে ভালো করে দাঁত মাজতে এবং আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে মাড়ির পরিচর্যা করতে ভুলবেন না। খাওয়ার পর বমি কিংবা অতিরিক্ত রকম গা-বমির ভাব ইত্যাদি গর্ভকালীন উপসর্গ প্রবল না হলে দিনে দু-বার, দুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পর, দাঁত মাজতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। দাঁত খারাপ থাকলে অবিলম্বে দাঁতের ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করান। প্রয়োজন হলে এবং ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলে এক-আধটা খারাপ দাঁত তুলেও ফেলা যেতে পারে।

স্তনাগ্রের যত্ন—গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে স্তন ও স্তনাগ্র সম্পর্কে অতিরিক্ত যত্ন নেবার দরকার নেই। কেবল সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করতে গিয়ে প্রসূতি যেমন শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচর্যা করবেন এক্ষেত্রেও সেইটুকু পরিচর্যা ও

পরিচ্ছন্নতাই যথেষ্ট। এ-সময়ে প্রসূতির স্তনাগ্রে হয়তো দুধের মতো একটা পদার্থের অল্পস্বল্প ক্ষরণ দেখা যাবে। এ-পদার্থটি স্তনদুগ্ধের ঠিক আগের অবস্থা, এর নাম কোলোস্ট্রাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রসূতি স্তনবৃন্তে হয়তো এই পদার্থ টি শুকিয়ে থাকতে দেখবেন। অল্প একটু গরম জলে স্তনাগ্র ধুয়ে ফেললেই তখনকারমতো কাজ চলবে।

তবে গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি সময় থেকে স্তনাগ্র সম্পর্কে যত্ন নিলে ভালো হয়। বিশেষত শেষের দু-তিন মাস এদিকে যে একটু বেশি নজর দিতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, সন্তান-জন্মের পর নবজাতককে স্তন্যদান করার জন্যে আগে থেকেই প্রসূতিকে প্রস্তুত হতে হবে। আর এই প্রস্তুত হওয়ার অর্থ হল স্তনাগ্র দুটিকে প্রস্তুত করা। অতএব গর্ভাবস্থাব ওই মাঝামাঝি সময়ে এ-ব্যাপাবে আপনার ডাক্তারবাবুর পবামর্শ নিন। স্তনাগ্রের যত্নের যে পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করতে বলবেন সেইমতো চলবার চেষ্টা করুন।

স্তনাগ্রেব যত্নেব নানাবিধ প্রণালী আছে। এখানে আমরা একটি পদ্ধতির কথা বলছি। সেটি আর কিছু নয়, প্রতিদিন নিয়ম করে অল্প-গরম জলে স্তনাগ্র দুটি ধুয়ে ফেলা এবং দিনে একবাব কি দু-বার মাখন বা কোল্ড ক্রীমজাতীয় জিনিস দিয়ে আস্তে আস্তে মালিস করা। এতে স্তনবৃন্ত সুগঠিত ও নরম হবে এবং ফাটবে না। এর ফলে পরে নবজাত সন্তানকে স্তন্যদানও সুখসাধ্য হবে।

নেশা বা বদভ্যাস—যে-সমস্ত মেয়ে শারীরিক কারণে ঘুমের ওষুধ বা টনিক হিসেবে মদ বা মদ-জাতীয় উত্তেজক জিনিস মাঝে মাঝে কিংবা নিয়মিত খেয়ে থাকেন, ডাক্তারের বারণ না থাকলে গর্ভাবস্থায়ও তাঁরা তা খেতে পারেন। ওষুধ হিসেবে স্বল্প মাত্রায় এ-জাতীয় জিনিস পান করলে, যতদূর জানা যায়, প্রসূতি বা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তবে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এ-জিনিসে

অল্পেতেই নেশা জন্মানোর ও শরীর বিকল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে প্রসূতির পক্ষে তো বটেই সাধারণভাবে যে-কোনো মানুষের পক্ষেই এ-ধরনের মাদকপদার্থে অভ্যস্ত না-হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাদকপদার্থের নেশা বিশেষ করে প্রসূতির পক্ষে বর্জনীয়, কেননা এর ফলে অন্য কোনো ক্ষতি হোক না-হোক, প্রসূতির শারীরিক বিপদ-আপদ ঘটা বিচিত্র নয়।

প্রসূতিদের মধ্যে কারো যদি আফিম বা আফিমজাতীয় পদার্থের অভ্যাস থাকে তো ডাক্তারবাবুর কাছে প্রথম দর্শনেই সেকথা খুলে বলা উচিত। আফিমজাতীয় পদার্থের নেশা গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে চারিয়ে যাবার ভয় থাকে বলে এ-নেশা সত্যিই অপকারী। কিভাবে এ-জাতীয় নেশা ক্রমে কাটিয়ে উঠতে হবে কিংবা কমিয়ে ফেলতে হবে, ডাক্তারবাবুই প্রসূতিকে সে-বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে পারবেন।

দোক্তা বা তামাক-পাতার নেশা আফিমজাতীয় নেশাব মতো অতটা ক্ষতিকব না হলেও, প্রসূতিব শরীরে এদের ক্রিয়াও অনিষ্টকর। প্রথমত, এতে দাঁত নষ্ট হয়। তাছাড়া মাত্রা ছাড়িয়ে খেলে এ-সব জিনিস পেটে গিয়ে শুধু হজমের ব্যাঘাতই ঘটায় না, অনেকের হৃদ্‌যন্ত্রও দুর্বল করে ফেলে। কাজেই, সম্ভবস্থলে, প্রসূতির পক্ষে এ-ধরনের নেশাও কমিয়ে ফেলা কিংবা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

মাত্রা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত না-খেলে প্রসূতি সাধারণত পানের নেশাটা বজায় রাখতে পারেন। তবে পানেব সঙ্গে বেশি পরিমাণে সুপারি কিংবা কাঁচা সুপারি ইত্যাদি ব্যবহার না করাই ভালো। যাঁদের পানের সঙ্গে দোক্তার নেশা নেই তাঁদের পক্ষে পানের নেশা আরো বেশি নিরাপদ।

প্রসূতি চা কিংবা কফিতে অভ্যস্ত হলে ক্ষতি নেই, তবে এ-সব যথাসম্ভব অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত। বেশিরকম কড়া চা বা কফি অবশ্য খাওয়া উচিত নয় এবং গর্ভাবস্থায় সামান্য অনিদ্রা দেখা দিলেই এগুলি বন্ধ করে দিতে পারলে ভালো হয়। তবে চা বা

কফির অভ্যাস বদলে প্রসূতি কোকো, ওভালটিন বা হরলিক্সে অভ্যস্ত হতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

তবে এ-সমস্ত অভ্যাস ও নেশা সম্বন্ধে একটা কথা। প্রায়ই দেখা যায় গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক সপ্তাহে সাধারণত প্রসূতি যখন অরুচি ও গা-বমির উপসর্গে ভোগেন তখন তাঁর অতিপ্রিয় নেশার সামগ্রীটির স্বাদ ও গন্ধও তাঁর কাছে দুর্বিষহ লাগে। ফলে গর্ভসঞ্চারের পর নেশাগ্রস্ত স্ত্রীলোকের নেশা ছুটে যাওয়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। এইভাবে যাঁরা নেশার কবল থেকে মুক্ত হন তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলার নেই। কিন্তু এই সময়েও যাঁদের নেশায় অরুচি জন্মায় না, আমাদের ওপরের আলোচনা তাঁদের জন্যেই।

খাদ্য

গর্ভাবস্থায় খাওয়া-দাওয়া কেমন হবে? বেশি খেতে হবে, না বেশি করে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে, নাকি পরিমাণেও বেশি খেতে হবে আবার বেশি করে পুষ্টিকর খাদ্যও খেতে হবে, কিংবা এ-সব কিছুই করার দরকার নেই, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার আগে যা খেতেন এখনো প্রসূতির সেই জিনিস সেই পরিমাণে খেলেই চলবে, ইত্যাদি?— এক কথায় এর জবাব দেওয়া মুশকিল। কেননা, সব প্রসূতির আর্থিক স্বচ্ছলতা, রুচি, অভ্যাস এক ধরনের নয়। ফলে সকলের খাদ্য-তালিকাও এক নয়। অবস্থা, রুচি ইত্যাদি অনুসারে কোনো প্রসূতির পরিবারে খাওয়া-দাওয়া উৎকৃষ্ট ধরনের, কারো-বা মাঝারি-গোছের, আর কারো একেবারে নিকৃষ্ট। তবু, মোটের ওপর বোধহয় বলা চলে, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে শতকরা প্রায় পঁচাত্তরটি পরিবারেই খাওয়া-দাওয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট এবং অবশিষ্ট শতকরা পঁচিশটি পরিবারের মধ্যেও বোধহয় কুড়িটি পরিবারের খাদ্য-তালিকা সাদাসিধে, মাঝারি ধরনের। অবশ্য এর কারণ নিছক আর্থিক সঙ্গতির অভাব নয়, আমাদের বিশেষ ধরনের রুচি ও অভ্যাসের ফলও বটে। প্রথমত, আমাদের দৈনিক খাদ্য-তালিকায়

সামঞ্জস্যের অভাব। শর্করা-জাতীয় খাদ্য আমরা হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাই, অথচ আমিষ ও ঘি-তেলজাতীয় জিনিস প্রয়োজনানুরূপ খাই না। দ্বিতীয়ত, ভোজ্যবস্তুকে আমরা এত বেশি পরিমাণে রান্না করি ও তাতে ঝাল-মশলা ব্যবহার করে থাকি যে তার ফলে যেটুকু খাদ্য গ্রহণ করি তারও খাদ্যগুণ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এদেশেব অধিকাংশ প্রসূতিকেই—এমন কি প্রাচীনপন্থী ধনী পরিবাবের ও অবস্থাপন্ন যৌথ বা বড় পরিবারের মেয়েদেরও—গুরুতর পুষ্টিহীনতায় ভুগতে দেখা যায়। এ-কারণে এক কথায় কিছু বলতে গেলে বলতেই হয় যে মুষ্টিমেয় কিছু আধুনিক অবস্থাপন্ন পবিবাবেব প্রসূতিব (যাঁদেব বাড়িতে চিরাচরিত খাদ্য-তালিকা ও রন্ধনপ্রণালী পালটে খাদ্যগুণযুক্ত খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ কবা হয়) কথা বাদ দিলে, এদেশের অধিকাংশ প্রসূতিব পক্ষেই গর্ভাবস্থায় কম-বেশি পবিমাণে আগেব চেয়ে বেশি খাওয়া ও বেশি কবে পুষ্টিকব খাদ্য খাওয়া দবকাব হয়।

প্রথমে অবস্থাপন্ন আধুনিক পবিবাবেব প্রসূতির সম্পর্কে বলি। এঁর বাড়িতে সত্যিই খাদ্যগুণযুক্ত খাদ্য নষ্ট না করে বান্না কবা ও উপযুক্ত পবিমাণে গ্রহণ কবা হলে এবং এঁর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ভালো ও শরীর মানানসই বকম লম্বা-চওড়া হলে (অর্থাৎ এঁব উচ্চতা ও ওজনের মধ্যে সামঞ্জস্য থেকে থাকলে) নিছক অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বলেই এঁর পক্ষে বেশি খাওয়াব বা খাদ্য তালিকা বদলে নেবাব দরকার নেই। এই বিশেষ শ্রেণীব স্বাভাবিক সুস্থ প্রসূতির পক্ষে গর্ভাবস্থার খাদ্য অন্য সময়ের খাদ্যের মতোই থাকবে।

অবশ্য এ-কথাটা সাধারণভাবেই বলা হচ্ছে। এ-শ্রেণীর সমস্ত প্রসূতির পক্ষে সর্বত্র এমন নিয়ম কড়াকড়িভাবে মানতে হবে তার কোনো মানে নেই। কেননা, এ-শ্রেণীর প্রসূতির মধ্যেও অনেকে হয়তো গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস অরুচি ও গা-বমির উপসর্গে ভুগবেন। ফলে তখন তাঁরা বিশেষ কিছু খেতে পারবেন না; তাঁদেব ওজনও হয়তো কয়েক পাউণ্ড কমে যাবে। এ-সময়ে তাঁদের

ডাক্তাররাই হয়তো খাদ্য ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ভিটামিনের বড়ি ইত্যাদি খেতে বলবেন, কিংবা ভিটামিনের গন্ধ প্রসূতির কাছে আপত্তিকর ঠেকলে ইঞ্জেক্‌শনের সাহায্যে তা দিতে চাইবেন। এরকম ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মেনে চলাই সমীচীন হবে। তাছাড়া, এই আধুনিক অবস্থাপন্ন পরিবারের প্রসূতিদের সকলেরই উচ্চতা ও ওজনের মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকে তা তো নয়। কোনো প্রসূতির শরীরে এরকম সামঞ্জস্যের অভাব থাকলে সমতাবিধানের জন্যে ডাক্তারবাবু হয়তো এক বিশেষ খাদ্যতালিকা তৈরি করে তাঁকে সেই অনুসারে খাওয়া-দাওয়া করতে বলবেন। এবং এই বিশেষ খাদ্যতালিকায় হয়তো প্রসূতির অভ্যস্ত খাদ্য কিছু কিছু বাদ পড়বে, কিংবা কোনো কোনো খনিজ-পদার্থ ও ভিটামিন ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত কবা হবে। এরকম ক্ষেত্রেও প্রসূতিকে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

আগেই বলেছি, আমাদেব দেশেব অধিকাংশ প্রসূতির পক্ষে গর্ভাবস্থায় বেশি পবিমাণে খাওয়া, কিংবা বেশি করে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, কিংবা এই দুটো কাজই একসঙ্গে করা দরকার হয়। অবশ্য মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা হলে পরিবারের অন্যান্য লোকেরা সাধারণত তাঁদেব প্রতি অন্য সময়েব চেয়ে বেশি বিবেচক হন, এমন কি তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপাবেও একটু বেশি যত্ন নেন। মেয়েদেব জীবনে খাওয়া-দাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে মেয়েরা নিজেরা এবং পরিবারের সকলেই এ-সময়ে যতটা সচেতন হয়ে ওঠেন, অন্য কোনো সময়ে তেমন আব দেখা যায় না। পাছে গর্ভস্থ শিশুর, কিংবা ওই শিশুর জন্যে প্রসূতির পুষ্টির কোনো ব্যাঘাত ঘটে এ-জন্যে সকলে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

এটা খুবই ভালো লক্ষণ। আমবা আগেই আলোচনা করেছি, ভাবী মায়ের ও ভ্রূণের রক্তের মধ্যে মেশামেশি না হয়েও প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল নামের অঙ্গটির মারফত মায়ের রক্ত থেকে ছেলের রক্তে পুষ্টি সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। কাজেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রসূতি উপযুক্ত

পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেলে শুধু যে তাঁর নিজের শরীরই পুষ্ট হবে তাই নয়, এর ফলে গর্ভস্থ শিশুরও শরীর পুষ্ট হবে। অন্যপক্ষে প্রসূতি পুষ্টিহীনতায় ভুগলে তার ফলাফল অন্য সময়কার পুষ্টিহীনতার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারে। প্রসূতি পুষ্টিহীন হলে শুধু যে অপুষ্ট, ক্ষীণজীবী শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা তাই নয়, পুষ্টিহীনতাব দরুন প্রসূতির রোগনিবোধের ক্ষমতা না থাকায় গর্ভাবস্থায় তিনি যে-কোনো রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তাছাড়া, সন্তানপ্রসবের সময় শাবীবিক ও মানসিক সহনশীলতা কম থাকার জন্যে প্রসূতিকে গুরুতব কষ্ট পেতে হতে পারে, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর জীবন বিপন্ন হওয়াও আশ্চর্য নয়।

প্রসূতিব পক্ষে উপযুক্ত পুষ্টিকব খাদ্য কি ?—প্রসূতিব উপযুক্ত খাদ্য তা-ই যা তাঁর শবীরে ক্যাল্‌সিয়ম, আয়রন, ফসফবাস ইত্যাদি খনিজপদার্থ প্রচুর পবিমাণে সরববাহ করবে। আর এরই সঙ্গে দরকাব সেই রকম খাদ্য যা প্রসূতির দেহে কয়েক রকম ভিটামিন, বিশেষত ভিটামিন-ডি ও ভিটামিন-ই, সববরাহ করবে। এইসব ভিটামিন কিন্তু নিজেবা শবীবেব পুষ্টি বাড়ায় না। ভিটামিন-ডি'র সাহায্যে ক্যাল্‌সিয়ম-জাতীয় খনিজদ্রব্য খাদ্যবস্তু থেকে ছাড়া পায় এবং সেই ক্যাল্‌সিয়ম গর্ভস্থ ভ্রূণেব হাড় ও পরে দাঁত ইত্যাদি গড়বার কাজে সাহায্য করে। তেমনি ভিটামিন-ই'র সাহায্যে ভাবী শিশুর প্রাণরক্ষা হয়। মাছ, মাংস, পাঁঠার মেটে বা liver, ডিম, ছানা, দুধ, মাখন, পাকা ফল, তাজা শাকসবজি প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর মধ্যে উপরোক্ত ক্যাল্‌সিয়ম ইত্যাদি খনিজ পদার্থগুলি ও উপরোক্ত ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কাজেই প্রসূতির পক্ষে এইসব খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিদিন খাওয়া দরকার। মনে রাখবেন, এ-সব পুষ্টিকব খাদ্য সাধারণত উপযুক্ত পরিমাণে—অর্থাৎ যতটা খেতে প্রসূতির ভালো লাগে কিংবা খেলে সহজে হজম হয় ততটা—খেলেই কাজ চলে যাবে ; সর্বক্ষেত্রেই বেশি পরিমাণে খাওয়ার দরকার করে না। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে জ্বাল-দেওয়া সাগু, ফল ও টাটকা

শাকসবজি খেলে আপনাথেকেই পায়খানা পরিষ্কার হবে, স্বতন্ত্রভাবে জোলাপ নেবার দরকার হবে না। ভাত, রুটি, পাঁউরুটি, ডাল— অভিরুচি অনুসারে এ-সব জিনিসও উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া ভালো। বিশেষ করে ভাত ও রুটির জন্যে যথাক্রমে ঢেঁকি-ছাঁটা চাল ও জাঁতায় ভাঙা লাল আটা জোগাড় করতে পারলে খুবই ভালো। হাতে-গড়া রুটি, পাঁউরুটি এবং ডাল নিছক শর্করাজাতীয় খাদ্য নয়, আমিষজাতীয় খাদ্যও বটে। কাজেই এ-সব খাদ্য প্রতিদিন বেশ কিছু পরিমাণে খাওয়া দরকার।

খাওয়া অভ্যাস থাকলে ও খেয়ে হজম করতে পারলে দুধ একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। অবশ্য খেতে ভালো না লাগলে বা হজম করতে না পারলে জোর করে দুধ খাবার দরকার নেই। দুধ পছন্দ না করলে দুধ থেকে তৈরি অন্যান্য খাদ্য— যেমন, ঘি, মাখন, ছানা, ছানার তৈরি খাবার, দই ইত্যাদিতেও কাজ চলবে। তবে দুধ বা দুধ থেকে তৈরি কোনো জিনিসই যদি প্রসূতির পছন্দ না হয় তাহলে সেকথা ডাক্তারবাবুকে জানাবেন, তিনি তার বদলে অন্য কোনো খাবার খেতে বলবেন কিংবা ক্যাল্‌সিয়ম ইত্যাদির পরিপূরক টনিক খাওয়ার পরামর্শ দেবেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। প্রসূতির খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়ম থাকা খুবই আবশ্যক, এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু তা উপযুক্ত পরিমাণেই, মাত্রা-ছাড়ানো অত্যধিক পরিমাণে নয়। কেননা কোনো খাদ্য মাত্রা ছাড়িয়ে অত্যধিক পরিমাণে খেলেই যে তার সমস্ত খাদ্যগুণটুকু শরীর শুষে নিয়ে কাজে লাগায় তা নয়, বরং শরীরের পক্ষে ঠিক যতটুকু খাদ্যগুণ দরকার কিংবা শরীর যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু সে শুষে নেয়, বাকি খাদ্য অবশিষ্ট খাদ্যগুণসমেত নেহাতই মলমূত্ররূপে শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। অথচ অনেকে এই সহজ কথাটি মনে রাখেন না। এঁরা প্রসূতিকে অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়ম-যুক্ত খাদ্য খাওয়ানোর পক্ষপাতী। যেমন, এঁরা মনে করেন প্রসূতি দৈনিক সেরখানেক কিংবা তার বেশি দুধ খেলেই বুঝি গর্ভস্থ শিশুর হাড় ক্যাল্‌সিয়ম-ঠাসা

হয়ে লোহার মতো শক্ত হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রথমত, এত বেশি পরিমাণে দুধ হজম হবে না কিংবা অত ক্যাল্‌সিয়ম শরীর গ্রহণ করবে না; দ্বিতীয়ত গর্ভস্থ শিশুর হাড় গড়ে ওঠার জন্যে বেশি ক্যাল্‌সিয়ম-এর দরকার পড়ে গর্ভাবস্থার একেবারে শেষের কয়েক মাস, তার আগে ক্যাল্‌সিয়ম-এর প্রয়োজন হয় সামান্যই; তৃতীয়ত, (খুব সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন) দুধে ফস্‌ফরাস্‌-জাতীয় উপাদান খুব বেশি পরিমাণে থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ দুধ খেলে শরীর তা থেকে যতটা ক্যাল্‌সিয়ম শুষে নিতে পারে মাত্রাতিরিক্ত দুধ খেলে সে-পরিমাণ ক্যাল্‌সিয়ম গ্রহণ করতে পারে না। আসল কথা, দৈনিক যতটা করে দুধ প্রসূতির খেতে ভালো লাগে ও হজম হয় তিনি ঠিক ততটাই খাবেন, তার বেশিও নয়, কমও নয়। তবে প্রসূতি যদি অতিরিক্ত মোটা হন কিংবা মোটা হবার দিকে তাঁর প্রবণতা থাকে তাহলে তিনি সাধারণ দুধের বদলে মাখন-তোলা দুধও খেতে পারেন।

প্রসূতি মেয়েদের অতিরিক্ত পরিমাণে জল পান করতে বলা হয়। অনেক প্রসূতির জল পানের ইচ্ছাও প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়। প্রসূতির প্রস্রাবের পরিমাণ যদি অল্প হয় কিংবা তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা থাকে তাহলে অবশ্য বেশি পরিমাণে জল পান করা ভালোই। এতে তাঁর প্রস্রাব ও পায়খানা পরিষ্কার হবে। কিংবা এমনিতে তাঁর জল পানের অভ্যাস না-থাকলে এ-সময়ে সে-অভ্যাস শুরু করাও মন্দ নয়। কিন্তু শরীরে এ-রকম কোনো গণ্ডগোল না থাকলে খামোখা মাত্রা-ছাড়ানো জল পান করার দরকার নেই। গর্ভাবস্থার আগে তিনি যে-পরিমাণ জল খেতেন, এখনো মোটের ওপর তাই খেলেই চলবে। মোট কথা, দিনে সাধারণত পাঁচ-ছ' গ্লাসের বেশি জল খাওয়ার দরকার নেই।

আমাদের গরম দেশে এমনিতে রান্নাবান্নায় কিছু বেশি পরিমাণে নুন খেলে ক্ষতি হয় না। কেননা এখানে ঘাম ইত্যাদির সঙ্গে অনবরতই দেহ থেকে নুন বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেয়েদের অন্যান্য সময়ের সঙ্গে

গর্ভাবস্থার তফাত এই যে এ-সময়ে গ্রন্থিক্ষরণ বা হর্মোনগুলি লবণ-জাতীয় পদার্থ খাদ্য থেকে শুষে নিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে জমাতে সাহায্য করে। ফলে খাবারের মধ্যে নুন কিংবা নোনতা খাবার বেশি পরিমাণে খেলে অনেক সময় প্রসূতির পায়ের গোড়ালিতে শোথ হতে দেখা যায়। ইংরেজিতে একে edema বলে। শরীরে অত্যধিক নুন জমে গেলে বাড়তি জল এইভাবে ধরে রেখে শরীর সেই নুন গলিয়ে ফেলতে চায়। এই ধরনের শোথ বা ফোলা অবশ্য এমনিতে কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। তবে এ অস্বস্তিকর ও দেখতে কুশ্রী। গোড়ালি ফুললে প্রসূতির পক্ষে খাবারের সঙ্গে নুন খাওয়া যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলা বিধেয়। কিন্তু এই গোড়ালি ফোলার সঙ্গে যদি মাথা ধরা, রক্তের চাপবৃদ্ধি, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন-জাতীয় পদার্থের ক্ষরণ, ইত্যাদি উপসর্গও থাকে তাহলে বুঝবেন ব্যাপার অত সহজ নয়। এ-সব লক্ষণ ধরা পড়লে অবিলম্বে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো চলবেন।

যাই হোক, একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন। গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার বলে আপনার চিরাভ্যস্ত খাদ্যতালিকা নিজের খুশিমতো হঠাৎ বদলাতে যাবেন না। বিশেষ করে খাদ্যতালিকার কোনো গুরুতর রকমফের তো নয়ই। খাদ্যতালিকায় গুরুতর কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করলে ডাক্তারবাবু নিজে থেকেই আপনাকে সেরকম পরামর্শ দেবেন, বা আপনার জন্যে বিশেষ খাদ্যতালিকা তৈরি করে দেবেন। কাজেই খাদ্যতালিকায় কোনো রকম পরিবর্তনের দরকার হলে ডাক্তাববাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে তা ঘটাবেন না। মনে রাখবেন, আপনার অভ্যস্ত খাদ্যতালিকায় আচমকা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটালে হজমের গণ্ডগোল ঘটা বিচিত্র নয়। পাকস্থলী ও অন্ত্র নামেব খাদ্যপরিপাক-অঙ্গগুলি আপনার নির্ধারিত এক বিশিষ্ট ধরনের ও বিশিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও পানীয়ের বোঝা বইতে অভ্যস্ত। এখন হঠাৎ সেই বোঝার বিশেষ প্রকৃতি ও পরিমাণ পালটে গেলে অকারণে উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে

বায়ুর চাপজনিত বেদনা, ইত্যাদি অস্বস্তিকর অসুখ দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া নিয়ে আলোচনা করা গেল। এবার বেশি করে খাওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে কিছু বলা যাক। যে-সব প্রসূতির স্বাস্থ্য মোটের ওপর সাধারণ, বেশি মোটাও না আবার বেশি রোগাও না, ওজন যাঁদের মোটামুটি স্বাভাবিক, গর্ভাবস্থায় তাঁদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার দরকার রয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে খাওয়ার দরকার নেই। অন্য সময়ের চেয়ে এ-সময়ে বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার দরকার হতে পারে একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই, যাঁদের ওজন অস্বাভাবিক কম, যাঁরা বেশি রোগা ও ক্ষীণজীবী। অবশ্য আমাদের দরিদ্র দেশে এ-রকম দুর্বলদেহ, কম ওজনবিশিষ্ট প্রসূতির সংখ্যা মোটেই কম নয়। গর্ভাবস্থায় বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে ফেলার একটা সুযোগ এঁদের মধ্যে অনেকে পেতে পারেন। সে-সুযোগের পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করা উচিত। এ-ধরনের কিছু কিছু দুর্বল মেয়ে অন্য সময়ে বেশি খেয়েও মোটা হতে পারেন না; এঁদের মধ্যেও অনেকের গর্ভাবস্থায় বেশি খাওয়ার দরুন স্বাস্থ্য ফিরে যেতে দেখা যায়।

অতএব রোগা চেহারার, কম-ওজনের প্রসূতিরা গর্ভাবস্থায় বেশি খেয়ে-দেয়ে ওজন বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করবেন। এজন্যে, প্রথমেই ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গর্ভাবস্থাকালীন বিশেষ খাদ্যতালিকা তৈরি করিয়ে নিন। এই অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে গিয়ে যদি হজমের গোলমাল দেখা দেয় তাহলে ডাক্তারবাবুদের জিজ্ঞাসা করুন সে-গণ্ডগোল এড়িয়ে কিভাবে তা খাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় অন্য সময়ের চেয়ে বেশি খেলে প্রসূতির স্বাস্থ্য ফেরবার সম্ভাবনা বেশি থাকে কেন?—সাধারণত দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শেষাশেষি প্রসূতির শরীরের ওজন তাঁর গর্ভাবস্থার

আগেকার ওজনের চেয়ে পনেরো থেকে কুড়ি পাউণ্ডের মতো বেড়ে যায়। এই বাড়তি ওজনেব খানিকটা অবশ্য গর্ভস্থ শিশুর ওজন। এছাড়া বাকি বাড়তি ওজনটা গর্ভফুল, জলেব থলি, বড়-হয়ে-ওঠা জরায়ু, দেহকোষের সর্বত্র জমা অতিবিক্ত জল ও প্রসূতির শরীবের সামান্য বাড়তি মেদেব ওজন মিলেমিশে তৈবি হয়। তবে সন্তান-প্রসবেব পর সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ দুয়েকেব মধ্যে এই বাড়তি ওজনের প্রায় সবটাই আপনা থেকে উবে যায়। এখন, কোনো প্রসূতির ওজন স্বাভাবিকেব চেয়ে দশ কিংবা কুডি পাউণ্ড কম থাকলে, তিনি যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁব ওজন পঁয়ত্রিশ পাউণ্ডের মতো বাড়িয়ে নিতে পাবেন, তাহলে সন্তান-প্রসবের পরও তাঁর দেহে পনেবো থেকে কুড়ি পাউণ্ডের মতো বাডতি ওজন থেকে যাবাব সম্ভাবনা। ফলে প্রসবেব পব তাঁব চেহাবা পুষ্ট হবে, স্বাস্থ্যও ফিরবে।

অনেক মেযে মনে কবেন গর্ভাবস্থায বেশি খেযে ওজন বাড়ালে গর্ভস্থ শিশুও বেশি মোটাসোটা হবে ফলে প্রসবেব সময় কষ্ট হবে বেশি। এ-ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েব ওজন বাড়ার সঙ্গে শিশুব মোটাসোটা হওয়াব সম্পর্ক খুবই সামান্য। দুটি প্রসূতির কথা ধরা যাক। দেখা গেল, গর্ভাবস্থায এক জনেব ওজন বেড়েছে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড, অন্যজনেব মাত্র কুড়ি পাউণ্ডেব মতো। কিন্তু এ-থেকে এমন ধাবণা কবা খুবই ভুল হবে যে ওই প্রথম প্রসূতির গর্ভস্থ শিশু দ্বিতীয় প্রসূতিব শিশুব চেযে বেশি মোটাসোটা হবেই। অনেক সময়, এব ঠিক উল্টো ব্যাপাবটিও ঘটতে দেখা যায়। আসল কথা হল, গর্ভস্থ ভ্রূণেব বেঁচে-থাকা ও পুষ্টির জন্যে যতখানি খাদ্য দবকাব ঠিক ততখানি খাদ্যই মায়েব বক্ত থেকে গর্ভফুল মাবফত ভ্রূণেব রক্তে চলে যায় , তাব বেশিও যায না, কমও যায় না। ফলে বেশি খেলে প্রসূতির যে-পবিমাণ অতিরিক্ত পুষ্টি হবে, ভ্রূণের সে-তুলনায় প্রায় কিছুই হবে না। তাছাড়া, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রসূতি বেশি খাওয়াব জন্যে গর্ভস্থ শিশু যদি

একটু-আধটু বেশি মোটা হয়েও, তার ফলে প্রসবের সময় খুব একটা বাড়তি কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কেননা, ভূমিষ্ঠ হবার সময় শিশুর মাথাটাই থাকে তার দেহের অন্য অংশের তুলনায় সবচেয়ে বড়, আর ভূমিষ্ঠ হবার আগে এই গর্ভস্থ শিশুর মাথায় মেদ বা চর্বি একেবারেই জমে না।

পরিশেষে, গর্ভাবস্থায় প্রসূতির বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলা দরকার। আমরা আগেও বলেছি, ফের একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, বেশি-খাওয়া কিন্তু সব প্রসূতির পক্ষে ঠিক নয়। বেশি-খাওয়া যাঁদের পক্ষে প্রয়োজন, ওপরে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাহলে কোন্ কোন্ ধরনের প্রসূতির পক্ষে বেশি খাওয়ার প্রয়োজন নেই ?—প্রথমত, অবস্থাপন্ন আধুনিক পরিবারের সেইসব মেয়ের, যারা সাধারণত উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যগুণযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত, যাঁরা স্বাভাবিক সুস্থ এবং উচ্চতা অনুসারে যাঁদের শরীরের ওজন সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য পরিবারের সেইসব মেয়ের, যাঁরা স্বাভাবিক সুস্থ, ওজন যাঁদের স্বাভাবিক এবং সাধারণত উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য না পেলেও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পরিবারের পক্ষ থেকে যাঁদের জন্যে বেশি করে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে এই দুই ধরনের প্রসূতির মধ্যে যাদের মোটা হওয়ার দিকে প্রবণতা আছে তাঁদের পক্ষে এ-সময়ে বেশি না-খাওয়াই উচিত। কারণ অতিরিক্ত খেলে এ-ধরনের প্রসূতির ওজন পনেরো-কুড়ি পাউণ্ডের চেয়ে ঢের বেশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে প্রসবের পরে ওই বাড়তি পনেরো-কুড়ি পাউণ্ড ঝরে গিয়েও যা থাকবে তাতে আগে যাঁকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী বলা হত এখন তাঁকে অক্লেশে 'মোটা' বলা চলবে। ছেলে হতে গিয়ে এভাবে মোটা হয়ে অকালে বুড়িয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া, আরো গুরুতর কথা এই যে প্রসূতি অতিরিক্ত মোটা হলে গর্ভাবস্থায় তাঁর নানারকম বিপদ-আপদের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। স্থূলকায় প্রসূতিদের

গর্ভাবস্থায় রক্তদূষিত রোগে আক্রান্ত হওয়াও খুব একটা দুর্লভ ঘটনা নয়।

স্থূলকায় মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা হলে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে প্রথমেই যেন তাঁদের খাদ্যতালিকা নিয়ে আলোচনা করেন। অভিজ্ঞ ধাত্রীবিৎরা বলেন, প্রসূতির ওজন অস্বাভাবিক বেশি হলে গর্ভাবস্থায় খাদ্যের পুষ্টিকারকতা বজায় রেখে তার পরিমাণ কমাতে কোনো বাধা নেই। এর ফলে গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটবে না। এর মানে অবশ্য এ নয় যে স্থূলকায় প্রসূতি মাছ, মাংস, ডিম, মাখন-তোলা দুধ, ছানা ইত্যাদি আমিষজাতীয় ও ভাত, চিনি, আলু ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে খাবেন না। কেননা উপযুক্ত পরিমাণে আমিষ-পদার্থ না খেলে সন্তানের পুষ্টি ঠিকমতো হবে না, আবার উপযুক্ত শর্করা-পদার্থ না খেলে এ-ধরনের প্রসূতির অম্বলের প্রবণতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই "উপযুক্ত পরিমাণ"-টি ঠিক কী, তা নির্ণয় করবেন ডাক্তারবাবু, প্রসূতি নিজে নন। ডাক্তারবাবুই এরকম প্রসূতির জন্যে এমন এক সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যতালিকা তৈরি করে দিতে পারবেন যাতে উপযুক্ত পরিমাণে আমিষ ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে অথচ ওই একই সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণটি কমিয়ে ফেলা যায়। তবে খাদ্যের পরিমাণ বেশিরকম কমিয়ে দিলে ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভিটামিন ও ক্যাল্‌সিয়ম ইত্যাদি খনিজপদার্থ স্বতন্ত্রভাবে বড়ি কিংবা তরল ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেবেন। এইভাবে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ খাদ্যতালিকা তৈরি করে নিলে গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টিতে অবশ্যই কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ফলে অন্ততপক্ষে স্থূলকায় প্রসূতির গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়া যদি বন্ধ হয়—অর্থাৎ তাঁর ওজন না বেড়ে আগের মতোই থাকে—তাহলে প্রসবের পরে পনেরো-কুড়ি পাউণ্ড কমে যাওয়ার পর দেখা যাবে তাঁর ওজন আসলে ওই পনেরো কিংবা কুড়ি পাউণ্ড কমে গেছে।

প্রসূতির পথ্য বা খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একটা কথা ফের স্মরণ করিয়ে

দিই। গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া দরকার বলে, কিংবা আপনি অতিরিক্ত রোগা কিংবা মোটা বলে নিজের খেয়াল-খুশিমতো অভ্যস্ত খাদ্যতালিকা আচমকা বদলাবার চেষ্টা করবেন না। এ-ব্যাপারে কোনো কিছু করার আগে আপনার ডাক্তারবাবুর মত নিন। তিনি যদি মনে করেন গর্ভাবস্থায় আপনার অভ্যস্ত খাদ্যতালিকায় কিছু কিছু পরিবর্তন দরকার, তাহলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন সে-পরিবর্তনগুলো ঠিক কী ধরনের হবে। আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ খাবার কতটা পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন ও নিরাপদ তা ঠিক করার ভার তাঁর ওপরই ছেড়ে দিন।

পাঁচ | গর্ভাবস্থার কয়েকটি পরিচিত উপসর্গ

খাদ্য-পরিপাক ক্রিয়া

গা-বমির ভাব, বমি, অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি—মোটরে বা ট্রেনে চেপে দীর্ঘপথ সবেগে ভ্রমণ কিংবা পাহাড়ি রাস্তায় ভ্রমণ, সমুদ্র-যাত্রা কিংবা এরোপ্লেনে ভ্রমণ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই বমি করে ফেলেন, আবার অনেকের গা-বমির ভাবও দেখা যায়। কেন এমন হয়? এর কারণ, আমাদের অভ্যস্ত পাবিপার্শ্বিক অবস্থা আচমকা বা দ্রুত বদলে যাওয়ার ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-গুলির ক্রিয়াকলাপেব সামঞ্জস্যও নষ্ট হয়ে যায়। যে-সব আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সামঞ্জস্য সবচেয়ে আগে নষ্ট হয়, আমাদের পরিপাক-যন্ত্র তাদের মধ্যে একটি। ফলে হয় বমি হয়, নয় গা-বমির ভাব থাকে, আব নয়তো শুধুই অগ্নিমান্দ্য বা অকচির ভাব দেখা যায়।

গর্ভাবস্থায় মেয়েদের ওই একই ধবনের ব্যাপাব ঘটে। তবে এক্ষেত্রে পরিবর্তনটা ঠিক বাইবেব পারিপার্শ্বিকের নয়, এটা তাঁদেব শবীরের ভেতরকার। গর্ভে সন্তান এলে প্রসূতির শরীবের ভেতর পবিবর্তনেব সূচনা হয়। আব এই পরিবর্তনের ফলে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত ঘটে, তাই গা-বমির ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। এই সময়ে খাবার-দাবাব, চা, সিগারেট, ওষুধ-বিষুধ, মানুষের ঘামেব গন্ধ প্রভৃতি যে-কোনো জিনিসের কড়া গন্ধেই এই বমিব ভাব বেড়ে যেতে পারে। আবার সকালে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে গিয়ে, কিংবা খাওয়ার পর মুখ ধুতে গিয়ে হঠাৎ গা-গুলিয়ে ওঠা ও বমি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বমি, গা-বমির ভাব, অরুচি ইত্যাদি কখন দেখা দেয় ও কতদিন স্থায়ী হয়?— এ-সমস্ত উপসর্গ সকলের ক্ষেত্রে হুবহু

এক সময়ে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন প্রসূতিও দেখা যায় যাঁদের গর্ভাবস্থার কোনো সময়েই এ-রকম কোনো উপসর্গ দেখা দেয় না। আবার, প্রথম গর্ভকালে এ-সব উপসর্গ দেখা দিলেও, দ্বিতীয় গর্ভের সময় এদের তীব্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি গর্ভের সময় এ-ধরনের কোনো রকম উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না—এমন দৃষ্টান্তও বেশ কিছু পাওয়া যায়। যে-সব প্রসূতির বেলায় বমি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, সাধারণত গর্ভসঞ্চারের পর মাস-খানেকের মধ্যেই তাঁদের শরীরে এর প্রথম সূচনা প্রকাশ পায়। তারপর এদের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং সাধারণত দ্বিতীয় মাসেই এ-সব উপসর্গ তীব্রতম আকার নেয়। অতঃপব গর্ভাবস্থার আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের তীব্রতা অনেকখানি কমে আসে কিংবা উপসর্গগুলি একেবারে লোপ পায়। তবে অনেক সময় ছোটখাট নানা রকম উপসর্গ সারা গর্ভাবস্থা জুড়েই বজায় থাকে। যেমন, মুখ বিস্বাদ বা তেতো হয়ে থাকা, সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠাব পব শ্লেষ্মা বা কফে নাক-গলা বুজে থাকা, ইত্যাদি।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, বমি, গা-বমিব ভাব, অরুচি ইত্যাদি উপসর্গ গর্ভাবস্থাব প্রথম তিন মাস সচবাচব স্থায়ী হয় ও তারপর লোপ পায়। কিন্তু অল্প কিছু প্রসূতিব ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থাব একেবারে শেষেব কয়েক সপ্তাহে এ-সব উপসর্গ ফের ফিরে আসতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত প্রসূতিদের সম্পর্কে পবে আলোচনা করা হচ্ছে।

গর্ভাবস্থাব তৃতীয় মাসের পর সাধারণত এ-সব উপসর্গ কমে যায় বা লোপ পায় কেন?—আমরা জানি, গর্ভে সন্তান আসার ফলে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের শরীবের অভ্যন্তরে পরিবর্তন ঘটে বলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ক্রিয়াকলাপেও ব্যাঘাত ঘটে ও সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। ফলে বমি, গা-বমির ভাব, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির শরীরযন্ত্র এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপও খাইযে নিতে পারে। তাই এ-সব উপসর্গের শারীরিক কারণ লোপ পায় বলে উপসর্গগুলিও লোপ পায় কিংবা অনেক কমে আসে।

তবে এই সব উপসর্গের ভিত্তি মূলত শারীরিক হলেও মানসিক কারণও কখনো কখনো এর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মানসিক কারণে এদের তীব্রতা যেমন বেড়ে যেতে পারে, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক কারণ লোপ পাওয়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিছক মানসিক কারণে এ-সব উপসর্গের জের চলে। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। ধরুন, পূর্বে কোনো এক সময়ে মোটর-গাড়ি কিংবা বাসে চেপে দীর্ঘ রাস্তা ভ্রমণ করার সময় আপনার রীতিমতো শরীর খারাপ ও বমি হয়েছিল। পরে অন্য সময়ে মোটরে চেপে ফের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার প্রস্তাবে, কিংবা ঐ উদ্দেশ্যে গাড়িতে চেপে মোটর স্টার্ট দেওয়া মাত্রই, আপনার গা-গুলিয়ে উঠল কিংবা বমি হল। এর কারণ কি? এই দ্বিতীয়বার গা-গুলিয়ে ওঠা কিংবা বমি হওয়ার কাবণটা নিশ্চয়ই শারীরিক নয়, মানসিক। হয়তো সেই প্রথমবারের কষ্ট ও বমি হওয়ার ঘটনাটা নিছক আলোচনার ফলে, কিংবা গাড়ির পেট্রোলের পরিচিত গন্ধে, মনে পড়ায় এই দ্বিতীয় বারেব উপসর্গটি দেখা দিল। এই 'মনে পড়া'র ব্যাপারটি বড় সহজ বস্তু নয়। কোনো এক বিশেষ পরিবেশে উপস্থিত হলে কিংবা বিশেষ কোনো গন্ধ নাকে গেলে আগেকার কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপার মনে পড়া ও গা-গুলিয়ে ওঠা বা বমি হওয়ার মতো ঘটনা কিছু দুর্লভ নয়। এই কারণেই কিছু কিছু প্রসূতিকে গর্ভাবস্থাব প্রথম তিন মাসের পরেও অনেক দিন পর্যন্ত বমি করতে দেখা যায়। তবে, এও ঠিক, সব ক্ষেত্রেই এই শেষোক্ত ধরনের ব্যাপার যে মানসিক কারণে ঘটে তা নয়।

বমি, গা-বমিব ভাব, ইত্যাদি উপসর্গ সাধারণত ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর প্রবল হয়ে ওঠে বলে একে অনেকে প্রত্যুষের অসুস্থতা বা "ভোরবেলার অসুখ" বলে থাকেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-উপসর্গ ভোরের চেয়ে দিনের অন্যান্য সময়েই প্রবল হতে দেখা যায়। অনেক সময় শারীরিক ক্লান্তির জন্যেও এগুলি প্রবল হয়ে ওঠে; ফলে যে-সব প্রসূতি আপিসের চাকরি বা

সংসারের কাজ ইত্যাদি করেন তাঁদের মধ্যে সন্ধ্যার দিকে এ-সমস্ত উপসর্গ প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায়।

বমি ও গা-বমির ভাব যতো তীব্রই হোক না কেন তার জন্যে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটতে পারে বলে ভয় পাবার কিছু নেই। মনে রাখবেন, স্বাভাবিক সুস্থ ও বাড়ন্ত ভ্রূণের জান্ বড় কঠিন, অনেক কষ্ট সহ্য করেও ভ্রূণ বেঁচে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রসূতির পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ শুধুমাত্র বমির জন্যেই শিশুর কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

নিতান্ত বিরল দু-একটা ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি রকমের বমি হওয়ার দরুন প্রসূতিকে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা যায়। এ-রকম ক্ষেত্রে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করে চিকিৎসা করানোই ভালো। সাধারণত শারীরিক কারণের সঙ্গে গুরুতর মানসিক কারণ যুক্ত হলে তবে এ-রকম বাড়াবাড়ি ঘটে। যাই হোক, এ-ধরনের অসুস্থতা প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে ভয়ের কথা। তবে বর্তমানে ডাক্তাররা ইঞ্জেক্শনের সাহায্যে নানা রকম ভিটামিন প্রসূতির শরীরে চালান করে দিতে সক্ষম বলে এ-ধরনের অসুখ আগেকার দিনে যতটা মারাত্মক ছিল এখন আর ততটা নেই। বর্তমানে হাসপাতাল-গুলিতে প্রসূতির শিরার মধ্যে ইঞ্জেক্শনের (intravenous injections) সাহায্যে ভিটামিন ও নানা রকমের খাদ্যগুণ চালান করার ব্যবস্থা আছে। এইভাবে প্রসূতির শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় ও খনিজ লবণজাতীয় পদার্থ, গ্লুকোজ ও নানা ধরনের ভিটামিন সরবরাহ করে এবং সেই সঙ্গে সামান্য কিছু পরিমাণ খাদ্য মুখ দিয়ে তাঁকে খাইয়ে প্রসূতি ও শিশুর মোটামুটি পুষ্টির ব্যবস্থা করা হয়, ফলে বিপদ কেটে যায়। তবে এর ফলে প্রসূতির ওজন কিছু কমে যেতে পারে, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। সুস্থ হয়ে ওঠার পর প্রসূতি ফের মুখ দিয়ে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে শুরু করলে ক্রমে তাঁর ওজন স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

তবে, আবার বলছি, এ-রকম ঘটনা নেহাতই বিরল। তা বলে

অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের মধ্যে বমি, গা-বমি ইত্যাদি উপসর্গ কিন্তু মোটেই বিরল নয়। বরং বলা যায় প্রায় সমস্ত প্রসূতিই, বিশেষ করে প্রথম প্রসূতি, কম-বেশি মাত্রায় এ-সমস্ত উপসর্গে ভুগে থাকেন। কিন্তু এ-উপসর্গের তীব্রতা কমানোব উপায় কি ?

একটা হল, প্রাকৃত বা স্বভাব-চিকিৎসা। চিকিৎসা মানে, কয়েকটি সহজ বুদ্ধির নিয়ম মেনে চলা। যেমন, সকালে ঘুম ভাঙলে পর যদি আপনার গা-বমির ভাব প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে বাসী মুখেই অল্প কিছু খেয়ে নিন। খাবার জিনিসটি শুকনো, মুচমুচে হলেই ভালো হয়। দু-এক মুঠো মুড়ি কিংবা চিঁড়েভাজা, বিস্কুট কি নুন-মাখানো বাদাম দু-চারটি, কিংবা এক টুকরো টোস্ট-করা পাঁউরুটি রাত্রে মাথার শিয়রে রেখে প্রসূতি যদি ঘুমোন তো মন্দ হয় না। তবে ভোরবেলা ফলের রস, কিংবা জল বা জলীয় কোনো জিনিস মোটেই খাবেন না। শুধু ভোববেলা বলে নয়, দিনের যে-কোনো সময়েই গা-বমির ভাব দেখা দিলে জল বা জলীয় জিনিস থেকে অবশ্যই দূরে থাকবেন। নইলে রক্ষা নেই, বমি হবেই।

ঘুম থেকে জেগে সামান্য কিছু খাবার পর অন্তত আরো আধ ঘণ্টা বিছানা ছেড়ে নড়বেন না, চুপচাপ শুয়ে থাকুন। অত খালি পেটে চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বেন না। পেট খালি থাকলে এবং ক্ষুধার ভাব থাকলে তা থেকেই গা-বমির ভাব তৈরি হয়।

তাছাড়া দিনের অন্যান্য সময়েও খালি পেটে থাকা উচিত হবে না। এ-কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দবকার। সারা দিন আপনি যেখানেই থাকুন না কেন হাতেব কাছে বিস্কুট বা ওই জাতীয় কিছু টুকিটাকি খাবার জিনিস রেখে দেবেন ও ইচ্ছা হলেই খাবেন। এমন কি, গা-বমির ভাবের জন্যে দুপুরে ও রাত্রে এক জায়গায় বসে দু-বার ভরপেট খাওয়া যদি সম্ভব না হয় তবে অল্প অল্প করে দিনের মধ্যে বারে বারে খাওয়াও অভ্যাস করতে পারেন।

শারীরিক ক্লান্তির ফলেও অনেক সময় গা-বমির ভাব বেড়ে যায়।

কাজেই গা-বমির ভাব দেখা দিলে সম্ভবস্থলে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করবেন। এ-সময়ে প্রতিদিন রাত্রে সকাল-সকাল শুয়ে পড়া ভালো। তাছাড়া, দিনের মধ্যেও এক সময়--যেমন ধরুন খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর বেলায়—নিয়ম করে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিতে পারলে খুব ভালো হয়।

প্রসূতির বমি ইত্যাদি উপসর্গ কমানোর আর একটা উপায় হল, ওষুধ খাওয়া। বমির ভাব কমানোর অনেক ফলপ্রদ ওষুধ আছে তবে সব ওষুধই যে সব প্রসূতির ওপর সমানভাবে কার্যকরী হয় তা নয়। তবে এ-ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখবেন। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া নিজের বুদ্ধিমতো ওষুধ খাওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনার ডাক্তারবাবুই ঠিক করবেন আপনার পক্ষে কোন্ ওষুধটি কত পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন এবং সেই অনুসারে তিনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করে দেবেন।

গর্ভাবস্থার গোড়ার দিকে একটু বেশিরকম বমি ও অরুচির ভাবে ভুগলে উপযুক্ত পরিমাণে ও সামঞ্জস্য রেখে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রসূতির পক্ষে কষ্টকর হতে পাবে। বিশেবজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন, এ-রকম ক্ষেত্রে জোর করে খাদ্যতালিকা মিলিয়ে মিলিয়ে সব রকম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। বরং যে-সমস্ত খাবার দেখলে প্রসূতির বমির ভাব দেখা দেয় সে-সব বাদ দিয়ে চলা তখনকার মতো শ্রেয়। বিশেষ করে আমিষ ও তেল-ঘিজাতীয় জিনিস, যেমন, চর্বিযুক্ত মাছ-মাংস এবং ঘি, মাখন, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি কয়েকদিনের মতো খাওয়া বন্ধ করলে ভালো হয়। প্রসূতির স্বাস্থ্য যদি স্বাভাবিক ভালো হয় এবং গর্ভাবস্থার আগে তাঁর মোটের ওপর পেটভরা পুষ্টিকর খাবাব খাওয়ার অভ্যাস (অর্থাৎ সামর্থ্য ইত্যাদি) থেকে থাকে, তাহলে এই সময়ে কয়েক দিন বা সপ্তাহ প্রয়োজনের চেয়ে কিছুটা কম খেলেও তাঁর বা তাঁর শিশুর এমন কিছু ক্ষতি হবে না। কেননা, প্রথমত, এ-ধরনের প্রসূতির শরীরে বেশ কিছু পরিমাণে সহনশীলতা ও শক্তি সঞ্চিত থাকে ; দ্বিতীয়ত, এই সময়ে

গর্ভস্থ ভ্রূণের পুষ্টির জন্যে অল্প পরিমাণ খাদ্যেই কাজ চলে যায়। তবে প্রসূতি যদি অস্বাভাবিক রোগা হন ও স্থায়ী পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন বলে দেখা যায় তাহলে অবশ্য ডাক্তারবাবু তাঁকে ইঞ্জেক্‌শনের সাহায্যে অতিরিক্ত খাদ্যগুণ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। এই দুই ধরনের প্রসূতিই পরে বমি ও অরুচির ভাব কাটিয়ে উঠে যথারীতি উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পারবেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ-সব ক্ষেত্রে পুষ্টিকর খাদ্যও জোর করে খাবার বা খাওয়ানোর চেষ্টা ঠিক নয়। কেননা এর ফলে কোনো কোনো পুষ্টিকর খাবারের প্রতি প্রসূতির স্থায়ী বিতৃষ্ণা জন্মাতে পারে। অর্থাৎ, বমির ভাব সেরে যাওয়াব পবেও বহুদিন পর্যন্ত এই বিতৃষ্ণা স্থায়ী হতে পারে। ফলে গর্ভাবস্থার বাকি বেশিরভাগ সময়টাতেই প্রসূতিকে এক বা একাধিক পুষ্টিকব খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে এবং তাঁব উপযুক্ত খাদ্যতালিকা তৈরি কবতে গিয়ে ডাক্তারবাবুকেও হিমসিম খেতে হতে পারে।

গা-বমির ভাব একটু বেশিরকম দেখা দিলে প্রসূতিকে যেমন জোর করে খাবার খাওয়ানো উচিত নয়, তেমনি জোর করে ভিটামিনের বড়িও খাওয়ানো অনুচিত। ভিটামিনের সব বকম বড়িতেই এমন একটা গন্ধ থাকে যা নাকে গেলে প্রসূতিব গা-বমির ভাব বেড়ে যাওয়াব সম্ভাবনা। আর গা-বমির ভাব বেড়ে গেলে অন্যান্য খাবার খাওয়া আরও শক্ত হয়ে উঠবে। ফলে হিতে বিপরীত হবে। তবে ডাক্তারবাবু প্রয়োজন বোধ করলে এই ধরনেব কোনো কোনো প্রসূতিকে ইঞ্জেক্‌শনের সাহায্যে ভিটামিন ইত্যাদি সরবরাহেব ব্যবস্থা কবতে পারেন।

পরিণত গর্ভাবস্থায় বমি, গা-বমি—গর্ভাবস্থার গোড়ার তিন মাসেই সাধারণত প্রসূতির বমি ইত্যাদি দেখা দেয় ও তা তিন মাসই মাত্র স্থায়ী হয়। তার পরের তিন মাস, অর্থাৎ গর্ভাবস্থার মাঝের তিন মাস, প্রায়ই প্রসূতির ক্ষুধা বেশ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এই তিন

মাস অতিরিক্ত না-খেয়ে মাত্রা রেখে খাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, আগেই বলেছি, অল্প কিছু প্রসূতিকে গর্ভাবস্থার একেবারে শেষের কয়েক সপ্তাহে আবার গা-বমির ভাবে খানিকটা কাবু হয়ে পড়তে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থার শেষাশেষি ফের অমন উপসর্গ দেখা দেবার কারণ কি? কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা নিতান্ত স্নায়বিক কারণে ঘটে। প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসার দরুন এ-সময়ে প্রসূতির জরায়ু আগের চেয়ে জোরে সংকুচিত হতে থাকে, তাই এমনটি ঘটে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার আগে নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাবের সময় যে-সব মেয়ের তলপেটে বেদনার সঙ্গে বমি বা গা-বমিব ভাব দেখা দেয়, অন্তঃসত্ত্বা হবাব পর তাঁদের ক্ষেত্রেই সচবাচর এ-রকম ব্যাপাব দেখা যায়। তবে এইসব উপসর্গ এ-সময়ে বেশিরকম দেখা গেলে তা মোটেই উপেক্ষা না করে অবিলম্বে ডাক্তারবাবুকে জানানো দরকার।

মুখে জল কাটা—বিশেষ করে যে-সব প্রসূতির স্নায়ু বা নার্ভ দুর্বল গর্ভাবস্থায় তাঁদেব শবীবে আরো এক ধরনেব অস্বস্তিকর উপসর্গ দেখা দিতে পাবে। তা হল, মুখের মধ্যে অতিরিক্ত লালা জমা বা জল কাটা। এ-উপসর্গটি প্রায়ই বমি বা গা-বমির ভাবের সঙ্গে দেখা দেয়, অথচ বমিব ভাব সেবে যাওয়া বা কমে যাওয়ার পরেও বহুদিন এটি টিকে থাকতে পারে। তবে সুখের বিষয় এই বিশেষ উপসর্গ খুব অল্পসংখ্যক প্রসূতির মধ্যে দেখা যায়। কোনো প্রসূতির পক্ষে এটি নিতান্ত অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ালে তিনি ওষুধের জন্যে ডাক্তারবাবুর স্মরণাপন্ন হতে পারেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য—গর্ভাবস্থায় শরীরের সাধারণ অভ্যাস বা নিয়ম অনেক সময় পালটে যায়। যেমন, যে-মেয়ের এমনিতে কোষ্ঠকাঠিন্য আছে অন্তঃসত্ত্বা হবার পর হয়তো দেখা গেল তাঁর প্রতিদিন নিয়মিত পায়খানা হতে শুরু হয়েছে। আবার যাঁর এমনিতে নিয়মিত পায়খানা

হয়, এ-সময়ে তাঁর মধ্যে হঠাৎ কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না হয় সেই চেষ্টাই করা দরকার। এ-অবস্থায় অবশ্য স্বভাবতই কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্ভাবনা বাড়ে। কেননা, জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ বেড়ে ওঠার ফলে জরায়ুর আকার যতই বাড়ে আশেপাশের অঙ্গগুলির ওপর ততই চাপ পড়তে থাকে। এ-কারণে শরীর থেকে মল বেরিয়ে যাবার পথটিও সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। অথচ, এ-সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, শরীর থেকে মল বেরিয়ে যাবার রাস্তাটি (অর্থাৎ নিচুমুখো বৃহদান্ত্র ও মলনালি) মল জমে ফেঁপে উঠলে এমন আক্ষেপ বা খিঁচুনি শুরু হতে পারে যে তাব ফলে জরায়ুর সংকোচন আরম্ভ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আব অসময়ে জরায়ুর সংকোচনের ফল যে কতদূব মাবাত্মক হতে পারে, আশাকরি প্রসূতিকে তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। তাছাড়া, প্রসূতির পক্ষে নিজের শরীরের ভিতবটুকু পবিষ্কার রাখবার জন্যেও নিয়মিত মলমূত্রত্যাগ প্রয়োজন; শুধু তাই নয়, গর্ভস্থ ভ্রূণ তার শরীরের যে-সব অপ্রয়োজনীয় জিনিস তাঁর মধ্যে চালান করে দেয় সে-সবও নিয়মিত বের করে দেবার জন্যে এটা বিশেষ দরকাব।

কিন্তু প্রসূতির কোষ্ঠকাঠিন্য কিভাবে দূব হতে পারে? আমরা আগেই আলোচনা করেছি, গর্ভাবস্থায় প্রসূতি উপযুক্ত পরিমাণে জল খেলে এবং তাঁর দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় প্রচুর তাজা শাকসবজি ও ফলমূল যোগ করলে কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা কিছু পরিমাণে দূর হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলে প্রসূতিব খাদ্যে তরল পদার্থ ও পানীয় জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে প্রসূতি সকালবেলায় খালি পেটে ঠাণ্ডা জল খাওয়া অভ্যাস করতে পারেন। এতে অনেকের পায়খানা পরিষ্কার হয়। দ্বিতীয়ত, প্রসূতির খাদ্যতালিকায় পাকা ফল ও শাকসবজির মাত্রাও বাড়ানো দরকার। তৃতীয়ত, প্রসূতির পক্ষে প্রতিদিন খানিকটা করে

শারীরিক পরিশ্রম করা একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু এ তো গেল স্বভাব-চিকিৎসা। কোষ্ঠকাঠিন্যের মাত্রা বেশি হলে শুধুমাত্র এই ব্যবস্থায় পুরো ফল নাও পাওয়া যেতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের মৃদু জোলাপ নেওয়াই বিধেয়। এইসব জোলাপের মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে নরম ও একেবারেই ক্ষতিকারক নয় তার মধ্যে ইষবগুলের ভূষি অন্যতম। প্রতিদিন নিয়ম করে গরম দুধ কিংবা শুধু জলের সঙ্গেও ইষবগুলের ভূষি খাওয়া মন্দ নয়। তবে এ-ধরনের জোলাপের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল কিংবা জলীয় পদার্থ খাওয়া দরকার, তা না হলে পায়খানা কষা হওয়া সম্ভব। এছাড়া যাঁদের কোষ্ঠকাঠিন্যের মাত্রা এত বেশি যে উপরোক্ত ধরনের জোলাপে কাজ হয় না তাঁরা অবশ্য ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুসারে ক্যাস্‌কারা কি অ্যাগারল কি চামচ দুই মিল্‌ক-অব-ম্যাগনেসিয়া জাতীয় মৃদু জোলাপও খেতে পারেন। যাঁদের এতেও পায়খানা পরিষ্কার হবে না তাঁরা অবশ্যই তাঁদের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেবেন এবং ডাক্তারবাবু স্থির করবেন তাঁরা খনিজ তেল কিংবা ওই তেলযুক্ত কোনো কড়া জোলাপ নেবেন কিনা কিংবা নিলে কত পরিমাণে নেবেন।

একটা কথা মনে রাখবেন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সাধারণত নরম বা মৃদু জোলাপ নেওয়াই বিধেয়। কেননা জোলাপ কড়া হলে তার ক্রিয়ার ফলে বৃহদান্ত্রের মাংসপেশীতে আক্ষেপ শুরু হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর বৃহদান্ত্রের আক্ষেপ আবার জরায়ুর সংকোচন ঘটানোর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অম্বল ও বুকজ্বালা—সাধারণত গর্ভাবস্থার শেষের কয়েক মাস প্রসূতির শরীরে এই উপসর্গটি দেখা দিয়ে থাকে। এর প্রকৃত কারণ কি, এখনও পর্যন্ত তা জানা যায় না। তবে প্রসূতি ছাড়াও অন্যান্য যে-সব স্ত্রী-পুরুষ অতিরিক্ত পরিমাণে পানভোজন করেন কিংবা অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তায় ভোগেন সাধারণত তাঁদের মধ্যে এই

রোগের প্রবণতা দেখা যায়। এ-রোগের লক্ষণ হল, বুকের নিচের দিকটায় চাপ বোধ করা এবং বুক বেয়ে একটা জ্বালা-জ্বালা ভাব গলা পর্যন্ত উঠে-আসা। কখনো কখনো এর সঙ্গে মুখের মধ্যে টকটক জলও উঠে আসতে দেখা যায়।

অম্বল ও বুকজ্বালা দেখা দিলে প্রথমেই গুরু ভোজন বন্ধ করতে হবে এবং গুরুপাক ও বেশি মশলাযুক্ত খাবার ও ভাজা জিনিস বর্জন করতে হবে। এছাড়া প্রসূতির পক্ষে মন সর্বদা যথাসম্ভব প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করা দরকার। এই উপসর্গ সাময়িকভাবে দূর করার সহজতম ওষুধ হচ্ছে, এর সূচনা দেখলেই অল্প খানিকটা গরম দুধ কিংবা জলের সঙ্গে আধ চায়ের চামচ পরিমাণ খাবার সোডা খেয়ে ফেলা। এছাড়া অন্য যে-কোনো অ্যাল্‌কালি বা ক্ষারযুক্ত হজমের ওষুধ খেলেও এ-সব উপসর্গ সাময়িকভাবে সেরে যাওয়ার কথা। তবে এই ধরনের ওষুধ খাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া ভালো। রোগ বাড়াবাড়ি রকমের হলে তো কথাই নেই, উপশমের জন্যে তখন ডাক্তারবাবুর নির্দেশমতো চলা ছাড়া উপায় থাকে না।

খাদ্যরুচি ও খামখেয়াল—গর্ভাবস্থায় অনেক প্রসূতির মধ্যে খাদ্য-রুচির ব্যাপারে নানারকম খামখেয়াল দেখা যায়। কারো অসময়ের ফল, কারো বা নিত্য নতুন মিষ্টি, টক কিংবা আচারজাতীয় জিনিস খাবার ইচ্ছা দেখা দিয়ে থাকে। আবার কারো বা মাটির হাঁড়ি-সরা-খুরির ভাঙা টুকরো চিবনো কিংবা দেয়ালের চুন পরখ করার মতো অদ্ভুত খামখেয়ালও দেখা যায়। অর্থাৎ, ইতিপূর্বে যে-সব খাদ্য বা অখাদ্যের প্রতি মেয়েদের কোনোরকম স্পৃহা দেখা যেত না, গর্ভাবস্থায় সেইসব জিনিসের দিকে তাঁদের অতিরিক্ত ঝোঁক প্রকাশ পায়। তবে গর্ভাবস্থায় প্রসূতিদের খামখেয়ালি রুচি সম্পর্কে যে-সব আজগবি কাহিনী শোনা যায়, তার অধিকাংশই সম্ভবত গল্পকথা। আসলে বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা বোধহয় এই: গর্ভসঞ্চারের আগে মেয়েরা সাধারণত যে-ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত

থাকেন, গর্ভাবস্থায় সে-সম্পর্কে কিংবা তার কোনো কোনো পদ সম্পর্কে তাঁদের কম-বেশি বিতৃষ্ণা দেখা যায়। এরই সঙ্গে অন্য বা নতুন ধরনের কোনো কোনো খাদ্যে তাঁদের অতিরিক্ত স্পৃহাও দেখা দেয়। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার গোড়ার দিকে যখন প্রসূতির গা-বমি ও অরুচির ভাব প্রকাশ পায় তখন নোন্‌তা ও মশলাযুক্ত খাবার, টক ফল ও খাবার, আচার, মিষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর অতিরিক্ত আকর্ষণ লক্ষ্য করা আশ্চর্য নয়। রুচিব এই সাময়িক খামখেয়াল দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ার বা ভয় পাবাব কিছু নেই। মনে রাখবেন, প্রসূতি যদি স্বাস্থ্যবতী হন এবং বমি ও অরুচি অতিরিক্তমাত্রায় দেখা না দেয়, কিংবা রুচির এই খামখেয়াল সাংঘাতিক রকমে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, তাহলে এব ফলে প্রসূতি বা শিশুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্পই।

চর্ম

গর্ভদাগ—গর্ভাবস্থার শেযেব কয়েক মাসে প্রসূতির পেট অনেকখানি বড় হয়ে ওঠাব ফলে পেটেব ওপবকার চামড়া প্রসাবিত হয়ে ওঠে। ফলে অনেক সময় চামড়ায় ফাট ধবে এবং পেটের ওপবকার চামড়া জুড়ে গোলাপি কিংবা কালচে-লাল বঙেব সরু সরু লম্বা দাগ দেখা দেয়। পেটের চামড়া ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে স্তনদ্বয়, নিতম্ব ও উরুর চামড়ায়ও এ-ধবনের দাগ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রসূতির পেটের চামড়ায় এ-ধরনেব গর্ভদাগ দেখা দেবে কিনা কিংবা কী পরিমাণে দেখা দেবে তা আংশিকভাবে নিভর করে গর্ভাবস্থায় তাঁর পেটের আয়তন কতটা বাড়বে তাব ওপর। অর্থাৎ, শিশু আকারে কত বড় হবে, একাধিক যমজ সন্তান জন্মাবে কিনা, জরায়ুর মধ্যে কী পরিমাণে অ্যাম্‌নিয়টিক জল জমা হবে, পেটের চামড়ার নিচে মেদ বৃদ্ধি পাবে কিনা, ইত্যাদি ঘটনাব ওপর। তেমনি, প্রসূতির স্তনদ্বয় স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কতটা বেশি বড় ও ভারী হয়ে উঠবে এবং নিতম্ব ও উরুদেশে কী পরিমাণে অতিরিক্ত মেদ জমা হবে তার

ওপর, অন্তত আংশিকভাবে, নির্ভর করছে শরীরের ওই সব অংশে গর্ভদাগ দেখা দেবে কিনা কিংবা কী পরিমাণে দেখা দেবে।

তবে, বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ-ধরনের গর্ভদাগ দেখা দেওয়ার একটি বড় কারণ সম্ভবত শরীরের মধ্যেকার অ্যাড্রিনাল-গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ। অন্য সময়ের চেয়ে গর্ভাবস্থায় ওই অ্যাড্রিনাল-গ্রন্থিটি অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাই শরীরের নানাস্থানে এরকম গর্ভদাগ প্রকাশ পাওয়ার উপযুক্ত অবস্থা তৈবি হয়।

গর্ভদাগ দেখা দেওয়া বন্ধ করা কিংবা দাগ মিলিয়ে দেবার কোনো ওষুধ চিকিৎসকদের জানা নেই। সরিষাব তেল কিংবা কোল্ড ক্রীম-জাতীয় জিনিসেও এর নিষ্পত্তি হয় না। তবে প্রসূতিদের পক্ষে সুখের কথা, সন্তান-প্রসবের পব গর্ভদাগগুলি ক্রমশ আবো সরু ও লম্বায় ছোট হয়ে আসে এবং তাদের গোলাপি বা লালচে ভাবটা কেটে যায়। শেষপর্যন্ত কয়েকটি অস্পষ্ট সাদা দাগ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

চামড়া চড়চড় করা—প্রসূতিব পেটে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় গর্ভদাগ দেখা দেওয়াব প্রায় সময়-সময়ই ওই সমস্ত জায়গার চামড়ায় মৃদু একটা চড়চড়ে ব্যথা অনুভব করা অসম্ভব নয়। এও কিন্তু ওই একই কারণে— চামড়া প্রসারিত হয়ে টান্‌টান হয়ে ওঠার জন্যেই—ঘটে। চামড়া নরম রাখার জন্যে নিয়মিত সরিষাব তেল মালিশ কবলে, কিংবা বাজাবে যে সমস্ত ক্রীম চলে তার মধ্যে থেকে ভালো দেখে একটা বেছে ব্যবহার কবলে প্রসূতি কিছু পরিমাণে আরাম পেতে পারেন।

ব্রণ, ফুসকুড়ি—কোনো কোনো অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের মুখে ঘন ঘন ব্রণ ইত্যাদি উঠতে দেখা যায়। বিশেষ করে থুতনির চারপাশেই এ-সময়ে ব্রণ ওঠে। এ-উপসর্গ অবশ্য নিতান্ত সাময়িক ও এর বিশেষ কোনো চিকিৎসাও নেই। তবে ব্রণ খুব বেশি হতে থাকলে প্রসূতি

ডাক্তারবাবুকে জানাতে পারেন এবং ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো কোনো বিশেষ সাবান ব্যবহার করলে কিছুটা উপকারও পেতে পারেন।

চামড়ার নিচে লালচে ছোপ—গর্ভাবস্থার প্রথম চার-পাঁচ মাসের মধ্যে কোনো কোনো প্রস্থূতির শরীরেব নানা জায়গায় চামড়ার নিচে ছিট ছিট রক্ত জমে থাকতে দেখা যায়। হাতে, বুকে, পিঠে, এমন কি মুখের ওপর পর্যন্ত এরকম লালচে ছোপ দেখা যেতে পাবে। শবীরের রক্তবহা শিবাব যে-সব সূক্ষ্ম প্রশাখা চামড়ার ঠিক নিচ দিয়ে গেছে, তাদেবই এক-একটি গুচ্ছ একেক জায়গায় বক্ত জমে ফুলে থাকে বলে বাইবে থেকে এ-বকম দেখায়। এমনিতে এতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হয় না, তবে এগুলি অনেক সময়ই শবীবে স্থায়ী হয়ে যায় বলে যা একটু অসুবিধা। এগুলি স্থায়ী হবাব সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রস্থূতি যেন বিশেষজ্ঞ চর্ম-চিকিৎসকেব পবামর্শ নেন।

মেচেতা—গর্ভাবস্থায় প্রস্থূতির মুখ ও গায়েব চামডায় বাদামি ছোপ ধরাব সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অনেক সময চোয়ালের হাড় থেকে শুরু করে নাকেব ওপব পর্যন্ত ও এমন কি কপালেও গাঢ় বাদামিবঙের মেচেতা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। একবাব দেখা দিলে এবকম ছোপ সাবা গর্ভকাল জুড়েই থাকে। তবে সন্তান-প্রসবেব পব ফের আস্তে আস্তে মেচেতা মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। এছাড়া, গর্ভাবস্থায় শবীরের যে-কোনো জায়গায় অস্ত্রোপচাব হলে, এমন কি সামান্য একটু-আধটু কেটে-ছড়ে গেলে কিংবা মশাব কামড়েব জায়গা চুলকে ফেললে তো কথাই নেই, ক্ষতচিহ্নটি কালচে-বাদামি রঙ্‌সহ সারা জীবনই স্থায়ী হয়ে যেতে পাবে।

অস্ত্রোপচার বা কাটাকুটি ছাড়াও কড়া বৌদ্রে ঘোবাঘুরি করলে প্রস্থূতির চামড়ায় মেচেতা বা বাদামি ছোপ ধরতে পারে। মুখের চামড়ায় আপনাআপনি মেচেতা ধরাব এছাড়াও অন্যবিধ কারণ

থাকা সম্ভব। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন যে অপেক্ষাকৃত কম অবস্থাপন্ন প্রসূতিদের মধ্যে এই উপসর্গের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় বলে শারীরিক পুষ্টির অভাবও এর কারণ কিনা সে-বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগে।

তিল—মেচেতা ছাড়া এ-সময়ে শরীবে, বিশেষ করে গলায় ও বুকে, ছোট ছোট বাদামি তিল জন্মানোর প্রবণতাও দেখা যায়। অন্যান্য তিলের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনেব তিলেব তফাত এই যে, পূর্বোক্ত তিল চ্যাপ্টা ধরনের হয় আর এই শেষোক্ত তিল খুব সূক্ষ্ম একরকম ডাঁটার আগায় জন্মায় বলে এদের একটু উঁচু ঠেকে। এই তিল সাধারণত কিছুদিন টিকে থাকে, তবে অনেক সময় স্নানের পর গামছা বা তোয়ালে দিয়ে গা ঘষলেই উঠে যায়। প্রসূতির সাধারণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে অবশ্য এই উপসর্গেব কোনো সম্বন্ধ নেই।

ঘামাচি— গর্ভাবস্থায় শবীবে সাধাবণত একটু বেশি ঘাম হয়। তাছাড়া এ-সময়ে প্রসূতি আগেব চেয়ে একটু মোটাও হন, অর্থাৎ তাঁব শরীরে মেদ বৃদ্ধি পায়। এই দুই কারণে, বিশেষত গ্রীষ্মকালে, প্রসূতির ঘাড়ে, গলায়, কুঁচকিতে, স্তনেব নিচে ও পেটের ওপরকার চর্বির খাঁজে প্রচুব ঘামাচি জন্মায় ও চামড়া হেজে গিয়ে জ্বালা করে। এর উপশমের একমাত্র উপায়, নিয়মিত স্নান ও শবীবেব সর্বত্র মেদের খাঁজগুলিব মধ্যে ঘন ঘন পাউডাবেব প্রলেপ। এ-ছাড়া এর সম্ভাবনা বন্ধ কবাব একটি চিকিৎসা অবশ্য আছে, তবে সেটি নেহাতই মূলগত। সেটি হচ্ছে, গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মোটা না-হওয়া।

নিদ্রা

ক্লান্তি ও ঘুমঘুম ভাব—গর্ভাবস্থায়, বিশেষ করে গোড়ার দিকে, ক্লান্তি ও ঘুমঘুম ভাব বা ঢুলুনি একটি অতি পরিচিত ও স্বাভাবিক উপসর্গ। সত্যি বলতে কি, অত্যন্ত সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়া বা ঢুলুনি আসার

লক্ষণ দেখেই গর্ভকালের একেবারে গোড়ার অবস্থায় (যখন এমন কি প্রসূতি নিজেই তাঁর গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, তখনই) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারের অভিজ্ঞ মহিলারা প্রসূতির গর্ভসঞ্চার ঘটেছে বলে প্রথম সন্দেহ করেন এবং তাঁদের সন্দেহ বহু ক্ষেত্রেই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। এ-সমস্ত উপসর্গ দেখে প্রসূতির ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এর সঙ্গে রক্তাল্পতা, ভিটামিনের অভাব বা অস্বাভাবিক কম রক্তচাপেব কোনো সম্পর্কও নেই। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির যে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি বিশ্রাম প্রয়োজন, সম্ভবত এ তারই প্রাকৃতিক সংকেত। গর্ভকালেব এ অতি পরিচিত ও স্বাভাবিক একটি উপসর্গ।

মনে রাখবেন এ-উপসর্গ ভিটামিন-এ কমবে না এবং কৃত্রিম উত্তেজক ওষুধের সাহায্যে একে দমিয়ে বাখাব চেষ্টা শেষপর্যন্ত ক্ষতিকর হতে পাবে। এ-উপসর্গ উপশমেব একমাত্র চিকিৎসা হল প্রাকৃতিক সংকেত মানা, অর্থাৎ প্রয়োজন হলেই বিশ্রাম নেওয়া ও প্রতিদিন রাত-না-কবে বিছানা নেওয়া। প্রসূতি, সম্ভবস্থলে, রোজ তুপুবে অন্তত তু-ঘণ্টা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেবেন এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি দিন অন্তত আট ঘণ্টা ঘুমোবেন।

অনিদ্রা রোগ– গর্ভাবস্থাব গোড়াব দিকে যেমন প্রসূতির ঘুমেব মাত্রা বেড়ে যাওয়াব সম্ভাবনা, তেমনি একেবাবে শেষ কয়েক সপ্তাহে প্রায়ই ঘুমেব ব্যাঘাত ঘটায় কিংবা নিদ্রাহীনতা দেখা দেওয়ার ভয়। এর কয়েকটি কারণ আছে—প্রথমত, প্রসূতিব পেটের অত বড় বোঝার ভাব ও তজ্জনিত নানা বকম অস্বস্তিব ফলে সুবিধাজনকভাবে শোওয়া ও একভাবে অনেকক্ষণ শোওয়া কষ্টকব হয়ে দাঁড়ায় ; দ্বিতীয়ত, মূত্রথলির ওপব অতিরিক্ত চাপ পড়ায় রাত্রে বারবার মূত্রত্যাগের জন্য বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় ; এবং পরিশেষে আসন্ন সন্তান-প্রসব সম্পর্কে স্বাভাবিক তুশ্চিন্তা ইত্যাদির ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে কিংবা নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে

এই তিনটি কারণ যে একসঙ্গে দেখা দেবে এমন কোনো কথা নেই।

অনিদ্রার মাত্রা বেশি হলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রসূতি কম মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেতে পারেন। এতে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বরং কোনো কারণেই ঘুমের ওষুধ খাওয়া চলবে না এ-রকম জিদ ধরার ফলই ক্ষতিকর হতে পারে। কেননা, এর ফলে প্রসূতির সাময়িক নিদ্রাহীনতার উপসর্গ হয়তো পরে স্থায়ী অনিদ্রা রোগে পরিণত হবে।

নানাবিধ ব্যথা-বেদনা

মাথাধরা, যন্ত্রণা—গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস সাধারণত সেইসব প্রসূতিরই মাথাধরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়, যাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় মাসিক ঋতুস্রাবের আগে নিয়মিত এই উপসর্গে ভুগে থাকেন। কেননা, গর্ভাবস্থার গোড়ার দিকে প্রসূতির শরীরের অবস্থার সঙ্গে তাঁর মাসিক ঋতুস্রাবের ঠিক আগেকার অবস্থার প্রচুর সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এছাড়া অন্যান্য ধবনের মাথাধরাও গর্ভাবস্থায় দেখা দিতে পারে। অনেকের ধারণা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাটা বুঝি এ-সব ধরনের মাথাধরার প্রতিষেধক। তা কিন্তু মোটেই নয়। তবে সাধারণত মাইগ্রেন (migraine)-এর মতো এলার্জিজাতীয় উপসর্গ এ-সময়ে অপেক্ষাকৃত কম উৎপাত করে থাকে।

গর্ভাবস্থায় মাঝে-মাঝে এক-আধটুকু মাথাধরা ইত্যাদি দেখা দিলে অবশ্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরকম ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রসূতি জোলাপ নিতে পারেন কিংবা অ্যাস্‌পিরিন বা ওই জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন। তবে মাইগ্রেনের মতো গুরুতর মাথাধরার ব্যাপার ঘটলে ডাক্তারবাবুর মত না নিয়ে কখনই ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। মাইগ্রেন-উপশমের ওষুধে আরগট্‌-এর মতো প্রসূতির পক্ষে ক্ষতিকর পদার্থ আছে কিনা তা দেখে তবেই

ডাক্তারবাবু ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দেবেন।

কিন্তু গর্ভাবস্থায় মাথাধরা দীর্ঘসময় স্থায়ী হলে কিংবা সর্বক্ষণ লেগে থাকলে মোটেই তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। বিশেষত শেষের কয়েক মাসে এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী মাথাধরার সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও দেখা গেলে প্রসূতি অবিলম্বে ডাক্তারবাবুব স্মরণ নেবেন। মনে রাখবেন, শরীরে কোনো কারণে বিষক্রিয়া ঘটলে ও তার সঙ্গে রক্ত-চাপ বৃদ্ধি পেলে অনেক সময় এই উপরোক্ত ধরনেব উপসর্গ দেখা দেয়।

ফিক-ব্যথা, চাপবোধ—গর্ভাবস্থাব একেবাবে শেষের কয়েক সপ্তাহে প্রসূতির পেটে নানা ধরনের অস্বস্তি বা বেদনা বোধ হওয়া খুবই সম্ভব। এই সময়ে গর্ভস্থ শিশু অত্যন্ত দ্রুত বড় ও ভাবী হয়ে ওঠে এবং প্রসূতির পেটের মধ্যে পরিপাক ও অন্যান্য অঙ্গগুলি অত্যন্ত ঠাসাঠাসি হয়ে থাকে। এব ওপব, শিশুর মাথাব ধাক্কায় কখনো মূত্র-থলিতে, কখনো নিতম্বে, আবাব কখনো বা কুঁচকিব কাছে হঠাৎ-হঠাৎ তীব্র ব্যথা ধবে। এই সময়ে অনেক প্রসূতির এক বিশেষ ধরনের ব্যথা বোধ হয়ে থাকে। তা হল, তাঁব ডান কিংবা বাঁ-দিকের সবচেয়ে নিচের পাঁজবেব ধার ববাবব বেদনা অনুভব কবা।

এই ধরনের ফিক-ব্যথা ইত্যাদি আসল প্রসববেদনা নয় এবং এর সঙ্গে অন্য কোনো অসুখবিসুখের কোনো সম্বন্ধ নেই জানবেন। এ নিছক প্রসূতিব পেটের মধ্যেকাব ভাব বৃদ্ধি, শিশুব অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদিব ফলেই ঘটে। অনেক সময় শুধু তেল-জল মালিশ কিংবা বড়জোর অ্যাস্পিরিনের মতো ওষুধে সাময়িকভাবে এ-সব উপসর্গের উপশম হয়ে থাকে। তবে উপসর্গ তীব্র হয়ে উঠলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া মন্দ নয়।

যোনিদেশে বেদনা—এ-সময়ে যোনিদেশে কখনো কখনো আচমকা খোঁচা লাগার মতো তীব্র বেদনা অনুভব করা যায়। সাধারণত এর

সঙ্গে জরায়ুর সংকোচন ও প্রসববেদনার কোনো সম্পর্ক থাকে না। এ হল এক ধরনের চারিয়ে-যাওয়া ব্যথা। প্রসূতির কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা পেটে বায়ু হলে সাধারণত তার ফলে তাঁর মলদ্বার ও যোনিদেশের চারিপাশের মাংসপেশীতে আক্ষেপ শুরু হয়। এ-ধরনের বেদনা তারই ফল।

যোনিদেশে ও পায়ুদেশ বরাবব খোচা খাওয়ার মতো এ-ধরনের তীব্র বেদনা অনেক সময় প্রসববেদনাব চেয়েও বেশি কষ্টকর হতে পারে। তবে এ দেখে অস্বাভাবিক কোনো গণ্ডগোল ঘটেছে মনে করে প্রসূতির ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

পায়ে খিল-ধরা—গর্ভাবস্থার শেষের কয়েক মাসে প্রসূতিব পায়ের মাংসপেশীতে টান বা খিল-ধবা একটি অতি সাধাবণ উপসর্গ। প্রায়ই ভোররাত্রে আচমকা ঘুম ভাঙলে প্রসূতি দেখতে পান পায়ের গুলিতে কিংবা পাতায় মাংসপেশী গুটিয়ে বলেব মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘুমের ঘোরে কিংবা অন্যমনস্কভাবে পা টান করার জন্যে এমন ঘটে। এব ফলে রীতিমতো যন্ত্রণা হয়। এবকম ঘটলে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে মাটিতে পায়েব পাতা চেপে খাড়া হয়ে দাঁড়ালে সাধারণত খিল-ধরা ছেড়ে যায়।

কোনো কোনো চিকিৎসক বলেন, প্রসূতিব শরীরে ক্যাল্‌সিয়মের অভাবেব দরুন এমনটি হয়। কিন্তু অন্য অনেকে এটা স্বীকাব করেন না। তাঁরা বলেন, নবজাত শিশু কিংবা কোনো কোনো বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে অনেক সময় প্যারাথাইরয়েড-গ্রন্থি কাজ না কবলে ও সেইসব ব্যক্তির রক্তে ক্যাল্‌সিয়মের মাত্রা কম থাকলে ধনুষ্টঙ্কার-জাতীয় যে-ধরনের খিল-ধরা বা আক্ষেপ প্রকাশ পায় তার সঙ্গে প্রসূতির পায়ে খিল-ধরার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রথমত, ধনুষ্টঙ্কার-জাতীয় আক্ষেপ রোগীর হাত ও পা দুই প্রত্যঙ্গেই দেখা দিয়ে থাকে, এবং, দ্বিতীয়ত, এ-আক্ষেপ সাধারণত মাংসপেশীর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ঘটে। অথচ, প্রসূতির খিল-ধরার উপসর্গ শুধুমাত্র পায়ে

দেখা দেয় এবং এই খিল-ধরা দেখা যায় সাধারণত শেষ রাত্রের দিকে, অর্থাৎ প্রসূতির পায়ের কাজ বা চলাফেরা দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকার ফলেই। এই শেষোক্ত ডাক্তারদের মতে, প্রসূতির পায়ে খিল-ধরার কারণ মূলত গর্ভাবস্থায় দুই পায়ে ভালোভাবে রক্ত-সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটা। কেননা, পায়ের যে দূষিত রক্ত শিরা বেয়ে ওপরে উঠে আসে গর্ভাবস্থায় পা থেকে তা সব সময় ভালোমতো নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না। তাছাড়া, বিশেষ করে রাত্রে প্রসূতির পায়ে মাংসপেশীর কাজ, অর্থাৎ দাঁড়ানো, হাঁটা-চলা ইত্যাদি, দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকার দরুন পায়েব রক্ত-চলাচলে আরো বেশি ভাটা পড়ে। যে-সব প্রসূতি চিত হয়ে ঘুমোন তাঁদের রক্ত-চলাচলে বাধা পড়ে আরো বেশি। এবং এইভাবে দীর্ঘ সময় নিশ্চল হয়ে থাকার পর আচমকা পা টান করলেই তৎক্ষণাৎ পায়ে খিল ধরে। অবশ্য শরীরে বেশি মাত্রায় ক্যাল্‌সিয়ম সরবরাহ করলে এ-উপসর্গ বন্ধ থাকে কিনা সে-বিষয়ে চিকিৎসকরা ততটা নিশ্চিত নন।

মোট কথা, শবীরে ক্যাল্‌সিয়মের গুরুতর অভাব না ঘটে থাকলে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। প্রসূতি তাঁর শোওয়ার অভ্যাস (যথা—চিত হয়ে শোয়া, যখন-তখন পা টান কবে দেওয়া) এক-আধটুকু পরিবর্তন কবে নিতে পাবলে এ-উপসর্গের হাত থেকে খানিকটা নিস্তার পেলেও পেতে পারেন।

পিঠের ব্যথা—গর্ভাবস্থায় প্রসূতির পিঠে নানা কারণে নানা ধরনের বেদনা হতে দেখা যায়। যে-ধবনেব পিঠেব বেদনা সচরাচর দেখা যায় তা হল সায়াটিক নার্ভজনিত ব্যথা। একটা ভোঁতা যন্ত্রণার স্রোত পিঠের শিরদাঁড়ার কাছ থেকে যে-কোনো এক দিকের নিতম্ব বেয়ে প্রসূতির উরু পর্যন্ত নেমে আসে। সাধারণত গর্ভাবস্থার চতুর্থ মাস নাগাদ এই উপসর্গটি দেখা দিয়ে থাকে ও মাত্র কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এ-উপসর্গ অস্বস্তিকর হলেও গুরুতর কিছু নয়। গর্ভকাল ক্রমশ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুকে পেটের মধ্যে বেশি স্থান

ছেড়ে দেবার জন্যে ও ভবিষ্যৎ সুপ্রসবের প্রয়োজনে প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের হাড়ের খাঁচাটি বড় হওয়ার দরকার করে এবং এই উদ্দেশ্যে ওই হাড়ের জোড়গুলি খানিকটা ঢিলে হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সম্ভবত হাড়ের জোড় এইভাবে ঢিলে হতে গিয়ে কোনো কারণে সায়াটিক নামের নার্ভটির গায়ে খোঁচা লাগে আর তাতেই এই যন্ত্রণার সূত্রপাত হয়। এ-উপসর্গের একমাত্র চিকিৎসা অল্প গরম সেঁক নেওয়া ও দরকার হলে মাঝে-মাঝে এক-আধটা অ্যাস্পিরিনের বড়ি খাওয়া।

সায়াটিক নার্ভের ব্যথা ছাড়া প্রসূতির পিঠে অন্যান্য কারণেও বেদনা হতে পারে। একটা কারণ হল, গর্ভস্থ শিশু ক্রমশ বড় ও ভারী হয়ে ওঠার ফলে প্রসূতির পেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় তাঁর পিঠ সারাক্ষণই আগের চেয়ে বেশি বেঁকে থাকে এবং এর ফলে যন্ত্রণা হয়। এছাড়া, প্রসূতি যদি এমনিতেই একটু কোলকুঁজো হন কিংবা তাঁর কুঁজো হয়ে বসার অভ্যাস থাকে, অথবা অতিরিক্ত উঁচু ক্ষুরওয়ালা জুতো পায়ে দেওয়ার বাতিক থাকে তাহলেও অনেক সময় পিঠে ব্যথা ধরতে পারে। এ-ধরনেব ত্রুটি সংশোধন কবতে পারলে এ-সব উপসর্গও লোপ পাবে (তবে উঁচু ক্ষুবওয়ালা জুতোর ত্রুটি আচমকা সংশোধন না কবে শরীবকে সইয়ে ক্রমশ করাই ভালো, তা না হলে হিতে বিপরীতও হতে পাবে)।

যোনিদেশে স্রাব ও চুলকানি

গর্ভাবস্থায় স্বভাবতই যোনি থেকে স্রাবেব পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অনেক সময় যোনিদেশ ভিজে-ভিজে ঠেকার ফলে প্রসূতির অস্বস্তিও হতে পারে। অনেক প্রসূতি আবার যোনিদেশ থেকে তীব্র গন্ধ (অনেক সময়ই প্রস্রাবের) নির্গত হয় বলে ডাক্তাববাবুকে জানিয়ে থাকেন। তবে এ-সমস্ত ব্যাপারে প্রসূতির বিচলিত হবার কারণ নেই। এর কোনো প্রতিকারও নেই।

তবে প্রসূতির যোনিদেশ থেকে স্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং

গর্ভাবস্থার গোড়ার দিকে গা-বমির ভাবের সঙ্গে প্রসূতির ঘ্রাণশক্তি অতিমাত্রায় প্রখর হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও, মনে রাখতে হবে, এ-সময়ে কোনো কোনো ধরনের রোগ-বীজাণু দ্বারা প্রসূতির যোনিদেশ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে।

যোনিদেশ রোগ-বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে শুধু যে স্রাবের পরিমাণ বাড়ে তাই নয়, যোনিমুখের চারিপাশে চুলকানিও দেখা দেয়। এই শেষোক্ত উপসর্গ দেখা দিলে নিজে চিকিৎসার চেষ্টা বা ডুশ নেওয়া ইত্যাদি না করে প্রসূতি যেন অবিলম্বে ডাক্তারবাবুকে জানান ও তাঁর চিকিৎসাধীনে থাকেন।

যোনিদেশের এইসব অসুখের মধ্যে একটি হল, যোনিমুখ থেকে হলদে রঙের স্রাব নির্গত হওয়া ও যোনিমুখ চুলকানো। গর্ভাবস্থায় যোনিদেশের অভ্যন্তরে যে-ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার ফলে এক বিশেষ ছত্রাক বা ঈস্ট্-জাতীয় পদার্থ ও এক বিশেষ বীজাণু তার মধ্যে বেড়ে ওঠার সুবিধা হয়। এই বীজাণুর সংক্রমণের ফলেই উপরোক্ত উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণত বেশ কিছু প্রসূতির মধ্যে এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে। এর ফলাফল অবশ্য এমনিতে কিছু গুরুতর হয় না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রসূতির এই রোগ সম্ভবত কখনো কখনো নবজাত শিশুর মুখে ঘা হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে শিশুর মুখের ঘা সাধারণত মৃদু ধরনের হয়ে থাকে এবং চিকিৎসার ফলে সহজে সেরেও যায়।

প্রসূতির যোনিদেশের এই বিশেষ অসুখটিও চিকিৎসার ফলে সাধারণত সহজে সেরে যায়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটিকে নাছোড়বান্দা হতে ও একাধিকবার ফিরে ফিরে আসতেও দেখা যায়।

যোনিদেশ বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে সাধারণত হল্‌দেটে ধরনের স্রাবই নির্গত হয়ে থাকে। বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত কিংবা ক্ষত স্থান থেকে যে পুঁজ বেরোয় তার রঙও হয় হল্‌দেটে কিংবা হল্‌দে-সবুজ। কিন্তু এ ছাড়াও যোনিমুখ থেকে কখনো-কখনো অত্যধিক পরিমাণে

সাদা স্রাব নির্গত হতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত ধরনের স্রাব সাধারণত রোগবীজাণুর সংক্রমণের ফলে ঘটে না; এটা ঘটে প্রসূতির অত্যধিক পরিমাণে স্নায়বিক উত্তেজনা ও যোনি থেকে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা ক্ষরণের জন্যে। শ্লেষ্মা এমনিতে জলের মতো পরিষ্কার দেখতে হলেও, যোনিদেশ থেকে বেরোবার সময় যোনির দেয়ালের পাতলা চামড়ার আবরণ থেকে সাদারঙের কিছু কিছু দেহকোষ খসে শ্লেষ্মার সঙ্গে মিশে যায় বলে তার রঙ দুধের মতো সাদা দেখায়। দেহকোষ খসে পড়ার কথা শুনে অবশ্য প্রসূতির ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটা অতি স্বাভাবিক একটা ঘটনা।

অন্যান্য উপসর্গ

ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা—গর্ভাবস্থার একেবারে গোড়ার দিকে, প্রথমবার মাসিক ঋতুস্রাব বাদ পড়ার পরই, প্রসূতিরা সাধারণত লক্ষ্য করে থাকেন যে তাঁদের আগের চেয়ে ঘন ঘন প্রস্রাব করতে হচ্ছে। এ-সময়ে সম্ভবত শরীরের অভ্যন্তরে রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যেই এটা ঘটে থাকে।

এর পর মাঝের তিনটি মাস মূত্রত্যাগের এই প্রবণতা যেন কিছুটা কমতে দেখা যায়। কিন্তু তারপর, গর্ভাবস্থার শেষের তিন মাসে, গর্ভস্থ শিশু ভাবী মায়ের মূত্রথলির ওপর আগের চেয়ে জোরে চাপ দিতে থাকে বলে প্রসূতির এই প্রবণতা ফের বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রায় সব প্রসূতিকেই এই শেষের দিকে রাত্রে বিছানা ছেড়ে দু-একবার উঠতেই হয়। প্রসূতির দ্বিতীয়, তৃতীয় গর্ভের ক্ষেত্রে এই সময়টায় মূত্রথলি ভর্তি থাকলে সামান্য একটু হাঁচি, কাশি বা হাসির ফলে দু-চার ফোঁটা প্রস্রাব বেরিয়ে পড়তেও দেখা যায়।

শিরা-স্ফীতি—শিরাস্ফীতি সাধারণত দু-ধরনের হয়। গর্ভাবস্থায় প্রসূতি মেয়েদের কোনো কোনো অঙ্গের, বিশেষ করে পায়ের, কিছু

কছু শিরা এমনিতেই আগের চেয়ে বেশি স্ফীত হয়ে উঠতে দেখা যায়। এ-সময়ে ওই সব শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বিশেষ করে পায়ের রক্ত-সঞ্চালনে খানিকটা ভাঁটা পড়ায় এরকম হয়। এ-ধরনের শিরাস্ফীতিতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ; গর্ভকাল শেষ হবার পর আপনিই এর প্রকোপ কমে যায়। কিন্তু এছাড়া আরো এক ধরনের শিরাস্ফীতি আছে। একে বলে স্থায়ী বা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া শিরাস্ফীতি। চিকিৎসাবিৎরা এর কোনো প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজে পাননি ; তাঁরা বলেন এ রোগ উত্তরাধিকার-সূত্রে বংশ-পরম্পরায় অর্শায়। এ-ধরনের স্থায়ী শিরা-স্ফীতিতে রোগগ্রস্ত শিরাগুলি চামড়ার ওপর উচু হয়ে ওঠে ও তাদের ওপরকার চামড়ার রঙ পর্যন্ত পালটে যায়। তাছাড়া আরো নানা উপসর্গ, যথা, শিরাগুলিতে বেদনাবোধ, তাদের চারপাশ চুলকানো কিংবা যে-পায়ে এ-ধরনের শিরা থাকে (এ-ধরনের শিরা সাধারণত পায়েই দেখা যায়) সেই পা-টি অবশ ও ভারী বোধ করা ইত্যাদি এই স্থায়ী শিরাস্ফীতির সঙ্গে দেখা যায়।

স্থায়ী শিরাস্ফীতি-রোগ যাতে না দেখা দেয় তার কোনো উপায় কিন্তু চিকিৎসকদেব জানা নেই। কোনো প্রস্থূতির শরীরে গর্ভাবস্থায় প্রথম এ-রোগ দেখা দিলেও বুঝতে হবে যে আসলে এটি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই পাওয়া : গর্ভাবস্থার বিশেষ সুযোগ নিয়ে এটি প্রথম দেখা দিয়েছে, এইমাত্র। তবে রোগের আক্রমণ নিবারণ করতে না পারলেও এ-রোগের নানাবিধ চিকিৎসা ডাক্তারিশাস্ত্রে আছে।

ইঞ্জেকশন কিংবা অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্যে স্থায়ী শিরাস্ফীতি নিরাময় করা সম্ভব। এমন কি গর্ভাবস্থায়ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলে, প্রস্থূতির ওপর ডাক্তাররা এরকম চিকিৎসার প্রয়োগ করেন। তবে, এ-রোগের আনুষঙ্গিক উপসর্গ ও অস্বস্তি খুব প্রবল না হলে, শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকেরা গর্ভাবস্থা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন ও আপনা থেকেই রোগের

প্রকোপ কতটা কমে তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। স্থায়ী শিরাস্ফীতি পাকাপাকিভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তা অবশ্য আপনা থেকে পুরোপুরি সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, তবে গর্ভাবস্থা পার হবার পর তার প্রকোপ ও আনুষঙ্গিক অস্বস্তি সাধারণত অনেকখানি কমে যায়। গর্ভাবস্থায় এরকম স্থায়ী শিরাস্ফীতিতে ভুগলে প্রসূতি (ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে) পায়ে ইলাস্টিক-লাগানো মোজা বা ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করতে পারেন। এতে তিনি সাময়িক আরাম পাবেন। তবে এর ফলে রোগ দেখা দেবে না কিংবা সেরে যাবে এমন মনে করার কোনো কাবণ নেই।

অর্শ—মলদ্বাব বা পায়ুদেশের চারপাশের শিরাগুলি অতিরিক্ত স্ফীত হয়ে উঠলে তাকেই অর্শ বলা হয়। বিশেষ কবে গর্ভাবস্থায় এই শিবাস্ফীতির সম্ভাবনা আবো বেড়ে যায়। এ-রোগও বংশ-পরম্পরায় উত্তরাধিকার-সূত্রে হতে পাবে, তবে গর্ভাবস্থায় এব প্রবণতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস ও পায়খানা পরিষ্কার হলেই যে এ-রোগ পুরোপুরি নিবারণ করা সম্ভব তা নয়, তবে কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা উদবাময়েব ফলে যে এর সূচনা দেখা দিতে পারে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সাধারণত অর্শ দেখা দিলে মলদ্বারে বহুক্ষণস্থায়ী ভোঁতা বেদনা কিংবা একটা চাপ বোধ করা যায়। এ-অবস্থায় জোর করে পায়খানার চেষ্টা করলে স্ফীত শিরাগুলি মলদ্বার থেকে নিচে ঝুলে পড়ে এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত স্ফীত হয়ে থাকে ও যন্ত্রণা বোধ হয়।

যে-প্রসূতির অর্শ আছে তাঁর (কিংবা অন্য যে-কোনো প্রসূতিরই) মলদ্বারে হঠাৎ তীব্র ও স্থায়ী একটা বেদনা দেখা দিলে সাধারণত বুঝতে হবে যে স্ফীত শিবাগুলির একটিতে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। সেক্ষেত্রে মালিশ কিংবা সাপোজিটরি-জাতীয় জোলাপে কাজ হবে না। এর সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হল মলদ্বারে গরম জলের সেঁক নেওয়া কিংবা ওই অঙ্গটি ভালো করে গরম জলে ধুয়ে ফেলা। রোগ

একটু বেশি রকমের হলে প্রসূতির পক্ষে অন্তত দিন তিন-চার যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়া বিধেয়।

মলদ্বার থেকে সামান্য রক্তপাত হলে তাকেই সাধারণত অর্শের সূচনা বলে মনে করা হয়। আসলে কিন্তু অর্শের ফলে রক্তপাত খুব কম ক্ষেত্রেই হয়। সাধাবণত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মলদ্বারের চারপাশের মাংসপেশীতে আক্ষেপেব ফলে ওই অঙ্গেব চামড়া চিবে গিয়ে রক্তপাত ঘটে থাকে, এ-ব্যাপাবেব সঙ্গে অর্শ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পাবে। প্রসূতিব এ-ধবনেব রক্তপাত ঘটলে অবিলম্বে তাঁর খাদ্যতালিকাব উপাদান সম্পর্কে ও তাঁব কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে সে-ব্যাপাবে বিশেষ নজব দেওয়া দবকাব। এছাড়া মলদ্বাবে মলম-লাগানোর ব্যবস্থা কবলে এবং এক টুকবো নবম ফ্লানেল ক্যাস্টব অয়েলে ভিজিয়ে লাগিয়ে বাখলেও প্রসূতি আবাম পাবেন।

হাঁপ ধরা।—গর্ভাবস্থাব গোড়াব দিকে প্রায়ই এ-উপসর্গটি দেখা যায়। সম্ভবত, গর্ভাবস্থা উপস্থিত হলে প্রসূতিব শবীবে প্রবাহিত বক্তেব পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াব ফলেই এমনটি ঘটে। এ-অবস্থায় প্রসূতিব মনে হয় যেন তিনি এইমাত্র খুব খেয়েদেয়ে উঠলেন। এছাডা সামান্য একটু পবিশ্রমেব ফলেই তিনি হাঁপিযে ওঠেন, জোরে জোবে নিশ্বাস নেন। এবপব, এই পবিবর্তিত অবস্থাকে শবীব ক্রমশ খাপ খাইয়ে নেয বলে গর্ভাবস্থার মাঝেব তিন মাস এই উপসর্গটি তেমন প্রবল থাকে না। কিন্তু আবাব গর্ভাবস্থাব শেষ দিকে এটি মাথা চাডা দেয়। ওই সময়ে প্রসূতিকে বেশ বড় একটি বোঝা বইতে হয়, তাছাড়া গর্ভস্থ শিশুও প্রায় প্রমাণসাইজ হয়ে ওঠে বলে প্রসূতিব পেট আব বুকেব মধ্যেকাব দেয়াল (বা diaphragm)-এ বেশ চাপ পড়ে। একে পেটেব বোঝাব ভাব, তাব ওপব তলা থেকে বুকে এই চাপ—ফলে শুয়ে-বসে সব সময়েই প্রসূতির অস্বস্তি বোধ করা ও হাঁপ লাগা খুবই স্বাভাবিক।

গোড়ালিতে শোথ—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শরীরে জলীয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাই অনেক প্রসূতির পায়ের গোড়ালি কমবেশি ফুলে উঠতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, শরীরের জল ওই জায়গায় জমে যায় বলেই এ-অবস্থা হয়। বিশেষ করে দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলা এবং প্রধানত গ্রীষ্মকালেই এরকম হতে দেখা যায়।

সাধারণত গর্ভাবস্থায় এ-ধরনের উপসর্গ অতিরিক্ত অস্বাভাবিক বা গুরুতর কোনো ব্যাপার নয়। এটি শরীবে কোনো বিষক্রিয়াব ফলও নয়। প্রসূতির খাদ্যতালিকায় নুনের পরিমাণ কমিয়ে এ-উপসর্গটিও কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

তবে, মনে রাখা দরকাব, শবীরে রক্তদূষিত রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গেও কখনো কখনো এই উপসর্গটি দেখা দিয়ে থাকে। জ্বরভাব কিংবা হাত-মুখ ফোলা, চোখেব দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা কিংবা প্রস্রাব কমে যাওয়া ইত্যাদি ধবনেব এক বা একাধিক উপসর্গের সঙ্গে যদি পায়ের গোড়ালি ফুলতে দেখেন তবে এটি নিশ্চিত রক্তদূষিত রোগের লক্ষণ বলে জানবেন। আর এ-লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তাববাবুকে খবব দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবেন না।

মাথা ঘোরা—ভ্রূণকে খাদ্য ও অক্সিজেন সবববাহ কবতে হয় বলে গর্ভাবস্থায় প্রসূতিব বক্তবহা ধমনী ও শিবাব জাল বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে, অথচ তাঁর শবীর এই পবিবর্তনের সঙ্গে সমানভাবে তাল বেখে চলতে পারে না। এই অসামঞ্জস্যেব ফলে কখনো কখনো প্রসূতিব মস্তিষ্কে রক্তেব সববরাহ বেশ কমে যায়। অনেক সময় দু-এক মুহূর্তেব জন্যে এই সরববাহ এতদূব কমে যায় যে হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করা বা মাথা ঘুরে ওঠা থেকে শুরু কবে প্রসূতিব পক্ষে একেবাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলাও কিছু আশ্চর্য নয়।

তবে গর্ভাবস্থা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মাথায় রক্ত-চলাচলে সাময়িক-ভাবে ব্যাঘাত ঘটাব দরুন এ-ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে তা নেহাতই স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। শরীর খুব দ্রুত এ-ত্রুটি সংশোধন করে নেয়।

কিন্তু, এ-সময়ে বিশেষ করে গর্ভস্থ ভ্রূণ ও বর্ধিষ্ণু জরায়ুর প্রয়োজনে রক্তের যোগান দিতে হয় বলে শরীর অত সহজে ত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারে না। ফলে মাথা ঘোরা বা জ্ঞান হারানোর মতো উপসর্গ গর্ভাবস্থায় বেশ কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝেই দেখা দিয়ে থাকে।

এ-উপসর্গের কারণ যেহেতু মস্তিষ্কে রক্তেব অভাব, সেই হেতু মাথায় রক্তের যোগান দেওয়াই এব চিকিৎসা। অতএব, মাথা ঘুরে উঠলে কিংবা আপনি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন বোধ হলে অবিলম্বে মাথাটি শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে একটু নিচে রেখে সটান শুয়ে পড়ুন। এর ফলে দ্রুত আপনার শরীব সুস্থ হয়ে ওঠাব কথা।

এ-পর্যন্ত যা বলা হল তা নিতান্ত স্বল্পস্থায়ী ও সাময়িক মাথা ঘোরা বা জ্ঞান হাবানোব কথা। অল্পস্বল্প ওষুধবিষুধ এবং অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ-ধবনেব উপসর্গ সাধাবণত লোপ পায়। কিন্তু এই মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হওয়ার ভাবটা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় কিংবা প্রায়ই ফিবে ফিবে দেখা দেয় তখন ব্যাপাব গুরুতব বলে মনে করতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে, মাথা নিচেব দিকে বেখে শুয়ে পড়া, মাথা ধোয়া বা মাথায় ঠাণ্ডা কম্প্রেস লাগানো, নাকে স্মেলিং সল্ট-জাতীয় ওষুধ ধরা, জল খাওয়া ইত্যাদি সবল প্রক্রিয়ায় চট কবে ফল না পেলে অবিলম্বে ডাক্তাববাবুকে খবর দিতে দ্বিধা কববেন না।

গরম বোধ হওয়া -বিশেষ করে গর্ভাবস্থাব সপ্তম, অষ্টম ও নবম মাসে প্রসূতির একটি স্বাভাবিক অভ্যাসের গুরুতর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ-সময়ে তিনি আগেব চেয়ে ঢের বেশি গরম বোধ করে থাকেন ও সহজেই ঘেমে ওঠেন। এমন কি ইতিপূর্বে যে-সব মেয়ের ঠাণ্ডা লাগাব অতিবিক্ত ভয় ইত্যাদি বাতিক থাকে, তাঁদের মধ্যে অনেককেই এ-সময়ে উল্টো অতিবিক্ত গরম বোধ করতে দেখা যায়। এ-সময়ে ঘরের ভেতব প্রসূতিব সব সময়েই গরম লাগে, যখন-তখন খোলা হাওয়ার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, রাত্রে সমস্ত জানলা খোলা রাখতে চান, শীতকালেও গায়ে ঢাকা দিতে চান

না এবং তাঁর হাত-পায়ের তলা সব সময়েই উত্তপ্ত হয়ে থাকে। এরকম গুরুতর পরিবর্তন কেন হয়, চিকিৎসকদের কাছেও তা গবেষণার বিষয়। তবে, সম্ভবত, মৌল রাসায়নিক কারণে ও রক্তের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যাওয়ার দরুন প্রসূতির শরীরে তাপবৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে গর্ভে একটি জীবন্ত প্রাণী বেড়ে ওঠার ফলে তার শরীর থেকে প্রসূতির দেহে তাপ-বিকিরণ—এইসব মিলিয়ে প্রসূতির গরম বোধ-হওয়া অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তবে এই বিশেষ উপসর্গের সঙ্গে প্রসূতির রক্তের চাপ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাসের যে কোনো সম্পর্ক নেই, এ-বিষয়ে চিকিৎসকরা নিশ্চিত।

শীতবোধ ও জ্বর-- শরীবের উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে শীতবোধ হলে সব সময়েই বুঝতে হবে যে কোনো-না-কোনো রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। অবশ্য শবীবের উত্তাপ না বাড়লেও অনেক সময় হঠাৎ শীত বোধ করা ও কাঁপুনি ধরাব মতো ব্যাপাব ঘটতে পাবে। এরকম ব্যাপার স্নায়বিক দুর্বলতাব জন্যে ঘটে এবং গর্ভাবস্থায়ও এ-ঘটনা ঘটলে ভয় পাওয়াব কিছু নেই। কিন্তু শীতবোধ বা কাঁপুনির সঙ্গে কিংবা আগে-পবে দেহেব উত্তাপ বাড়লে অবশ্যই অন্য কোনো রোগ-বীজাণুব সংক্রমণ ঘটেছে বলে মনে করতে হবে ও ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। গর্ভাবস্থায় অনেক সময় “পায়েলাইটিস” নামে মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্কের এক ধরনেব বোগেব ফলে এই রকম শীতবোধ ও জ্বর দেখা যায়। তবে এ-উপসর্গ পায়েলাইটিসের না সাধারণ জ্বরের তা একমাত্র ডাক্তারবাবুব পক্ষেই বোঝা সম্ভব। অতএব, গর্ভাবস্থায় এ-উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে দ্বিধা কববেন না।

নাক বন্ধ হওয়া– গর্ভাবস্থাব গোড়ার দিকে প্রায়ই প্রসূতি তাঁর নাক বন্ধ হয়ে যায় বলে চিকিৎসকের কাছে অনুযোগ করে থাকেন। অন্য সময়ে ঠাণ্ডা লাগায় বা কোনো অ্যালার্জির ফলে নাক বন্ধ হলে যে চিকিৎসা, এক্ষেত্রেও তাইই প্রশস্ত। অর্থাৎ, নাকের মধ্যে ফোঁটায় ফোঁটায় ওষুধ দিয়ে শ্বাসকষ্ট দূর করার ব্যবস্থা। তবে এই ধরনের

নাকের ওষুধের অতিরিক্ত অপব্যবহার যাতে না হয় প্রসূতির সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। সম্ভব হলে প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে —অর্থাৎ সারা দিনে একবার মাত্র—নাকে ওষুধ দেবার ব্যবস্থা করলে সবচেয়ে ভালো হয়।

গর্ভাবস্থার প্রথম তিন কি চার মাস সাধারণত এই উপসর্গটি স্থায়ী হয়, তারপর আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি ঘটতে দেখা যায়। তবে অন্য কোনো রোগের আনুষঙ্গিক উপসর্গ কিংবা অ্যালার্জি হিসেবে এই বিশেষ উপসর্গটি দেখা দিয়ে থাকলে অবশ্য অন্য কথা।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সাধারণত যে-সমস্ত উপসর্গের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে ওপরে সেগুলি নিয়েই আলোচনা করা গেল। এই সব উপসর্গের মধ্যে অধিকাংশ প্রায় সমস্ত প্রসূতির মধ্যে দেখা যায় বলে অনেকে এ-সবের বাড়াবাড়ি দেখলেও তা স্বাভাবিক মনে করে আমল দিতে চান না। এ অভ্যাস কিন্তু ঠিক নয়। এমনিতে অস্বাভাবিক কিছু না হলেও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঘটলে এর মধ্যে অনেকগুলি উপসর্গই কিন্তু মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাই প্রসূতিমাত্রেই একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখবেন : সময়মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া একান্ত দরকার। তাছাড়া কোনোরকম অসুবিধা কিংবা প্রয়োজন বোধ করলেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডাক্তারবাবুকে সব কথা খুলে বলবেন। মনে রাখবেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ডাক্তারবাবুই প্রসূতির সবচেয়ে বড় বন্ধু।

এ-ছাড়া গর্ভাবস্থায় অন্যান্য নানা ধরনের সরল কিংবা জটিল অসুখ ও তার নানারকম জটিলতর উপসর্গ অবশ্য দেখা দিতে পারে। সেগুলি সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হচ্ছে।

ছয় | গর্ভাবস্থায় অসুখ ও প্রতিকার

আগেই বলেছি, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা কোনো রকম অসুস্থ অবস্থা নয়, বরং সুস্থ অবস্থারই রকম-ফের মাত্র। তবে, যেমন অন্যান্য অবস্থায় তেমনি এ-অবস্থায়ও, ছোট-বড় নানা রকম অসুখ ও তার নানা ধরনের উপসর্গ নিশ্চয়ই দেখা দিতে পারে। এইসব অসুখের মধ্যে অনেকগুলিকে আবার অবহেলা করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে ওঠে। কাজেই গর্ভাবস্থায় নানা ধরনেব অসুখবিসুখ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকাব।

প্রচলিত সাধারণ অসুখবিসুখ- মনে রাখবেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা প্রচলিত সাধারণ অসুখবিসুখের প্রতিষেধক অবস্থা নয়। যেমন অন্যান্য লোকের বেলায় তেমনি প্রসূতিরও ছোটখাট আন্ত্রিক অসুখ, বমি, উদরাময়, আমাশয়, সর্দিজ্বর, অল্পস্বল্প ইনফ্লুয়েঞ্জা, গলায় ব্যথা ও জ্বব ইত্যাদি সবই হতে পাবে। আব এ-সবের চিকিৎসাও যেমন অন্যান্যদের বেলায় হয় এক্ষেত্রে সেই একই রকম হবে। সেই একই নাকের ওষুধ, কাশির সিরাপ, অ্যাস্পিরিন বা ওই জাতীয় বড়ি ইত্যাদি এক্ষেত্রেও ব্যবহার কবা চলবে এবং এতে প্রসূতি কিংবা গর্ভস্থ ভ্রূণ কারো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া এও জানা দরকার যে উপরোক্ত ধরনের ছোটখাট অসুখের ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণের পুষ্টি বা ক্রমবিকাশেও কোনো বাধা হয় না।

ছোটখাট অসুখবিসুখের চিকিৎসায় পেনিসিলিন কিংবা অ্যান্টি-বায়োটিক জাতের অন্য কোনো ওষুধ সচরাচর ব্যবহার না করাই উচিত। কেবল নিতান্ত যেক্ষেত্রে ব্যবহার না করলেই নয় শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্র ছাড়া। তাও আবার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে

এ-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা কর্তব্য। কেননা, গর্ভাবস্থায় অ্যান্টি-বায়োটিক জাতের ওষুধ ব্যবহার করলে তার সঙ্গে যোনিদেশে হলদে স্রাব ও চুলকানি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ সাধারণত যোনির ভেতরকার উপকারী বীজাণুগুলিকে মেরে ফেলে ও এক বিশেষ ধরনের ঈস্টের বিস্তারে সাহায্য করে, ফলে ওই উপরোক্ত উপসর্গগুলি দেখা দেয়।

কিন্তু এ তো গেল ছোটখাট অসুখের কথা। গুরুতর কোনো রোগের আক্রমণ ঘটলে অবশ্য এ-নিয়ম একেবারে খাটবে না। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির যদি এমন কোনো জটিল অসুখ হয় যে-অসুখে অ্যান্টি-বায়োটিক জাতের ওষুধ ব্যবহার করা বিশেষ দরকার, তাহলে সেক্ষেত্রে উপরোক্ত ওই সব উপসর্গ দেখা দেওয়াব ভয় সত্ত্বেও ওই জাতীয় ওষুধ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। কেননা, টাইফয়েড ফিভার কিংবা লোবার নিউমোনিয়া-জাতীয় গুরুতর অসুখে প্রসূতির গর্ভপাত কিংবা অকাল-প্রসব পর্যন্ত ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গর্ভাবস্থায় অস্ত্রোপচার—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যদি কোনো কারণে প্রসূতির দেহে অস্ত্রোপচাবেব প্রয়োজন হয় এবং ধাত্রীবিৎ ও শল্য-চিকিৎসকরা সকলে এ-সম্পর্কে একমত হন তাহলে অস্ত্রচিকিৎসায় সম্মতি দিতে কোনো বাধা নেই। অস্ত্রোপচাব যে-ধবনেরই হোক না কেন, এমন কি প্রসূতির পেটে অস্ত্র করাব প্রয়োজন হলেও, উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসকের হাতে প্রসূতি নিজেকে নিবাপদ বলে জানবেন।

ধরুন, কোনো প্রসূতির পেটে বৃহদান্ত্রেব সংলগ্ন অ্যাপেন্‌ডিক্স নামের অঙ্গটি মারাত্মকরকম বিষিয়ে পেকে উঠেছে। গর্ভাবস্থায় হলেও, যে-কোনো চিকিৎসকই বলবেন ওটি অবিলম্বে কেটে বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রসূতিকে নিশ্চয়ই বাজী হতে হবে। বর্তমানে সাল্‌ফা ও অ্যান্টিবায়োটিক-জাতীয় ওষুধের কল্যাণে ভালো শল্য-চিকিৎসকের হাতে এ-ধরনের অপারেশন বীতিমতো নিবাপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এর ফলে প্রসূতি কিংবা গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা নেই

বললেই চলে। অন্যপক্ষে এ-অপারেশনে রাজী না হলেই বরং সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

অনেক সময় ধাত্রীবিৎ চিকিৎসক প্রসূতিকে প্রথমবার পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর ডিম্বকোষে এক বা একাধিক থলির মতো মৃত কোষগুচ্ছ বা cyst আছে বলে আবিষ্কার করেন। এই এক বা একাধিক 'সিস্ট্'-এর একেকটির ব্যাস দুই বা তিন ইঞ্চির বেশি না হলে তিনি সেগুলিকে না ঘাঁটিয়ে শুধু পরবর্তী পরীক্ষার সময় সেগুলি ক্রমশ বাড়ছে না একভাবে আছে তাই লক্ষ্য করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা বিকশিত হবার সঙ্গে এই ধরনের সিস্ট্ আবার নষ্টও হয়ে যায়। কিন্তু এই সিস্ট্-এর আকার যদি প্রকাণ্ড হয় তাহলে এ আপনা থেকে নষ্ট হয়ে যায় না এবং সেক্ষেত্রে আর বেশি দেরি না করে অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা একে কেটে বের করে ফেলা হয়। এরকম সিস্ট্ অপারেশনের সাহায্যে বের করে দিতে দেরি করলে অনেক সময় পেটে সাংঘাতিক যন্ত্রণা হয়। সিস্ট্ বেশি বড় হয়ে গেলে এমন কি প্রসবের সময়ও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কিংবা ফেটে গিয়ে 'পেরিটোনাইটিস'-এর মতো সাংঘাতিক ব্যাধি পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। তবে এই ধরনেব ডিম্বকোষের সিস্ট্ অপারেশন করতে হলে সাধারণত গর্ভাবস্থার চতুর্থ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বিধেয়।

খুব অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে—যেমন, যেখানে পূর্ববর্তী কোনো অস্ত্রোপ-চারের ফলে পেটের ক্ষুদ্রান্ত্রের কুণ্ডলীগুলির দু-একটি পরস্পরের গায়ে সেঁটে গেছে--গর্ভাবস্থায় প্রসূতির পেটে আন্ত্রিক ব্যাঘাত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। জরায়ু ক্রমশ বেড়ে ওঠার ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রের এই সব কুণ্ডলী স্থানচ্যুত হয়ে জট পাকিয়ে যায় ফলে উপরোক্ত বিপদ দেখা দেয়। তাই গা-বমির ভাবের সঙ্গে পেটে খিল-ধরার মতো বেদনা দেখা দিলে ও পেট ফেঁপে উঠলে তা গর্ভাবস্থার স্বাভাবিক উপসর্গ মনে করে প্রসূতি যেন চুপ করে সহ্য না করেন। মনে রাখবেন, ক্ষুদ্রান্ত্র জট পাকিয়ে গেলে এই ধরনের বিশেষ উপসর্গ দেখা দেয়। আন্ত্রিক ব্যাঘাত মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালে

অপারেশন করা অবশ্যই দরকার হবে। সাল্‌ফা ও অ্যান্টিবায়োটিক জাতের ওষুধের সাহায্যে ও ভালো শল্য-চিকিৎসকের হাতে এ-হেন গুরুতর অস্ত্রোপচারও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালোভাবে সফল হয় ও গর্ভ অক্ষুন্ন থাকে।

পুরনো ব্যাধি ও কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব-গর্ভপাত— প্রত্যেক মেয়েই যদি গর্ভাবস্থার সূচনা হবার আগে ডাক্তারের সাহায্যে ভালোভাবে শরীর পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন তো সবচেয়ে ভালো হয়। এভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে চিকিৎসক মেয়েটির শরীরে কোনো পুরনো স্থায়ী ব্যাধি (chronic disease) আছে কিনা জানতে পারেন এবং মারাত্মক অসুখের সন্ধান পেলে মেয়েটির ভবিষ্যৎ গর্ভধারণের সম্ভাবনা রোধ করতে পারেন। তবে আমাদের দেশে আজ পর্যন্তও অধিকাংশ মেয়েব ক্ষেত্রে এ-ধবনের সুযোগ-সুবিধার একান্ত অভাব। মারাত্মক কোনো বোগে একেবারে শয্যাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত এ-দেশের অসংখ্য মেয়ে হয় ডাক্তাব দেখাতে পারেন না আব নয়তো দেখান না। এঁদের ডাক্তাব দেখাবাব একটা সুযোগ আসে সাধারণত অন্তঃসত্ত্বা হবার পর। কিন্তু গর্ভসঞ্চারের পর ডাক্তারি পবীক্ষায় কোনো মেয়ের দেহে মারাত্মক পুবনো ব্যাধি আবিষ্কৃত হলে তখন আর গর্ভধারণ-রোধের প্রশ্ন ওঠে না, তখন দেখা দেয় ভাবী মায়েব স্বাস্থ্যের খাতিরে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভস্রাব কিংবা গর্ভপাত ঘটানোর সমস্যা।

এ-সমস্যা সমাধানের ভার অবশ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ওপর। ধাত্রীবিৎ যখন মনে করবেন যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার আর বেশি বিকাশ ঘটতে দিলে ভাবী মায়ের স্বাস্থ্য কিংবা জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে তখনই তিনি কৃত্রিম উপায়ে প্রসূতির গর্ভস্রাব কিংবা গর্ভপাত ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই বিশেষ ধরনের ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা হয় না।

হৃদরোগ—প্রসূতির হৃদরোগ আছে জানা গেলে তাঁর পক্ষে গর্ভ-ধারণ নিরাপদ কিনা তা ভালোরকম পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুই স্থির * করবেন।

কোনো মেয়ের পূর্বে কখনো 'হার্ট মার্মার' নামের রোগ এবং হৃদ-রোগের অল্পস্বল্প লক্ষণ দেখা দিয়েছিল বলে যে চিরকাল তিনি সন্তান-ধারণে অক্ষম হবেন এমন কোনো কথা নেই। হৃদরোগের ফলে কখনো তাঁর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নষ্ট না হয়ে থাকলে, কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের শক্তি লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে না গিয়ে থাকলে গর্ভধারণের ফলে প্রসূতির গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা সাধারণত থাকে না।

অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে প্রধানত বাতজ্বর (rheumatic fever)-এর দরুনই হৃদযন্ত্রের অসুখ ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু পূর্বে বাতজ্বর ঘটেছিল এমন ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও কোনো মেয়ে যদি সব রকম শারীরিক পরিশ্রমে (যেমন, সিঁড়ি ভাঙা, বন্ধুদের সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত হাঁটা, ভারী জিনিস তোলা-নামানো ইত্যাদিতে) সক্ষম হন এবং অল্পেতেই হাঁপিয়ে না পড়েন তাহলে তাঁর পক্ষেও যে পূর্ণ গর্ভ-ধারণকাল যাপন করা ও স্বাভাবিক ভাবে সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে এমন বিশ্বাস করবার যুক্তি আছে। এমন কি বাতজ্বরের ফলে স্পষ্টত 'হার্ট মার্মার' দেখা দেওয়া সত্ত্বেও সন্তানধারণ ও প্রসবের সময়কার বিপদের ভয় অন্যান্যদের চেয়ে তাঁর ক্ষেত্রে বেশি, এমন কথাও বলা চলে না।

কিন্তু যেক্ষেত্রে মেয়েটিকে কোনো-না-কোনো সময়ে হৃদরোগের কারণে মেপেজুকে শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, হার্ট ফেল করার লক্ষণ দেখা দেওয়ার দরুন কখনো-না-কখনো পুরোপুরি শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে এবং মাঝে মাঝে এ-কারণে তাঁকে ডিজিটালিস কিংবা অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয়েছে, সেরকম ক্ষেত্রে সন্তানধারণ কমবেশি বিপজ্জনক তো বটেই। তবে এ-সব জায়গায়ও সারা গর্ভকাল জুড়ে ভালো হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থাকতে

পারলে তেমন মারাত্মক কোনো বিপদআপদ না ঘটতে পারে।
যেক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের অবস্থা আরো বেশি খারাপ (যেমন, শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা চিরজীবনের মতো এতটা কমে গেছে যে পরিশ্রম করতে গেলেই হাঁপ ধরে এবং প্রায়ই হৃদরোগের ওষুধ খেতে হয়) সেক্ষেত্রে অবশ্য সন্তানধারণ ও প্রসব করতে গিয়ে গুরুতর দুর্ঘটনা, এমন কি প্রসূতির মৃত্যু পর্যন্ত, ঘটা বিচিত্র নয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বলেন এরকম ক্ষেত্রে প্রসূতি-মৃত্যুর হার শতকরা ৩৩ জন পর্যন্ত উঠতেও দেখা যায়।

গত দশ কি পনেরো বছরে হৃদরোগে আক্রান্ত মেয়েদের গর্ভধারণ সম্পর্কে চিকিৎসাজগতের ধারণা বেশ কিছুটা পালটেছে। এক সময়ে মনে করা হত যে এ-ধরনের প্রসূতির গর্ভকালের নবম মাসই (গর্ভস্থ শিশু যখন বৃহদাকার ও পূর্ণ পরিণত হয়ে ওঠে) সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় এবং এঁদের পক্ষে প্রসববেদনা সহ্য করা মারাত্মক কষ্টকর। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের মত এই যে গর্ভাবস্থার চতুর্থ মাস নাগাদই প্রসূতির শরীরে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন হৃদযন্ত্রের ওপর বোঝা ও কাজের চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত প্রসূতির ক্ষেত্রে কখনো কখনো ওই সময়েই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় ও প্রসূতির অতিরিক্ত বিশ্রাম নেবার দরকার হয়। বর্তমানে এও জানা গেছে যে হৃদযন্ত্রের ওপর এই বোঝার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বেড়ে ওঠে গর্ভাবস্থার অষ্টম মাসের শেষাশেষি এবং নবম মাসের গোড়ার দিকে প্রসূতির শরীরে সঞ্চালিত রক্তের পরিমাণ কমতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃদযন্ত্রের কাজের চাপও ফের হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া, আগে হৃদরোগে আক্রান্ত প্রসূতিকে প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করার ও তার মারাত্মক ফলাফলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সীজারিয়ন অপারেশন নামের এক ধরনের অস্ত্রোপচারের সাহায্যে সন্তানপ্রসব করানো হত। আজকাল চিকিৎসকরা বলছেন, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অল্পস্বল্প হৃদরোগে আক্রান্ত

মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাভাবিকভাবে সুপ্রসব করতে সমর্থ হন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রসবের সময় চিকিৎসককে কয়েকটি ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে হয়—যথা, হৃদযন্ত্রের কোনো ওষুধ-বিষুধ লাগবে কিনা, প্রসূতিকে ওষুধের সাহায্যে ঠিকমতো মোহাচ্ছন্ন করা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি। এছাড়া জরায়ুমুখ খুলে-যাওয়া মাত্র বিলম্ব না করে প্রসূতিকে সন্তানপ্রসবে সাহায্য করাও চিকিৎসকের কর্তব্য। তাঁর পক্ষে এই শেষোক্ত কাজটি করা দরকার এইজন্যে যে স্বাভাবিকভাবে প্রসবের সময় গর্ভস্থ শিশুকে জরায়ু থেকে ও যোনির মধ্যে দিয়ে ঠেলে বের করে দিতে গিয়ে ভাবী মাকে যে-পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রান্ত হতে হয়, হৃদরোগে আক্রান্ত প্রসূতিকে সেই পরিশ্রমের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তবু, এ-সমস্ত সত্ত্বেও, বারবার যে-কথাটা প্রসূতিকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, তা হল : যে-মেয়ের হৃদরোগ আছে বলে জানা গেছে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলে সারা গর্ভাবস্থাকাল জুড়ে তাঁকে চিকিৎসকের—সম্ভবস্থলে একজন ধাত্রীবিৎ ও একজন হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞের যৌথ—সতর্ক তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। এ-ধরনের প্রসূতিকে মনে রাখতে হবে যে তাঁর পক্ষে খুব বেশি বিশ্রাম, বাঁধাধরা নিয়মমাফিক পথ্য-গ্রহণ এবং সব রকম রোগের সংক্রমণ এড়িয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন। এ-সব ব্যাপারে সামান্যতম গাফিলতির ফলাফলও মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা-জগতে হৃদপিণ্ডে অস্ত্রচিকিৎসার একটি অভাবনীয় নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাতজ্বরের ফলে বিকলাঙ্গ হৃদপিণ্ড থেকে স্টেনোসিস নামে যে মারাত্মক হৃদরোগের উদ্ভব হয়, এই চিকিৎসায় সে-রোগ আশ্চর্যভাবে ভালো হয়ে যায়। স্টেনোসিসে আক্রান্ত কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে, এবং কাছাকাছি ভালো হৃদ-রোগ-বিশেষজ্ঞ থাকলে তিনিও এ-ধরনের চিকিৎসার সাহায্য নেবেন কিনা তা বিবেচনা করা কর্তব্য। চিকিৎসক উপযুক্ত হলে এমন কি

গর্ভাবস্থায়ও এরকম অস্ত্রোপচারে কোনো বাধা নেই।

এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার যে হৃদযন্ত্রের কোনো গণ্ডগোল না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মেয়ে নিজেদের হৃদরোগে আক্রান্ত বলে কল্পনা করে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন আবার কেউ বা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত হৃৎস্পন্দনের মতো বিরক্তিকর উপসর্গ ও তজ্জনিত অস্বস্তিতে ভুগে থাকেন। এই উপসর্গ বা অস্বস্তি কখনো কখনো গুরুতর আকারও নিতে পারে। তবে এই ধরনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তার দিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করালে জানা যাবে যে এই উপসর্গ আর যে-কারণে দেখা দিক না কেন হৃদযন্ত্রের বৈকল্যজনিত অসুখের ফলে তা দেখা দেয়নি নিশ্চয়। এবং এরকম ক্ষেত্রে, বলাই বাহুল্য, গর্ভধারণ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির রোগ—যে-সব মেয়ে গলনালির রোগ ইত্যাদির পরবর্তী মূত্রগ্রন্থির প্রদাহে একবার ভুগেছেন তাঁদের মূত্রগ্রন্থি যে সে-কারণে চিরকালের মতো জখম হয়ে যাবেই এমন কোনো কথা নেই। তবে কোনো মেয়ের এ-ধরনের রোগের পূর্ব-ইতিহাস থেকে থাকলে, তাঁর মূত্রগ্রন্থির কর্মক্ষমতা গর্ভাবস্থার উপযোগী আছে কিনা তা ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। প্রস্রাবে অ্যালবুমেন পাওয়া গেলেই বুঝতে হবে ব্যাপার গুরুতর, এমনও মনে করার কারণ নেই। তবে এ-কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে পুরনো কোনো রোগের আক্রমণে কোনো মেয়ের মূত্রগ্রন্থি দুটি গুরুতররূপে জখম হয়ে থাকলে— এবং বিশেষ করে সেই পুরনো রোগটি শরীরে যদি এখনো জীয়নো থাকে, তাহলে—সে-মেয়ের পক্ষে গর্ভধারণ একেবারে পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

কোনো রোগীর মূত্রগ্রন্থি দুটি গুরুতরভাবে জখম হলে তার ফলে তাঁর শরীরে রক্তাল্পতা ও রক্তচাপবৃদ্ধিও দেখা দেয়। তাছাড়া মূত্রগ্রন্থি জখম হওয়ায় রক্ত পরিষ্কারে বাধার সৃষ্টি হয় বলে সময়-সময় শরীরের মধ্যে নাইট্রোজেনজাতীয় দূষিত পদার্থও জমে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

এ-ধরনের প্রসূতির ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ যে বেড়ে যাবে তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়; ফলে জরায়ুর মধ্যেই ভ্রূণটির মারা যাওয়ার ও প্রসূতির গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ঘটার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। এবং এর ফলে প্রসূতির মূত্রগ্রন্থি দুটি সাধারণত আরো বেশি বিকল হয়ে পড়ে ও প্রসূতির নিজেরই আয়ু হ্রাস পায়।

মূত্রগ্রন্থির আরো একটি রোগ হল, প্রস্রাবে পুঁজ পড়া। ইংরেজিতে এ-রোগের নাম 'পায়েলাইটিস'। অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে এ-রোগ প্রায়ই দেখা যায়। তবে ঠিকমতো চিকিৎসা করালে মূত্রগ্রন্থির কোনো ক্ষতি হয় না এবং রোগটিও সম্পূর্ণ সেরে যায়।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস—বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত মেয়ের পক্ষে গর্ভধারণ করতে হলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। ভালোয় ভালোয় জীবিত সন্তান প্রসব করতে হলে এ-ধরনের প্রসূতির পক্ষে সারা গর্ভকাল জুড়েই বিচক্ষণ চিকিৎসকদের বিশেষ সতর্ক তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। বিশেষ করে একজন ধাত্রীবিৎ বিশেষজ্ঞ ও একজন সাধারণ চিকিৎসক (general practitioner) এই দুইয়ের যৌথ তত্ত্বাবধানে থাকা প্রসূতির পক্ষে নিতান্ত দরকার।

বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত প্রসূতির দুই দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা। প্রথমত, গর্ভাবস্থায় ওই মূল রোগটিকে নিয়ন্ত্রণ করে আয়ত্তের মধ্যে রাখাই শক্ত হয়ে উঠতে পারে। এ-ব্যাপারে সদা-জাগ্রত দৃষ্টি না রাখলে প্রসূতির রক্তে অ্যাসিডোসিস নামের বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষে বেঁচে থাকাই নিতান্ত দুষ্কর হয়ে ওঠা সম্ভব। এছাড়া দ্বিতীয় দফা বিপদ এই যে বহুমূত্র রোগগ্রস্ত প্রসূতির শরীর বিষিয়ে ওঠার সম্ভাবনা অন্য সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। আচমকা রক্তচাপ বৃদ্ধি, মাথা ধরা, হাত-পা ফোলা, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন দেখা দেওয়া, ইত্যাদি প্রসূতির শরীরে বিষক্রিয়ারই নানাবিধ উপসর্গ। এর ফলে যেমন প্রসূতির বিপদের সম্ভাবনা, তেমনি গর্ভস্থ শিশুরও জীবন বিপন্ন হবার ভয়।

তাছাড়া, বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত প্রসূতির অতিরিক্ত বড়সড় চেহারার শিশুর জন্ম দেবার প্রবণতা দেখা যায়। এমন কি এ-ধরনের প্রসূতি চিকিৎসাধীনে থাকা সত্ত্বেও এ-প্রবণতার কোনো হেরফের হয় না। এর ফলে সন্তানপ্রসব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা এবং শেষ পর্যন্ত সীজারিয়ন অস্ত্রোপচারের সাহায্যে সন্তানপ্রসবের প্রয়োজন হতে পারে। এ-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে কোনো প্রসূতি অতিরিক্তরকম বড়সড় শিশুর (ধরুন, নয় দশ কি এগারো পাউণ্ড ওজনের) জন্ম দিলে তাঁর শরীরে লুকোনো অবস্থায় বহুমূত্র রোগ আছে কি না তা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

বহুমূত্র রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত প্রসূতির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বড়সড় শিশু যদি ভূমিষ্ঠ না হয় তাহলেও মৃতজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা প্রবল। এই বিশেষ বিপদ এড়ানোর জন্যে এ-ধরনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে, গর্ভস্থ শিশু আকারে উপযুক্তরকম বড় হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলে, গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রসূতির দেহে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচারও করা হয়ে থাকে।

যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগ—সক্রিয় যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মেয়েদের পক্ষে সন্তান-ধারণের চেষ্টা না করাই বাঞ্ছনীয়। এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। একবার রোগের আক্রমণ হয়ে থাকলে, এবং রোগক্ষত একেবারে যৎসামান্য ধরনের না হলে, রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রিত হওয়ার অন্তত দুই থেকে তিন বছর পরে অন্তঃসত্ত্বা হবার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তবে এ-প্রসঙ্গে আবার একথাও বলা দরকার যে বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত নারীর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বলে সাধারণের মধ্যে যে-ধারণাটি প্রচলিত আছে, সেটিও ভিত্তিহীন। বর্তমানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন যে এমন কি মোটের ওপর গুরুতররকমের রোগাক্রান্তের ক্ষেত্রেও, গর্ভাবস্থায় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা যে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি তা বলা যায় না। তবে তাঁরা মনে করেন, একমাত্র প্রসবের সময়কার

হয়রানির ফলে বিশেষ করে ফুসফুসের ব্যাধি হয়তো বা বাড়লেও বাড়তে পারে। এই শেষোক্ত কারণেই বাড়াবাড়ি রকমের ক্ষয়রোগ-গ্রস্ত প্রসূতির দেহে ডাক্তারদের অনেক সময় সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করতে দেখা যায়।

আগে কোনো এক সময়ে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও যদি জানা যায় যে বেশ কিছুকাল ধরে সে-রোগ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আছে তাহলে অবশ্য মেয়েদের পক্ষে গর্ভধারণে কোনো বাধা নেই। এই ধরনের প্রসূতির পক্ষে গর্ভাবস্থার উপযোগী সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়, তদতিরিক্ত কোনো বিশেষ নিয়ম তাঁদের পক্ষে পালনীয় বলে মনে করা হয় না। তবে গর্ভাবস্থার একেবারে গোড়ার দিকে ও পরে কোনো সময়ে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে সন্দেহ হওয়ামাত্রই এক্স-রে যন্ত্রের সাহায্যে এ-ধরনের প্রসূতির রোগ পরীক্ষা করা দরকার।

গর্ভসঞ্চারের পর ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রসূতির দেহে যক্ষ্মারোগ সক্রিয়-ভাবে আছে বলে ধরা পড়লে অতিরিক্ত ভয় পাবার দরকার নেই। কেননা, আগেই বলেছি, গর্ভসঞ্চারের ফলে রোগিণীর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবেই এমন কোনো কথা নেই। তবে এরকম ক্ষেত্রে প্রসূতিকে তাঁর চিকিৎসকের কড়া তত্ত্বাবধানে ও পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার যে রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের না হলে এরকম প্রসূতির পক্ষে সন্তানধারণ একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে (অর্থাৎ, যক্ষ্মারোগ সক্রিয় হলেই-যে সমস্ত প্রসূতির ক্ষেত্রে গর্ভপাত ইত্যাদি কিংবা পরে সীজারিয়ন অস্ত্রো-পচারের সাহায্যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার অবসান ঘটানো দরকার হয়ে পড়ে তা নয়)।

মৃগী রোগ—মৃগী রোগগ্রস্ত প্রসূতির পক্ষে সন্তানধারণে যে কোনো অসুবিধা আছে তা নয়, তাঁর সমস্যা হল প্রসবের পর সন্তান-পালনের সমস্যা। এ-কারণে ডাক্তারি চিকিৎসা ও ওষুধের সাহায্যে

রোগের আক্রমণ ঠেকানো বা রোগ-নিরাময় সম্পর্কে ভালোমতো নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ-ধরনের মেয়েদের পক্ষে মা হবার বাসনা দমন করাই ভালো। অবশ্য যদি এরকম প্রসূতির সন্তানের ভার নিতে ও পালন করতে সমর্থ পরিবারে এমন তৃতীয় ব্যক্তি থাকেন তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

মূত্রনালি ইত্যাদির রোগ—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মূত্রনালি ও আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এর কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। আগে অবশ্য ডাক্তাররা মনে করতেন যে যান্ত্রিক কারণে, অর্থাৎ মূত্রনালি ইত্যাদির ওপর ক্রমশ বড়-হয়ে-ওঠা জরায়ুর চাপ পড়ায়, প্রস্রাবের চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয় বলে ওই সব অঙ্গ ফুলে ওঠে এবং জমা প্রস্রাব থেকে অঙ্গগুলিতে বোগ-বীজাণুব সংক্রমণ ঘটে। এই ধারণার বশেই চিকিৎসকরা প্রসূতিদেব প্রচুর পরিমাণে জল খেতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু এ তত্ত্ব সঠিক নয় বলে বর্তমানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা মনে করেন এবং এই কারণেই তাঁবা আজকাল বলেন যে প্রসূতির প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল খাবার দরকার নেই।
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এছাড়া আরও এক ধরনের মূত্রনালি-ঘটিত রোগ দেখা যায় ইংরেজিতে তাকে বলে, 'পায়েলাইটিস'। এ-রোগ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য, বর্তমানে, বিশেষ করে যে-সব প্রসূতি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি ঠিক-মতো মেনে চলেন তাঁদের ক্ষেত্রে, এ-রোগেব প্রকোপ অনেক কমে গেছে। তাছাড়া এ-ধরনের রোগ প্রায় সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত অ্যান্টি-বায়োটিক কিংবা সাল্ফা-জাতীয় ওষুধের সাহায্যে সহজেই নিরাময় হয়।

গর্ভাবস্থা ও অতিরিক্ত বেশি বা কম রক্তচাপ—শরীরের রক্তচাপের ওপর স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার প্রভাব যৎসামান্য। সাধারণত, অন্তঃসত্ত্বা

অবস্থার একেবারে গোড়ার কয়েক মাসে রক্তচাপ সামান্য কয়েক পয়েন্ট কমে যেতে এবং শেষের কয়েক মাসে সামান্য খানিকটা বেড়ে যেতে (কিংবা এই ধরনের কমার বা বাড়ার প্রবণতা) দেখা যায়। তবে শরীরে অন্য কোনো জটিল রোগ না থাকলে সাধারণ অবস্থায় প্রসূতির রক্তচাপের এই হ্রাস বা বৃদ্ধি কখনই স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে না।

কিন্তু রক্তচাপ কাকে বলে ?– শরীরে রক্তের চাপকে সাধারণত দু-ভাবে প্রকাশ করা হয়। একটি উচ্চতর সংখ্যার দ্বারা—একে বলা হয় সিস্টোলিক চাপ ; অপরটি নিম্নতর সংখ্যার দ্বারা—তাকে বলা হয় ডায়াস্টোলিক চাপ। হৃদপিণ্ড নিজেকে সংকুচিত করে ভেতরকার সমস্ত রক্তটুকু রক্তবহা ধমনীতে চালান করে দিলে পর শরীরের ধমনীতে রক্তের চাপ চরমে ওঠে। এই উচ্চতম রক্তচাপকে তখন বলা হয় সিস্টোলিক চাপ। এর পর হৃদপিণ্ডের ভ্যাল্‌ভ বা দরজাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং হৃদপিণ্ডটি ফের শিরা থেকে টেনে-নেওয়া দূষিত রক্তে ভরে ওঠে। এর ফলে ধমনীতে রক্তের চাপ স্বভাবতই নিম্নতম মাত্রায় নেমে যায়। শরীরের ভেতরকার এই নিম্নতম রক্তচাপকে বলা হয় ডায়াস্টোলিক চাপ। এর পর হৃদপিণ্ড আবার নতুন বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীতে চালান করে ডায়াস্টোলিক চাপকে ঠেকায় এবং ফিরে-ফিবতি সিস্টোলিক চাপ সৃষ্টি করে।

ব্যক্তিভেদে স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপের তারতম্য ঘটে থাকে। বিশেষ ব্যক্তির বয়স, শরীবের গঠন, শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস, স্নায়ু বা নার্ভতন্ত্রের অবস্থা, এবং পরিশেষে রক্তের চাপ পরীক্ষা করার ঠিক আগে রোগী কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছেন, ইত্যাদি ব্যাপারের ওপর সিস্টোলিক চাপের ওঠা-পড়া নির্ভর করে। আগে এই রকম একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে ১০০-এর সঙ্গে পরীক্ষার সম্মুখীন ব্যক্তিটির বয়স যোগ করলে যে-সংখ্যাটি দাঁড়ায়, তাঁর সিস্টোলিক চাপ সেই সংখ্যা কিংবা তার কাছাকাছি দাঁড়ালে সে-চাপকে স্বাভাবিক বলা হবে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বর্তমানে এ-ধারণাটি

সঠিক নয় বলে মনে করেন। আজকাল একজন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সিস্টোলিক চাপ ১৫০ পর্যন্ত উঠলেও তাকে মোটামুটি স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অন্যপক্ষে শরীরের ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের তারতম্য এত বেশি উত্তেজনা বা পরিশ্রম-সাপেক্ষ নয়। স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ ৬০ থেকে ৯০-এর মধ্যে থাকতে দেখা যায়।

শরীরে উচ্চ রক্তচাপের একাধিক কারণ বর্তমান। মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্ক গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে শরীরে রক্তের চাপ বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কোনো মেয়ের এই শেষোক্ত অসুখ থাকলে তাঁর পক্ষে গর্ভধারণ বিপজ্জনক বলে গণ্য করতে হবে। এছাড়া আরো কয়েক ধরনের উচ্চ রক্তচাপ-রোগ আছে, যেগুলি খুব দ্রুত মারাত্মক আকার ধারণ করে। ইংরেজিতে এইসব ধরনের অসুখকে সাধারণভাবে বলা হয় 'ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেন্শন'। এই সমস্ত রোগে মূত্রগ্রন্থি, রক্তবহা শিরা-ধমনী, চোখ ও মস্তিষ্কে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায়। এ-রকম রোগে আক্রান্ত মেয়েরা এত বেশি অসুস্থ হন যে গর্ভধারণ তো দূরের কথা তাঁদের পক্ষে অন্তঃসত্ত্বা হওয়াই শক্ত হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত ধরনের গুরুতর রক্তচাপ বৃদ্ধি-রোগ ছাড়া এমন বহু মেয়ে দেখা যায় যাঁরা এমনিতে যথেষ্ট সুস্থ-সবল হলেও অপেক্ষাকৃত বেশি উচ্চ রক্তচাপবিশিষ্ট। এই ধরনের মেয়েরা যদি স্বাভাবিক সুস্থ হন, উচ্চ রক্তচাপের দরুন কোনো শারীরিক উপসর্গে না ভোগেন এবং ভালোরকম ডাক্তারি পরীক্ষার ফলে তাঁদের মূত্রগ্রন্থির কোনো অপ্রকাশিত অসুখ ধরা না পড়ে তাহলে তাঁদের পক্ষে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় গুরুতর কিছু বাধা নেই।

কিন্তু যে-সব মেয়ের বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে তাঁরা উপরোক্তরকম উচ্চ রক্তচাপবিশিষ্ট হলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁদের বিপদের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। এ-ধরনের প্রসূতির অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রক্তদূষিত রোগে (toxemia) আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে প্রসূতির রক্তচাপ আগের চেয়েও বেড়ে যায় এবং তাঁর মূত্রগ্রন্থির

কাজকর্মেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। অবশ্য ঠিকমতো চিকিৎসা হলে এ-ধরনের প্রসূতির (অর্থাৎ যাঁর দেহে উচ্চ রক্তচাপের ওপর রক্তদূষিত রোগের উপসর্গ দেখা দিয়েছে) নিজের জীবন শেষপর্যন্ত রক্ষা পেতে পারে। তবে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় এ-সমস্ত ক্ষেত্রে বিলক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

শরীরে রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ঘটলেও, রক্তের চাপ হ্রাস পাওয়া নিয়ে কিন্তু মাথা ঘামানোর বিশেষ কিছু নেই। প্রসূতির পক্ষে মনে রাখা দরকার, এমনিতে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ কখনো নিছক নিম্ন রক্তচাপ বা রক্তের চাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে বিকল বা অকর্মণ্য হয়ে পড়ে না। এবং এই অসুস্থতার অর্থে সত্যিসত্যিই 'নিম্ন রক্তচাপ' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। অনেক সময় দেখা যায় সাধারণ সময়ে কোনো মেয়ের রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকলে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ ও গর্ভাবস্থার অন্যান্য সাধারণ উপসর্গকে তিনি ওই নিম্ন রক্তচাপের উপসর্গ বলে ভুল করেন এবং চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে ছুটে আসেন। কিন্তু 'নিম্ন রক্তচাপ' নিয়ে এরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া নেহাতই হাস্যকর।

একমাত্র এক-আধটা জরুরী ক্ষেত্র কিংবা শরীরের অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি নামের অঙ্গটির কয়েক ধরনের দুর্লভ অসুখ ছাড়া নিম্ন রক্তচাপের মতো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।

রক্তাল্পতা-রোগ—বহুকাল ধরেই এ-তথ্যটি সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন যে গর্ভাবস্থায় প্রসূতিদের শরীরে অল্পবিস্তর পরিমাণে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

কিন্তু রক্তাল্পতা-রোগ কথাটির অর্থ কি ?—রক্তের মধ্যে এক ধরনের ভাসমান কোষ (বা রক্তকণিকা) থাকে যাদের মধ্যে লাল রঙের একটা পদার্থ বিদ্যমান। এই লাল পদার্থটির নাম হিমোগ্লোবিন। রক্ত ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে যাবার পথে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন শুষে

নেয়। এই অক্সিজেন রক্তের মধ্যেকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। হিমোগ্লোবিনের কাজ হল অক্সিজেন বহন করে নিয়ে গিয়ে শরীরের সর্বত্র কোষসমষ্টির মধ্যে তা সরবরাহ করা। এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্তের মধ্যে এই হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে স্থির করা হয় পরীক্ষার সম্মুখীন ব্যক্তি রক্তাল্পতা-রোগে ভুগছেন কিনা।

প্রসূতিদের শরীরে রক্তাল্পতার লক্ষণ খাঁটি রক্তাল্পতা-রোগ কিনা এ নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যেই মতভেদ আছে। এক দল একে খাঁটি রক্তাল্পতা বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, প্রসূতির রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণ গর্ভাবস্থায় প্রসূতির দেহের অভ্যন্তরে—কোষসমষ্টি ও রক্তের মধ্যেও—জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। ফলে পরিমাণে বাড়লেও রক্ত আগের চেয়ে পাতলা হয়ে যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি প্রসূতির রক্তাল্পতা-রোগ দেখা দিয়েছে। আরেক দল বিজ্ঞানী কিন্তু মনে করেন যে এ-সময়ে শরীরে আয়রনের অভাব ঘটে বলে সত্যিসত্যিই রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত পরিমাণে আয়রন গ্রহণ করলে এ-রোগের উপশমও ঘটতে পারে। এই দুই মতের কোনটি যে সঠিক তা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা শক্ত।

যাই হোক, কোনো ডাক্তারই রক্তাল্পতাকে শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা বলেন না। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় প্রসূতির রক্তাল্পতা-রোগ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। রোগ গুরুতর ধরনের হলে তো কথাই নেই। এরকম ক্ষেত্রে প্রসূতিকে ডাক্তারের বিশেষ চিকিৎসাধীনে থাকতে হবে। অল্পস্বল্প অসুখে ওষুধ হিসেবে আয়রন ও ভিটামিন গ্রহণ করলেই উপকার পাওয়া যাবে। এমন কি সে-রকম কোনো প্রয়োজন না থাকলেও এ-সময়ে আয়রন ও ভিটামিন ওষুধ হিসেবে খেলে কোনো ক্ষতি নেই।

মায়ের রক্তাল্পতা ঘটলে গর্ভস্থ সন্তানের কোনো বিপদ হতে পারে কিনা এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রসূতির জেনে রাখা ভালো যে মায়ের

শরীরে অল্পস্বল্প রক্তাল্পতা দেখা দিলে তাতে শিশুর কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা, রক্তাল্পতা-রোগের সঙ্গে মায়ের রক্তকণিকার মধ্যেকার হিমোগ্লোবিনের নিকট-সম্পর্ক। অথচ এই রক্তকণিকারা তথা হিমোগ্লোবিন প্লাসেণ্টার দেয়ালের বাধা অতিক্রম করে গর্ভস্থ শিশুর রক্তবহা ধমনীতে ঢুকতে পারে না। তবে একটা কথা। মায়ের রক্তাল্পতা-রোগ যদি এতই প্রবল হয় যে তাঁর রক্তকণিকারা উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহে অপারগ হয়ে পড়ে তাহলে অবশ্য গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

রক্তদুষিত রোগ—এ-রোগ বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই ঘটতে দেখা যায়। তবে রোগ যত না হয়, এ-সম্পর্কে নানা ধরনের কিংবদন্তী তার চেয়ে অনেক বেশি প্রচার করা হয়। এই কারণে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে পায়ের গোড়ালি বা হাতের আঙুলে অল্পবিস্তর শোথ দেখা দিলে প্রসূতি ও তাঁর পরিজনরা রক্ত দূষিত হয়ে গেছে মনে ভেবে এত অস্থির হয়ে পড়েন।

রক্তদুষ্টি-রোগের কারণ এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। সাধারণত গর্ভাবস্থার শেষার্ধে কিংবা শেষের তিন মাসে এ-রোগ আত্মপ্রকাশ করে। তবে রোগ যেখানে গুরুতর আকার নেয় সেখানে, বিশেষ করে প্রসূতির গর্ভে যমজ সন্তান থাকলে, ওই সময়ের আগেও রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

এ-রোগের লক্ষণ নিম্নরূপ: শরীরে রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোষসমষ্টিতে অতিরিক্ত জল জমে গিয়ে হাতে-পায়ে শোথ দেখা দেওয়া, মুখ ভারী হয়ে ওঠা। আর এরই সঙ্গে সাধারণত দেখা দেয় মাথাধরা ও জ্বরভাব। রোগ মারাত্মকরকম বেড়ে উঠলে পাকস্থলীর মধ্যে কেউ যেন মাংস কুরে খাচ্ছে এই ধরনের একটা যন্ত্রণা হতে থাকে ও এমন কি রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম পর্যন্ত ঘটে।

চিকিৎসা না করালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই রোগ থেকে এক্ল্যাম্পসিয়া (আক্ষেপ বা খিঁচুনি) পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

'এক্‌ল্যাম্পসিয়া' একটি গ্রীক শব্দ ; এর অর্থ 'বজ্রপাত'। আক্ষেপ বা খিঁচুনি যখন দেখা দেয় তখন তা একেবারে আচমকা—ঠিক বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই—দেখা দেয়। এই উপসর্গ দেখা দিলে একাধারে প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েরই জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে। তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, রোগের এতদূর বাড়াবাড়ি মোটেই সচরাচর দেখা যায় না—যদিও গর্ভাবস্থায় হাত-পা ফোলা একটি অতি সাধারণ উপসর্গ।

রক্তদূষিত-রোগ সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরীব-ঘরেই ঘটতে দেখা যায়। এ যেন বিশেষ করে গরীবদেরই রোগ। তবে রোগের উৎপত্তির মতো এ-ব্যাপারের কারণটিও এখনো পর্যন্ত চিকিৎসা-বিৎদের অজানা। অপুষ্টিকর খাদ্য, বিশেষ করে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য কিংবা প্রোটিনের অভাব, নাকি সাধারণভাবে দারিদ্র্যজনিত অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পরিবেশ এর কারণ—তা এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার প্রসূতিদের মধ্যে রক্তদূষিত রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম।

রক্তদূষিত রোগ-প্রসঙ্গে একটা কথা খেয়াল রাখবেন। স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার অনেক সাধারণ উপসর্গের সঙ্গে এ-রোগেব বহু উপসর্গের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। অতএব, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সামান্য একটু মাথা ধরলে অতিরিক্তরকম ভয় পাবেন না, অ্যাস্‌পিরিন বা ওই জাতীয় কোনো ওষুধ খেয়ে বরং মাথা ধরার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করবেন। গর্ভাবস্থার শেষের দু-মাসে পায়ের গোড়ালি অল্পস্বল্প ফুললেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অবশ্য এ-সব উপসর্গ দেখা দিলে আপনার ডাক্তারবাবুকে সে-কথা আপনি নিশ্চয়ই জানাবেন। প্রয়োজন হলে ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখবেন আপনার শরীরে রক্তদুষ্টি-রোগের অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যায় কিনা।

যদি জানা যায় যে প্রসূতির শরীরে সত্যিই রক্তদূষিত রোগ দেখা

দিয়েছে তাহলে অবশ্য বিশেষ সতর্ক চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। এরকম ক্ষেত্রে বিশ্রাম—কার্যত, পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে বিশ্রাম গ্রহণই—সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বিশেষ করে গর্ভস্থ শিশু যদি এত অপরিণত ও অপুষ্ট থেকে থাকে যে রোগের আক্রমণের ফলে তার পক্ষে বাঁচা দুষ্কর হয়ে ওঠার ভয় থাকে, তাহলে তো শয্যাশায়ী হয়ে থাকা ছাড়া প্রসূতির পক্ষে আর কোনো গত্যন্তর নেই। অতি সাবধানে ওষুধ ব্যবহার করতে পারলে অবশ্য ওষুধের সাহায্যে প্রসূতির উচ্চ রক্তচাপ কমানো যেতে পারে এবং এর ফলে আক্ষেপ বা খিঁচুনির মতো বাড়াবাড়ি হয়তো বা এড়িয়ে যাওয়া যায়।

রোগের বাড়াবাড়ি যদি এ-পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে তার ফলে ভাবী মায়ের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে ওঠে, তাহলে প্রয়োজনমতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুর জীবনের আশা ত্যাগ করে কৃত্রিম উপায়ে প্রসূতির গর্ভপাত ঘটানোর ব্যবস্থাও করতে হয়। তাছাড়া, রোগ খুব বেশি গুরুতর আকার ধরলে গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি ভেবেও বিশেষ লাভ নেই, কেননা রক্তদূষিত রোগ এমনিতেই শিশুর বাঁচার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেয়। তবে গর্ভস্থ শিশু যদি ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিণত ও পুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে প্রসূতির প্রসব-বেদনা সৃষ্টি করে কিংবা সীজারিয়ন অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত।

দীর্ঘদিন ধরে বিনা-চিকিৎসায় রক্তদুষ্টি-রোগ ভোগ না করলে সাধারণত সন্তানপ্রসবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এ-রোগের উপসর্গগুলি শরীর থেকে লোপ পায়। তবে উচ্চ রক্তচাপ এর পরেও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতির শরীরে বর্তমান থাকতে পারে।

ওটোস্‌ক্লেরোসিস বা বধিরতা— এ-রোগে সাধারণত দুই কানেই বধিরতা দেখা দেয়। কানের মধ্যে এমন কতগুলি ছোট ছোট হাড় আছে যেগুলি কানের পর্দা থেকে স্নায়ুমণ্ডলীতে শব্দতরঙ্গ চালনার বাহন। এই হাড়গুলি ক্রমশ পুরু হয়ে পরস্পরের গায়ে জুড়ে গেলে

'একল্যাম্পসিয়া' একটি গ্রীক শব্দ ; এর অর্থ 'বজ্রপাত'। আক্ষেপ বা খিঁচুনি যখন দেখা দেয় তখন তা একেবারে আচমকা—ঠিক বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই—দেখা দেয়। এই উপসর্গ দেখা দিলে একাধারে প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়েরই জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে। তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, রোগের এতদূর বাড়াবাড়ি মোটেই সচরাচর দেখা যায় না—যদিও গর্ভাবস্থায় হাত-পা ফোলা একটি অতি সাধারণ উপসর্গ।

রক্তদূষিত-রোগ সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরীব-ঘরেই ঘটতে দেখা যায়। এ যেন বিশেষ করে গরীবদেরই রোগ। তবে রোগের উৎপত্তির মতো এ-ব্যাপারের কারণটিও এখনো পর্যন্ত চিকিৎসা-বিদের অজানা। অপুষ্টিকর খাদ্য, বিশেষ করে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য কিংবা প্রোটিনের অভাব, নাকি সাধারণভাবে দারিদ্র্যজনিত অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পরিবেশ এর কারণ —তা এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার প্রসূতিদের মধ্যে রক্তদূষিত রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম।

রক্তদূষিত রোগ-প্রসঙ্গে একটা কথা খেয়াল রাখবেন। স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার অনেক সাধারণ উপসর্গের সঙ্গে এ-রোগের বহু উপসর্গের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। অতএব, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সামান্য একটু মাথা ধরলে অতিরিক্তরকম ভয় পাবেন না, অ্যাস্‌পিরিন বা ওই জাতীয় কোনো ওষুধ খেয়ে বরং মাথা ধরার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করবেন। গর্ভাবস্থার শেষের দু-মাসে পায়ের গোড়ালি অল্পস্বল্প ফুললেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অবশ্য এ-সব উপসর্গ দেখা দিলে আপনার ডাক্তারবাবুকে সে-কথা আপনি নিশ্চয়ই জানাবেন। প্রয়োজন হলে ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখবেন আপনার শরীরে রক্তদুষ্টি-রোগের অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যায় কিনা।

যদি জানা যায় যে প্রসূতির শরীরে সত্যিই রক্তদূষিত রোগ দেখা

দিয়েছে তাহলে অবশ্য বিশেষ সতর্ক চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। এরকম ক্ষেত্রে বিশ্রাম—কার্যত, পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে বিশ্রাম গ্রহণই—সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বিশেষ করে গর্ভস্থ শিশু যদি এত অপরিণত ও অপুষ্ট থেকে থাকে যে রোগের আক্রমণের ফলে তার পক্ষে বাঁচা দুষ্কর হয়ে ওঠার ভয় থাকে, তাহলে তো শয্যাশায়ী হয়ে থাকা ছাড়া প্রসূতির পক্ষে আর কোনো গত্যন্তর নেই। অতি সাবধানে ওষুধ ব্যবহার করতে পারলে অবশ্য ওষুধের সাহায্যে প্রসূতির উচ্চ রক্তচাপ কমানো যেতে পারে এবং এর ফলে আক্ষেপ বা খিঁচুনির মতো বাড়াবাড়ি হয়তো বা এড়িয়ে যাওয়া যায়।

রোগের বাড়াবাড়ি যদি এ-পর্যায়ে গিয়ে পৌছয় যে তার ফলে ভাবী মায়ের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে ওঠে, তাহলে প্রয়োজনমতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুর জীবনের আশা ত্যাগ করে কৃত্রিম উপায়ে প্রসূতির গর্ভপাত ঘটানোর ব্যবস্থাও করতে হয়। তাছাড়া, রোগ খুব বেশি গুরুতর আকার ধরলে গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি ভেবেও বিশেষ লাভ নেই, কেননা রক্তদূষিত রোগ এমনিতেই শিশুর বাঁচার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেয়। তবে গর্ভস্থ শিশু যদি ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিণত ও পুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে প্রসূতির প্রসব-বেদনা সৃষ্টি করে কিংবা সীজারিয়ন অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তাকে বাচাবার চেষ্টা করা উচিত।

দীর্ঘদিন ধরে বিনা-চিকিৎসায় রক্তদুষ্টি-রোগ ভোগ না করলে সাধারণত সন্তানপ্রসবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এ-রোগের উপসর্গগুলি শরীর থেকে লোপ পায়। তবে উচ্চ রক্তচাপ এর পরেও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতির শরীরে বর্তমান থাকতে পারে।

ওটোসক্লেরোসিস বা বধিরতা—এ-রোগে সাধারণত দুই কানেই বধিরতা দেখা দেয়। কানের মধ্যে এমন কতগুলি ছোট ছোট হাড় আছে যেগুলি কানের পর্দা থেকে স্নায়ুমণ্ডলীতে শব্দতরঙ্গ চালনার বাহন। এই হাড়গুলি ক্রমশ পুরু হয়ে পরস্পরের গায়ে জুড়ে গেলে

ওটোস্ক্লেরোসিস-রোগ দেখা দেয়।

এ-রোগের উৎপত্তির কারণ এখনো অজ্ঞাত। এর চিকিৎসাও বধিরতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। খুব সম্প্রতি বিদেশে এ-রোগের এক ধরনের অস্ত্র-চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে, সে-চিকিৎসার নাম "ফেনেস্ট্রেশন"।

যদি কোনো মেয়ের গর্ভাবস্থার আগেই এই ধরনের বধিরতা-রোগ দেখা দিয়ে থাকে তো তাঁর পক্ষে জেনে রাখা ভালো যে গর্ভাবস্থায় তাঁর বধিরতা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

সাত | স্তন্যদান বাঞ্ছনীয় কিনা

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নবজাত সন্তানকে মাতৃস্তন্যদান বাঞ্ছনীয় কিনা এ নিয়ে বিদেশের ধাত্রীবিৎ ও শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। অল্প কিছুকাল আগে ইওরোপ ও আমেরিকায়ও অবশ্য নবজাত শিশুকে মাতৃস্তন্যদান ছিল সাধারণ রেওয়াজ। আমাদের দেশে এখনও এ-প্রথা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও প্রায় সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে—(১) নবজাত সন্তানকে স্তন্যদান করে পালন করার ব্যাপারে প্রসূতির যদি আন্তরিক প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা থাকে, এবং (২) শিশুকে জন্মের পর অন্ততপক্ষে তিন মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাইয়ে (অর্থাৎ, অন্য কোনো বোতলের দুধ-জাতীয় জিনিস না ব্যবহার করে) পালন করার মতো যথেষ্ট দুধ যদি প্রসূতির বুকে সঞ্চিত থাকে তাহলে এর চেয়ে আদর্শ ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। কেননা, এ-কথা তো মিথ্যে নয় যে মা কর্তৃক শিশুকে স্তন্যদান একটি অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা। এবং, আমরা জানি, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এই প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পন্থা। শুধু তাই নয়, নবজাত শিশুকে এইভাবে পালন করা প্রসূতির পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্যও বটে। কেননা কৃত্রিম বোতলজাত দুধে শিশুপালন করতে হলে প্রসূতিকে পরিশ্রম ও অর্থের দিক থেকে বেশ হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ইওরোপ ইত্যাদি দেশে হাওয়া অনেক বদলে গেছে; হাওয়া আমাদের দেশেও বদলাচ্ছে। তাছাড়া, রুচি, দেহসৌষ্ঠব রক্ষা কিংবা নিছক ফ্যাশনের প্রশ্ন বাদ দিলেও, বহু প্রসূতির স্তনের ত্রুটিপূর্ণ গঠন, বুকে সন্তানপালনের উপযোগী দুধের অভাব এবং সন্তানকে

স্তন্যদান করতে গিয়ে প্রসূতির স্তন পেকে ওঠার ভয়, ইত্যাদি কারণেও স্তন্যদান ব্যাপারটি নিয়ে নানা মতান্তর পাকিয়ে উঠেছে। তদুপরি, আজকাল আগের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের বোতলজাত গুঁড়ো দুধও শিশুর খাদ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ফলে ডাক্তাররাও এখন আর মা বা ভাড়া-করা ধাত্রীর বুকের দুধই শিশুর এক .এবং অদ্বিতীয় খাদ্য বলে মনে করছেন না, প্রয়োজনমতো বোতলজাত দুধ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা দিচ্ছেন।

সন্তানকে স্তন্যদান করা না-করা সম্পর্কে এই বিতর্কের তিনটি দিক আছে : (১) নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব, (২) মায়ের শরীরের ওপর এর ফলাফল, এবং (৩) মা ও শিশুর পারস্পরিক মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ওপর এর প্রভাব।

নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর মায়ের বুকের দুধ খাওয়া বা না-খাওয়ার ফলাফল কি তা এক কথায় বলা মুশকিল। ইওরোপ ইত্যাদি দেশে, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলিতে, শতকরা প্রায় ৮০-৯০টি শিশু নিছক কৃত্রিম বোতলজাত দুধের ওপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও সে-দেশের শিশু-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশুদ্ধ কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর ফলাফল যে খারাপ এ-সম্পর্কে তাঁরা কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাননি। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এ-কথাও বলছেন যে খুব শৈশবে নবজাতককে মাতৃদেহের বাইরের প্রোটিন (foreign protein)-জাতীয় খাদ্য—যেমন, ধরুন, গোরুর দুধ—দিলে পরবর্তী জীবনে তার ফলে শিশুর নানা ধরনের অ্যালার্জি-উপসর্গ দেখা দিতে পারে এমন প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাছাড়া সহজ বুদ্ধিতেও বোঝা যায় যে মাতৃস্তন্যপানের একটা বড় সুবিধা এই যে মায়ের বুকের দুধ সব সময়েই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ফলে স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশুর পেটের গণ্ডগোল ও আন্ত্রিক রোগের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে বলে মনে হয়। যাই হোক, এ-ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত শেষ কথা বলা শক্ত। তবে এ-প্রসঙ্গে একটা কথা। উপরোক্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতামতের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা যে সর্বত্র

পুরোপুরি খাপ খায়, তা কিন্তু নয়। বর্তমানে উপরোক্ত বিদেশী ওষুধবিষুধ ও কৃত্রিম খাদ্য ইত্যাদি আমাদের দেশে যে পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য কিংবা চড়া দামে বাজারে বিকোয় এবং শিশু ও রোগী-নির্বিশেষে আমাদের সকলের দেশী খাদ্যে ভেজাল যেরকম সর্বব্যাপী তাতে নবজাত শিশুকে বাজারের অপেক্ষাকৃত সস্তাদামের কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর ফলাফল যে খারাপ নয় এ-সম্পর্কে আমরা বোধহয় এতটা নিশ্চিত হতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, মাতৃস্তন্যদানের সঙ্গে মা ও শিশুর পারস্পরিক মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারটি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে শুধু এইটুকু বলা চলে, অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা স্তন্যদান সম্ভব হলে তার ফলে মায়ের সঙ্গে শিশুর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুবিধা হয়।

তৃতীয়ত, মায়ের শরীরের ওপর স্তন্যদানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যাক। স্তন্যদানের স্বপক্ষে একটা যুক্তি এই দেখানো হয়ে থাকে যে এর ফলে সদ্য-প্রসূতির জরায়ু ক্রমশ শুকোতে থাকে এবং তাঁর বস্তি-প্রদেশের অন্যান্য আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শিশু স্তন্যপান করলে তার ফলে প্রসূতির জরায়ু যে সংকুচিত হয়—এটি একটি পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু সেই সংকোচন সত্যিসত্যিই জরায়ুকে 'শুকোতে' সাহায্য করে কিনা তা প্রমাণ করা শক্ত। বরং প্রসবের পর নারীর জননতন্ত্রে রোগের সংক্রমণ না হয়ে থাকলে কিংবা প্লাসেণ্টা বা 'ফুল'-এর অংশবিশেষ জরায়ুর মধ্যে রয়ে না গেলে, শিশুকে স্তন্যদান করা হোক বা না হোক, প্রসূতির জরায়ু আপনা থেকেই ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

উল্টোদিকে, স্তন্যদানের বিপক্ষে এই যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে এর ফলে প্রসূতির স্তন পেকে ওঠার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, স্তনে রোগ-বীজাণুর সংক্রমণ ঘটবার সম্ভাবনা। এটা অবশ্য সত্যি যে যে-সব প্রসূতি শিশুকে স্তন্যদান করেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু

স্তন্যদান করতে গিয়ে প্রসূতির স্তন পেকে ওঠার ভয়, ইত্যাদি কারণেও স্তন্যদান ব্যাপারটি নিয়ে নানা মতান্তর পাকিয়ে উঠেছে। তদুপরি, আজকাল আগের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের বোতলজাত গুঁড়ো দুধও শিশুর খাদ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ফলে ডাক্তাররাও এখন আর মা বা ভাড়া-করা ধাত্রীর বুকের দুধই শিশুর এক .এবং অদ্বিতীয় খাদ্য বলে মনে করছেন না, প্রয়োজনমতো বোতলজাত দুধ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা দিচ্ছেন।

সন্তানকে স্তন্যদান করা না-করা সম্পর্কে এই বিতর্কের তিনটি দিক আছে: (১) নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব, (২) মায়ের শরীরের ওপর এর ফলাফল, এবং (৩) মা ও শিশুর পারস্পরিক মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ওপর এর প্রভাব।

নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর মায়ের বুকের দুধ খাওয়া বা না-খাওয়ার ফলাফল কি তা এক কথায় বলা মুশকিল। ইওরোপ ইত্যাদি দেশে, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলিতে, শতকরা প্রায় ৮০-৯০টি শিশু নিছক কৃত্রিম বোতলজাত দুধের ওপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও সে-দেশের শিশু-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশুদ্ধ কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর ফলাফল যে খারাপ এ-সম্পর্কে তাঁরা কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাননি। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এ-কথাও বলছেন যে খুব শৈশবে নবজাতককে মাতৃদেহের বাইরের প্রোটিন (foreign protein)-জাতীয় খাদ্য—যেমন, ধরুন, গোরুর দুধ—দিলে পরবর্তী জীবনে তার ফলে শিশুর নানা ধরনের অ্যালার্জি-উপসর্গ দেখা দিতে পারে এমন প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাছাড়া সহজ বুদ্ধিতেও বোঝা যায় যে মাতৃস্তন্যপানের একটা বড় সুবিধা এই যে মায়ের বুকের দুধ সব সময়েই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ফলে স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশুর পেটের গণ্ডগোল ও আন্ত্রিক রোগের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে বলে মনে হয়। যাই হোক, এ-ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত শেষ কথা বলা শক্ত। তবে এ-প্রসঙ্গে একটা কথা। উপরোক্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতামতের সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা যে সর্বত্র

পুরোপুরি খাপ খায়, তা কিন্তু নয়। বর্তমানে উপরোক্ত বিদেশী ওষুধবিষুধ ও কৃত্রিম খাদ্য ইত্যাদি আমাদের দেশে যে পরিমাণে দুষ্প্রাপ্য কিংবা চড়া দামে বাজারে বিকোয় এবং শিশু ও রোগী-নির্বিশেষে আমাদের সকলের দেশী খাদ্যে ভেজাল যেরকম সর্বব্যাপী তাতে নবজাত শিশুকে বাজারের অপেক্ষাকৃত সস্তাদামের কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর ফলাফল যে খারাপ নয় এ-সম্পর্কে আমরা বোধহয় এতটা নিশ্চিত হতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, মাতৃস্তন্যদানের সঙ্গে মা ও শিশুর পারস্পরিক মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারটি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে শুধু এইটুকু বলা চলে, অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা স্তন্যদান সম্ভব হলে তার ফলে মায়ের সঙ্গে শিশুর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুবিধা হয়।

তৃতীয়ত, মায়ের শরীরের ওপর স্তন্যদানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যাক। স্তন্যদানের স্বপক্ষে একটা যুক্তি এই দেখানো হয়ে থাকে যে এর ফলে সদ্য-প্রসূতির জরায়ু ক্রমশ শুকোতে থাকে এবং তাঁর বস্তি-প্রদেশের অন্যান্য আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শিশু স্তন্যপান করলে তার ফলে প্রসূতির জরায়ু যে সংকুচিত হয়—এটি একটি পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু সেই সংকোচন সত্যিসত্যিই জরায়ুকে 'শুকোতে' সাহায্য করে কিনা তা প্রমাণ করা শক্ত। বরং প্রসবের পর নারীর জননতন্ত্রে রোগের সংক্রমণ না হয়ে থাকলে কিংবা প্লাসেণ্টা বা 'ফুল'-এর অংশবিশেষ জরায়ুর মধ্যে রয়ে না গেলে, শিশুকে স্তন্যদান করা হোক বা না হোক, প্রসূতির জরায়ু আপনা থেকেই ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

উল্টোদিকে, স্তন্যদানের বিপক্ষে এই যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে এর ফলে প্রসূতির স্তন পেকে ওঠার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, স্তনে রোগ-বীজাণুর সংক্রমণ ঘটবার সম্ভাবনা। এটা অবশ্য সত্যি যে যে-সব প্রসূতি শিশুকে স্তন্যদান করেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু

সংখ্যকের স্তনাগ্র ফাটতে দেখা যায়। ফলে রোগ-বীজাণুর সংক্রমণ ঘটে এবং যন্ত্রণা, জ্বর ও কখনো কখনো স্তনে ফোড়া পেকে উঠতেও দেখা যায়। তখন স্তন্যদান বন্ধ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। অবশ্য স্তন্যদানরত প্রসূতির স্তন পেকে ওঠার এ সমস্যাটি শুধু একালের নয়, এটি চিরকালের। এমন কি অসুখের কারণ হিসেবে রোগ-বীজাণুর আবিষ্কারেরও আগে (আমাদের এ দেশে আজ পর্যন্তও) স্তনে তথাকথিত 'দুধ জমে যাওয়া'-কে স্তন পাকার কারণ হিসেবে বলা হত। আসলে কিন্তু স্তনে শুধুমাত্র দুধ জমে যাওয়াব জন্যেই এই জ্বর, যন্ত্রণা ইত্যাদি হয় না—স্তনের দুগ্ধনলীগুলিতে রোগ-বীজাণুর সংক্রমণের জন্যই মূলত এ-সব ঘটে থাকে।

কিন্তু যদি আপনি সন্তানকে স্তন্যদান করবেন বলে সত্যিই মনস্থ করে থাকেন তাহলে এই বিরুদ্ধ-যুক্তি শুনে, স্তন পাকার ভয়ে কিছুতেই অতিমাত্রায় বিচলিত হবেন না। সন্তানের জন্যে এই সামান্য বিপদেব ঝুঁকি আপনাকে নিতে হবে, এই সামান্য কষ্ট-টুকু স্বীকার করতেই হবে। সন্তান গর্ভে ধারণ করা এবং জন্মের পর তাকে পালন কবাব ঝামেলা তো শতেক, তাই বলে কি আপনি সন্তানবহন কবা থেকে বিরত হবেন? তাছাড়া, এ প্রসঙ্গে এও জেনে রাখা ভালো যে এই ধরনের স্তন পেকে-ওঠা থেকে ভবিষ্যতে স্তনে ক্যান্সার রোগ দেখা দেয় বলে যে-ধারণাটি কিছু লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে আসলে সেটি একেবারেই ভিত্তিহীন।

তবে, শুধুমাত্র সন্তানকে স্তন্যদান করার সাধু সংকল্পটুকুই আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দেখা দরকার—(১) আপনার স্তনের গঠন স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক বা ত্রুটিপূর্ণ, এবং (২) জন্মের পর আপনার সন্তানকে কমপক্ষে অন্তত তিন মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাইয়ে রাখার মতো পর্যাপ্ত দুধ আপনার স্তনে আছে কিনা। প্রথমত, 'স্তনের গঠন' বলতে নিছক প্রসূতির স্তনের আকার বোঝায় না।

স্তন স্বাভাবিক বড় হলেও অন্যান্য নানাবিধ অপূর্ণতা বা ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। অবশ্য যে প্রসূতির স্তন এমনিতেই উপযুক্ত রকম বিকশিত নয়—স্তনাগ্র দুটি নিতান্ত ছোট, কি ভেতরে-ঢোকানো, কিংবা উত্তেজিত হলে যথেষ্ট শক্ত ও খাড়া হয় না ফলে শিশুর পক্ষে সহজে স্তন্যপান করাই সম্ভব হয় না—তাঁর পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও নবজাত শিশুকে স্তন্যদান করা রীতিমতো অসুবিধাজনক ও কষ্টকর। তেমনি প্রসূতির বুকে যদি শিশুর অন্তত তিন মাসের খাদ্য সরবরাহের আয়োজন না থাকে অথচ তা সত্ত্বেও তিনি সন্তানকে স্তন্যদান শুরু করেন, তাহলে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে সেই বোতলজাত কৃত্রিম দুধের আয়োজনেই ব্যস্ত হতে হবে। এমন কি, বুকে শুধু পর্যাপ্ত দুধ থাকলেই চলবে না, প্রসূতিকে তাঁর শিশুকে স্তন থেকে নিঃশেষে দুধ শুষে নেওয়ার কৌশলটিও ধৈর্য ধরে শেখাতে হবে। প্রতিবার খাওয়ার সময় শিশুকে জাগিয়ে রাখতে হবে যাতে সে নিঃশেষে সবটুকু দুধ শুষে নিতে পারে। এ না হলে, প্রতিবারই অল্প-বিস্তর দুধ বুকে জমে থাকলে, স্তনে ক্রমশই কম-কম দুধ তৈরি হবে এবং ক্রমে শিশুর পরিশ্রমই সার হয়ে দাঁড়াবে, শিশু ক্লান্ত হয়ে পড়বে অথচ তার পেট ভরবে না। ফলে শিশুর অপূর্ণ ক্ষুধা প্রসূতিকে বাড়তি কৃত্রিম দুধ দিয়ে মেটাতে হবে এবং এই দুই রকম ব্যবস্থা একই সঙ্গে চালাতে গিয়ে প্রসূতিকে অনেক বেশি ঝামেলায় পড়তে হবে।

পরিশেষে, সমস্ত প্রসূতির কাছে নিবেদন এই যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁরা সকলেই যদি অন্তত সপ্তাহ দুয়েকের জন্যে সন্তানকে স্তন্য-দান করবার দায়িত্ব নেন তো খুব ভালো হয়। কেননা, তাহলে ওই সময়ের মধ্যেই ডাক্তারবাবুর পক্ষে স্থির করা সম্ভব হবে, কোন্ কোন্ প্রসূতির বুকে দুধের সরবরাহ অব্যাহত থাকবে (অর্থাৎ সন্তানকে স্তন্যদান করা সম্ভব হবে) আর কাদেরই বা কৃত্রিম বোতল-জাত দুধের সাহায্য নিতে হবে। কেবলমাত্র যে সমস্ত প্রসূতির স্তনাগ্র অপরিণত, কিংবা ফাটা, কিংবা যাঁদের স্তন পেকে উঠবে

তাঁদের পক্ষে সন্তানকে স্তন্যদানের এই পরীক্ষায় যোগ না দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্তনাগ্রের ঢাকনি বা চুষি—বিদেশে, যে-সব প্রসূতির স্তনাগ্র অপরিণত কিংবা ফাটা তাঁরা যাতে সন্তানকে স্তন্যদান করতে পারেন তার সুবিধার জন্যে এক ধরনের রবারের চুষি-লাগানো কাচের ঢাকনি ব্যবহার করা হয়। এই রবারের চুষিটি শিশুদের 'ফিডিং বট্‌ল্'-এর চুষির মতোই দেখতে লাগে। কাচের ঢাকনিটা প্রসূতির স্তনের ওপর সেঁটে দেওয়া হয়। শিশু এই ঢাকনিতে লাগানো রবারের চুষিটি চুষলে মায়ের বুক থেকে দুধ বেরিয়ে আসে। এইভাবে ফাটা স্তনাগ্রের সঙ্গে শিশুর ঠোঁটের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এড়ানো হয়। তবে, সাধারণত, এই ঢাকনির সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরে স্তন্যদান করা সম্ভব হয় না।

স্তনাগ্রের যত্ন—এ-সম্পর্কে ইতিপূর্বে চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'স্তনাগ্রের যত্ন' নামের এই একই শিরোনামায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে বাহুল্যবোধে এখানে পুনরুক্তি করা থেকে বিরত থাকা গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

জন্মকথা

এক | প্রথম সংকেত

আপনার প্রসববেদনা শুরু হবে কখন? অর্থাৎ, কখন আপনার গর্ভকাল পূর্ণ হবে?—ইতিপূর্বে এ-বইয়ের প্রথম খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'গর্ভধারণকালের স্থায়িত্ব' নামের শিরোনামায় পূর্ণ গর্ভকালের একটা আনুমানিক হিসেব দেওয়া হয়েছে। গর্ভসঞ্চারের পর প্রথমবার ডাক্তার দেখাতে গেলে ডাক্তারবাবু ওই হিসেব অনুযায়ী আপনাকে সন্তানপ্রসবের একটা আনুমানিক তারিখ বলে দেবেন। তারিখটি আনুমানিক এইজন্যে যে প্রথমত, এ হিসেব মোটামুটি তাঁদের পক্ষেই প্রযোজ্য যে-সব মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাব স্বাভাবিক সময়ে নিয়মিতভাবে (অর্থাৎ মোটের ওপর চার সপ্তাহের ব্যবধানে) ঘটে থাকে। কিন্তু যাঁদের ঋতুস্রাব ওই সময়ের চেয়ে দুই কি এক সপ্তাহ আগে কিংবা পরে ঘটে, কিংবা অনিয়মিতভাবে ঘটে (অর্থাৎ সময় নির্দিষ্ট থাকে না কিংবা মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে), কিংবা যে-মেয়ের গর্ভসঞ্চাবের পরেও মাসিক স্রাবের সম্ভাব্য সময়ে এক-আধবার এমনভাবে স্রাব হয় যাতে তা প্রায়-স্বাভাবিক ঋতুস্রাব বলে ভ্রম হয়- সেই সব বিশেষ ক্ষেত্রে ওই উপরোক্ত হিসেবের অদলবদল ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিংবা হিসেবের একেবারে গরমিল ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। দ্বিতীয়ত, যে-সব মেয়ের ঋতুস্রাব নিয়মিতভাবে চার সপ্তাহের ব্যবধানে ঘটে থাকে এমন কি তাঁদের ক্ষেত্রেও ওই সময়-নির্ঘণ্ট সর্বত্র একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মেলে না। বরং এই সব প্রসূতির শতকরা ৮০ জনের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট তারিখটি বাদ দিয়ে তার দশ দিন আগে থেকে দশ দিন পরেকার মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। এক কথায় বলতে গেলে, আপনার মাসিক ঋতুস্রাব যতই স্বাভাবিক ও নিয়মিত ঘটুক না কেন এবং যতই

সঠিকভাবে গর্ভসঞ্চারের বিশেষ তারিখটি আপনি ধরতে পারুন না কেন, আপনার শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুভ দিনটি আগে থেকে ঘড়ি ধরে বলতে পারা ভূ-ভারতে কারো পক্ষে সম্ভব নয়, বড় জোর আনুমানিক একটা সময় নির্দেশ করা চলে মাত্র।
কিন্তু আপনার প্রসববেদনা শুরু হবে কী ভাবে? সেটা কি আগে থাকতে বলে দেওয়া যায়?— না। তাও যায় না। আগে থেকে ঘড়ি ধরে প্রসববেদনা কবে শুরু হবে যেমন বলা যায় না, তেমনি বেদনা আপনার বেলায় কী পদ্ধতিতে শুরু হবে তাও আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।

প্রসবের আগে পেশী-সংকোচন বা পেশীতে টান-ধরা—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শেষ কয়েক মাস ধরে মাঝে মাঝে মনে হবে যেন হঠাৎ-হঠাৎ আপনার জরায়ু গুটিয়ে যাচ্ছে, সারা পেটটাই আপনার যেন শক্ত হয়ে উঠছে। চলতি কথায় একেই বলে 'টান-ধরা'। প্রসব-বেদনার দিন যতই ঘনিয়ে আসবে, এই পেশী-সংকোচন বা পেশীতে টান-ধরা ততই হয়তো এত জোরালো হয়ে উঠবে যে আপনি ওই টান-ধরার সঙ্গে খিল-ধরার মতো ঘিনঘিনে একটা বেদনাও অনুভব করবেন। এই শেষোক্ত অনুভূতি সব প্রসূতি যে পেটের একই জায়গায় বোধ করেন তা নয়। কেউ এটা অনুভব করেন পেটের নিচের দিকে মূত্রথলির কাছাকাছি জায়গাটায়, কেউ-বা পিছন দিকে শিরদাঁড়ার একেবারে নিচের অংশে নিতম্বপ্রদেশে, আবার কেউ-বা অনুভব করেন যেন একটা ফিক-ব্যথা কুঁচকির কাছে শুরু হয়ে দুই উরু বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।
আসল প্রদববেদনা শুরু হওয়ার ঠিক আগের কয়েক দিনে এই ধরনের মৃদু টান-ধরা ও ঘিনঘিনে ব্যথা অনেক সময় নিত্যনিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরকম ক্ষেত্রে কতক্ষণ পর পর এই বেদনাটা ফিরে আসছে যদি কেউ ঘড়ি ধরে তা ঠিক করার চেষ্টা করেন তো দেখবেন সময়টা আধ ঘণ্টাও হতে পারে আবার মাত্র দশ মিনিট হতেও বাধা

নেই। তবে একে খাঁটি প্রসববেদনা বলে ভুল করা উচিত নয়। কেননা এই ধরনের টান-ধরা ঠিক যন্ত্রণা নয়, বিশেষ কোনো যন্ত্রণা অনুভব না করাই বরং এর বিশেষত্ব। তবে কোনো কোনো সময়ে একসঙ্গে একাধিক জায়গায় কিংবা বেশ জোরে টান ধরার জন্য খানিকটা বেদনা বোধ করাও আশ্চর্য নয়।

পেশীর এই সংকোচন বা টান-ধরার কারণ কি?—এর উদ্দেশ্য, প্রসূতির জরায়ুর নিম্নাংশকে সন্তানপ্রসবের জন্যে আগে থাকতে তৈরি করা। গর্ভাবস্থার শেষ কয়েক সপ্তাহে জরায়ুর একেবারে নিম্নাংশ বা জরায়ু-মুখ আগের চেয়ে অনেক বেশি পাতলা হয়ে যায় এবং মুখটা খুব অল্পে অল্পে খুলতে শুরু করে। এছাড়া, জরায়ুর সমগ্র নিম্নাংশটিই লম্বাটে ধাঁচের হয়ে ওঠে ও আগের চেয়ে পাতলা হয়ে যায়। এর ফলে, জরায়ুর পেশী সংকুচিত হতে থাকলে তার চাপ গর্ভস্থ শিশুর শরীরে চারিদিক থেকে সমানভাবে না পড়ে চাপটা শিশুর দেহে ওপর থেকে নিচের দিকে পড়তে থাকে। অর্থাৎ শিশুকে যেন কেউ ওপর থেকে নিচের দিকে ঠেলতে থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম : ধরুন একটা থলি বা বস্তার নিচের দিকটা যেন ফেঁসে গেছে কিংবা ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, আর কেউ-একজন ওপর দিক থেকে সেটাকে ঠেসে ধরে ভেতরকার পদার্থটিকে বের করার চেষ্টা করছে। যাই হোক পেশীর সংকোচন গর্ভস্থ শিশুর শরীরে ওপর এবং দুই পাশ এই তিন দিক থেকে চাপ দিতে থাকে, অথচ নিচের দিক বা জরায়ু-মুখ থেকে এর সম-পরিমাণ চাপ ওপর দিকে পড়ে না। ওপরকার এই তিন দিকের চাপের অর্থ হচ্ছে শিশুকে জরায়ু-মুখের ক্রমশ বেড়ে-ওঠা ফাঁকটার দিকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া। এর পর এই ফাঁকটি যথেষ্ট বড় হয়ে উঠলে গর্ভস্থ শিশু ওপরকার চাপ খেয়ে ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

প্রসবের আগেকার এই ধরনের পেশী-সংকোচনের ফলে প্রসূতি কী পরিমাণ অস্বস্তি বা অসুবিধা ভোগ করে থাকেন তা এক কথায় বলা

শক্ত। প্রসূতি-ভেদে এই কষ্টভোগের সাংঘাতিক তারতম্য হয়ে থাকে। মোট কথা, মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবের সময়কার অস্বস্তি বা কষ্টের সঙ্গে এর খুব-একটা নিকট-সম্পর্ক আছে। যে-মেয়ে সাধারণ সময়ে তাঁর মাসিক ঋতুস্রাবকালে কষ্ট পান (অর্থাৎ যাঁর দেহে জরায়ুর পেশী-সংকোচনের প্রতিক্রিয়া কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায়), অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এ-সময়ে তাঁর পক্ষে অন্য প্রসূতির চেয়ে বেশি কষ্ট পাবার কথা। উল্টোদিকে ঋতুস্রাবকালে যাঁর কষ্ট যত কম, এ সময়েও তিনি তত কম কষ্ট ভোগ করবেন।

নিশ্চিত প্রসববেদনা শুরু হওয়ার ঠিক কতদিন আগে এই প্রাথমিক পেশী-সংকোচন শুরু হবে অর্থাৎ প্রসবের আগে কতদিন ধরে পেশী-সংকোচনের পালা চলবে-- তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এমন কি, কোনো প্রসূতির দ্বিতীয়, তৃতীয় কি চতুর্থ গর্ভের বেলায়ও এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

প্রত্যেকটি প্রসূতির ক্ষেত্রেই প্রসববেদনাব বিশেষ নির্দিষ্ট সূচনা বলে যে কিছু থাকবে তাব কোনো মানে নেই। অনেক সময় জরায়ুর পেশীর এই সংকোচন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রীতিমতো জোরালো হয়ে উঠে ডাক্তার ডাকার তোড়জোড় করার আগেই ফের কমে যেতে পারে। ডাক্তারবাবু যদি এ-ধরনের জোরালো সংকোচনের আগে ও পরে প্রসূতিব জরায়ু-মুখ পরীক্ষা করার সুযোগ পান তাহলে তিনি-যে জরায়ু-মুখ আগের চেয়ে বেশি খুলেছে এবং জবায়ুর নিম্নাংশ বেশি পাতলা হয়েছে দেখবেন এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ এই দুটি লক্ষণ খাঁটি প্রসববেদনারই আনুষঙ্গিক উপসর্গ। তাহলে আসল প্রসববেদনার সঙ্গে এই ধরনেব জোরালো পেশী-সংকোচনের তফাতটা কী? তফাত এই মাত্র যে এ-ধরনের পেশী-সংকোচন কখনো স্থায়ী হয় না ও ক্রমাগত আনাগোনা করতে থাকে, আর আসল প্রসব-বেদনা হল একটি স্থায়ী যন্ত্রণাবোধ যার পরিণতি গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ায়।

ক্রমে প্রসববেদনার সময় যতই ঘনিয়ে আসে, জরায়ুর পেশী-

সংকোচনের ব্যাপারটি ততই একটি নিয়মিত ঘটনায় দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ, এই সংকোচন ও আনুষঙ্গিক অস্বস্তি সারাদিন ধরে বাঁধা সময়-মাফিক আনাগোনা করতে থাকে। এই অবস্থান্তর বা নতুন অবস্থাটি বুঝতে পারলে সম্ভবস্থলে আপনার ডাক্তারবাবুকে খবর দেবেন, কেননা এটি হল আসল প্রসববেদনা শুরু হওয়ার পূর্বাভাস। ডাক্তারবাবু এসে স্থির করবেন আপনাকে কখন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে। সাধারণত চিকিৎসকরা খাঁটি প্রসববেদনা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রসূতিকে হাসপাতালে স্থানান্তর করার পক্ষপাতী নন। তবে প্রসূতির বাড়ি থেকে হাসপাতালের অতিরিক্ত দূরত্ব কিংবা যানবাহনের অসুবিধা ইত্যাদি কারণে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি হয়তো তার আগেই স্থানান্তর করার কথা বলতে পারেন।

কিন্তু যে-সব প্রসূতির পক্ষে এই উপরোক্ত অবস্থান্তর লক্ষ্য করে ডাক্তারবাবুকে বাড়িতে ডাকা সম্ভব নয় (সঙ্গতির অভাবে আমাদের দেশের এক বৃহত্তম-সংখ্যক প্রসূতির ক্ষেত্রে এটি মর্মান্তিক সত্যি) তাঁরা এই সময়েই হাসপাতালে যাবার জন্যে তৈরি হতে পারেন। কেননা, সন্তানপ্রসবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উপযুক্ত সময়ের একটু পরে হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়ার একটু আগে সেখানে যাওয়া মন্দের ভালো।

শ্লেষ্মাপিণ্ড তাহলে দেখা যাচ্ছে, খাঁটি প্রসববেদনা শুরু হওয়ার একটি পূর্বশর্ত হল ক্রমশ বেশি-বেশি নিয়মিতভাবে যন্ত্রণা বোধ করা। এছাড়া এ-সময়ে আরো কয়েকটি উপসর্গও প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে একটি হল, শ্লেষ্মাপিণ্ডের নিষ্ক্রমণ। প্রসববেদনা শুরু হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে জরায়ুর 'কণ্ঠদেশ' বা জরায়ু-মুখের চারিধার যেমন পাতলা হয়ে আসে সেই সঙ্গে ওই জায়গা থেকে একটি শ্লেষ্মাপিণ্ড বা ঘন, আঠালো একরকম স্রাবও নির্গত হয়। এমনিতে এই স্রাব নির্গত হওয়ার যে বিশেষ কিছু তাৎপর্য আছে তা নয়। অনেক সময় সত্যিকার প্রসববেদনা শুরু হওয়ার বেশ কিছু দিন

আগেই এই স্রাব দেখা দেয়। তবে ওই উপরোক্ত নিয়মিত ঘিনঘিনে ব্যথার সঙ্গে এই উপসর্গটি দেখা দিলে তখন বুঝতে হবে আসল প্রসববেদনার সূচনা দেখা দিয়েছে।

রক্তের ছিটে—অনেক সময় উপরোক্ত শ্লেষ্মাপিণ্ডের মধ্যে রক্তের ছিটেও দেখতে পাওয়া যায়। যদি এই রক্তের ছিটের সঙ্গে আনুষঙ্গিক কোনো বেদনা-বোধ না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এর বিশেষ কোনো মানে নেই এবং তখন এ-নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার হবে না। বিশেষত এ-রকম ঘটনা ঘটবার ঠিক আগে প্রসূতি যদি ডাক্তারবাবুকে দিয়ে তাঁর আভ্যন্তরীণ কিংবা মলনালির পরীক্ষা করিয়ে এসে থাকেন তো কথাই নেই। একটা ব্যাপারে কেবল হুঁশিয়ার থাকবেন। এই রক্তের-ছিটে মেশানো শ্লেষ্মা-স্রাবের সঙ্গে তলপেটে ফিক-ব্যথার মতো যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকলে জানবেন এ-সমস্তই খাঁটি প্রসববেদনা শুরু হওয়ার লক্ষণ।

অ্যাম্‌নিয়টিক 'জলের থলি'—যোনিমুখ থেকে আচমকা পুরুষ-শুক্রবীজের গন্ধবিশিষ্ট স্বচ্ছ জল ভাঙতে দেখলে বুঝতে হবে জরায়ুর মধ্যেকার অ্যাম্‌নিয়টিক জলের থলির আবরণ ফেঁসে গেছে। আপনার গর্ভধারণকাল যদি পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তারপর এরকম ঘটনা ঘটলে প্রায়-নিশ্চিত জানবেন এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রসববেদনা শুরু হবে। কিন্তু পূর্ণ পরিণত গর্ভকালের আগেই যদি জল ভাঙতে শুরু করে তাহলে অবশ্য প্রসববেদনা শুরু হতে কয়েক দিন—এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত—বিলম্ব ঘটা আশ্চর্য নয়।

প্রসববেদনা বনাম ডাক্তারবাবু

উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গতি থাকলে এবং প্রয়োজন বোধ করলে প্রসূতি বা তাঁর বাড়ির লোক তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তারবাবুকে এ-সময়ে খবর দিতে

পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, ডাক্তারবাবুকে ঠিক কোন্ সময়ে খবর দেবেন? —তিনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত লোক। কাজেই প্রয়োজনের খুব বেশি আগে খবর দিয়ে তাঁকে আনিয়ে হয়রানি না করাই বাঞ্ছনীয়। ডাক্তারবাবুকে কোন্ সময়ে খবর দেওয়া দরকার সে-সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনার সূত্রপাত করেছি। এখানে তা নিয়ে আরো একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রসূতির জানা দরকার, জরায়ুর পেশী-সংকোচনজনিত ফিক-ব্যথার মতো সাময়িক ও স্বল্পস্থায়ী অস্বস্তি বা যন্ত্রণা বোধ করলে তার জন্যে ডাক্তার ডাকা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। কেননা, এ-ধরনের ব্যথা প্রায়শই আপনা থেকে কমে যায় এবং এ খাটি প্রসববেদনা নয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা চান, যোনিমুখ থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রক্তক্ষরণ শুরু হলে, কিংবা অ্যাম্নিয়টিক জলের থলি ফেঁসে রীতিমতো জল ভাঙতে থাকলে তবেই তাঁদের খবর দেওয়া হোক। কিংবা প্রসূতিব পেটের ঘিনঘিনে ব্যথা যখন সমান জোরালো ভাবে হতে থাকে এবং মাত্র মিনিট দশেকের ব্যবধানে (তার চেয়ে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে নয়) ফিরে ফিরে আসতে থাকে একমাত্র তখনই তাঁদের খবর দেওয়া পছন্দ করেন।

অবশ্য এর অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে মাঝরাত্রে পেটে মৃদু বেদনা অনুভব করলে আপনাকে কষ্ট করে জেগে থাকতে হবে এবং কতক্ষণ অন্তর বেদনা আনাগোনা করছে তার হিসেব রাখতে হবে। ওরকম বেদনা অনুভব করা সত্ত্বেও যদি আপনার ঘুম আসে তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। কেননা, তাহলে এটা নিশ্চিত যে ও-বেদনা প্রসববেদনা নয়।

তবে এ-পর্যন্ত যা বলা হল সে-সম্পর্কে আরো কিছু কথা আছে। মনে রাখবেন, এ-সব পরামর্শই কিন্তু সাধারণ স্বাভাবিক প্রসূতির, এবং বিশেষ করে প্রথম প্রসূতির, প্রসববেদনার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু এবার যদি আপনার দ্বিতীয়বারের গর্ভ হয় এবং আপনার প্রথম বারের প্রসববেদনা স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে কিংবা সেবারে অস্বাভাবিক

মৃদুভাবে বেদনা শুরু হয়ে আচমকা দ্রুত বেড়ে উঠে থাকে, তাহলে ওই উপরোক্ত পরামর্শ আপনার বেলায় খাটবে না জানবেন। এরকম ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক আগে—এমন কি প্রাথমিক পেশী-সংকোচন-জনিত ফিক-ব্যথা অনিয়মিতভাবে হতে থাকার সময়ই—ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে।

কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে, এমন কি প্রথম প্রসূতির বেলায়ও, প্রসব-বেদনা শুরু হওয়ার একেবারে প্রথম সংকেত দেখলেই ডাক্তারবাবুকে খবর দেবার দরকার হয়। এই সব বিশেষ ক্ষেত্র কি তা এ-ধরনের প্রসূতিকে তাঁর ডাক্তারবাবুই জানিয়ে দেবেন এবং তিনিই তাঁকে আগে থাকতে খবর দেবার কথা বলে রাখবেন। এই সব প্রসূতির ক্ষেত্রে প্রসববেদনার 'প্রথম সংকেত' বলতে যোনিমুখ থেকে সামান্য একটু রক্তক্ষরণ কি অল্প একটু জল ভাঙা, কিংবা তলপেটে অনিয়মিত ঘিনঘিনে ব্যথার কথাই বোঝাচ্ছি।

যে-সব প্রসূতি বাড়িতে ডাক্তাব ডাকার ব্যবস্থা কবেছেন এ-তো গেল তাঁদেব কথা। কিন্তু অন্যান্য যাঁবা ডাক্তার না-ডেকে প্রসববেদনা শুরু হওয়াব পর সবাসবি হাসপাতালে যেতে মনস্থ করেছেন (এঁদের কথাও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে), তাঁরাও ওই একই নিয়ম অনুসবণ করবেন। অর্থাৎ, প্রসববেদনার উপরোক্ত পূর্বাভাস দেখা দেওয়া মাত্র, কিংবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার কিছু আগেই, হাসপাতাল অভিমুখে রওনা হয়ে যাবেন। তবে আচমকা কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে সন্তানপ্রসব আসন্ন হয়ে উঠলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব না হলে যে-কোনো প্রসূতিকেই যে বাধ্য হয়ে বাড়িতে ডাক্তার ডাকতে হবে, এ-কথা বলা বাহুল্য।

প্রসূতিদের পক্ষে কয়েকটি অবশ্যজ্ঞাতব্য কথা। জেনে রাখুন : যে-কোনো সাধারণ সুস্থ স্ত্রীলোক শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অন্তুতপক্ষে বারো থেকে পনেরো ঘণ্টা আগে তার প্রথম আগমনবার্তা বা সংকেত পান। কিছু কিছু মেয়ের বেলায় ওই প্রাথমিক টান-ধরা বা ঘিনঘিনে ব্যথা

আবার দুই কিংবা তিন দিন আগে থেকে শুরু হয়; অথচ এঁদের আসল প্রসববেদনা উপযুক্ত সময়ে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। আবার এমনও অনেক মেয়ে আছেন যাঁদের, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একেবারে আচমকা, নিয়মিত পাঁচ মিনিট পরপর কিংবা তার চেয়েও কম সময়ের ব্যবধানে ফিক-ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এ-ধরনের মেয়েরা প্রায়ই অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সন্তানপ্রসব করে থাকেন। তবে 'অল্প কয়েক ঘণ্টা' মানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিন ঘণ্টার বেশি সময় বোঝায়। প্রসববেদনার প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়ার ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সন্তানপ্রসবের মতো ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। এত জলদি ঘনিয়ে-ওঠা প্রসববেদনাকে ডাক্তাররাই অস্বাভাবিক বলে মনে করেন।

দুই । প্রসববেদনা ও শিশুর জন্ম

প্রসববেদনার ত্রি-স্তর

ধাত্রীবিৎরা প্রসূতির প্রসববেদনাকে মোটামুটি তিনটি স্তর বা ধাপে ভাগ করে থাকেন। প্রথম স্তর বা ধাপটি অতিক্রান্ত হয় শিশু প্রসূতির গর্ভে বা জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করার অবস্থাতেই। এই স্তরটি ওই অবস্থায় প্রসূতির দেহের অভ্যন্তরে কিছু কিছু পরিবর্তনকে বোঝায়। এই পরিবর্তন আর কিছুই নয় ; ক্রমে ক্রমে প্রসূতির জরায়ু-মুখের উন্মোচন মাত্র। প্রসববেদনা শুরু হবার সঙ্গে এই প্রথম স্তরের সূচনা ঘটে। এ-সময়ে জরায়ু-মুখ যতটুকু খোলে তাতে কষ্টে-সৃষ্টে বড় জোর একটি আঙুলেব ডগা অল্প একটু তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু বেদনা বৃদ্ধি পাওয়াব সঙ্গে এই ফাঁকটুকু ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং অবশেষে এটি এত বড় হয়ে যায় যে গর্ভস্থ শিশুর মাথা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গলে বাইবে বেবিয়ে আসতে পারে। শিশুর মাথা গলে বেরিয়ে আসাব মতো বড় হওয়াব মানে জরায়ু-মুখেব উন্মোচন সম্পূর্ণ হওয়া। আব এই উন্মোচন সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে প্রসববেদনার প্রথম স্তবটি শেষ হয।

এইভাবে প্রসূতির শরীবের অভ্যন্তবেব বাধা দূব হওয়ার পর প্রসব-বেদনাব দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়। এই স্তরে প্রসূতিব পেটের পেশীসমূহ সংকুচিত হতে থাকে, অর্থাৎ প্রসূতির দেহ জরায়ুর মধ্যস্থ শিশুকে যোনিদেশের ভিতর দিয়ে ঠেলে বের করে দেবার চেষ্টা শুরু করে। এরপর, মাথা-নিচের-দিকে করে যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, ক্রমে তার মাথাটি মাত্র ভূমিষ্ঠ হলে এবং সে শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করার অবস্থায় এলেই শিশু আইনত ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে, অর্থাৎ পাছা-নিচের-দিকে বা মাথা-ওপর-দিকে করে শিশু ভূমিষ্ঠ

হলে, শিশুর সমগ্র দেহ বাইরে না আসা পর্যন্ত সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলে ধরা হয় না। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রসববেদনার এই দ্বিতীয় স্তরটি সম্পূর্ণ হয়।

শিশুর জন্মের পর শুরু হয় প্রসববেদনার তৃতীয় স্তর। একে এক কথায় বলা যায় প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল বা শুধুই 'ফুল' পড়ার স্তর। এ-সময়ে একমাত্র ফুলটিই প্রসূতির দেহের অভ্যন্তরে থেকে যায়। শিশুর জন্ম পর্যন্ত সারা গর্ভাবস্থা ধরে ফুলটি সাধারণত জরায়ুর দেয়াল কামড়ে অবস্থান করে। এমন কি প্রসবের পরও কিছুক্ষণ এটি ওই একই ভাবে থাকে। কিন্তু জরায়ু খালাস হয়ে যাওয়া বা তার মধ্যে থেকে শিশু বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুটি চুপসে বেশ খানিকটা ছোট হয়ে যায়। সম্ভবত এরই ফলে ফুলটিও দেয়াল থেকে খসে জরায়ুর থলির মধ্যে পড়ে যায়। এর পর সাধারণত প্রসূতির দেহ উপরোক্ত পেটের পেশী সংকোচনের সাহায্যে ফুলটিকেও জরায়ু থেকে ঠেলে বের করে দেয়। যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না ধাত্রীবিৎ চিকিৎসক সেই সব প্রসূতির ফুল হাত দিয়ে বের করে ফেলেন। ফুল পড়ে যাওয়ার সঙ্গে প্রসববেদনার তৃতীয় স্তরের অবসান হয়।

প্রসববেদনার প্রথম স্তর

সূচনা—আগেই বলা হয়েছে, প্রসববেদনা বা প্রসববেদনার প্রথম স্তর ঠিক কখন শুরু হয় অনেক প্রসূতির ক্ষেত্রে তা নিশ্চিত করে বলা মুশ্‌কিল। কেননা এ-বেদনা এমন ধীরে ধীরে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে এবং অনেক সময় আসল যন্ত্রণা শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে থেকেই একটা অস্পষ্ট ভোঁতা অনুভূতি প্রসূতিকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখে যে ঠিক কোন্ মুহূর্তে বেদনা শুরু হল তা ঘড়ি ধরে বলা মুশ্‌কিল। আবার অন্য অনেক ক্ষেত্রে বেদনা যেন হঠাৎ শুরু হয়ে যায় এবং প্রতি পাঁচ মিনিট কি তার চেয়েও কম সময়ের ব্যবধানে জোরালো ভাবে ফিরে আসতে থাকে।

এ-কথাও আগে বলেছি যে প্রসববেদনার ধরন প্রসূতি-ভেদে ভিন্নতর

হয়ে থাকে। জরায়ুর পেশী সংকোচনজনিত প্রাথমিক অস্বস্তি বা বেদনা প্রসূতিরা সাধারণত তলপেট বরাবর, মূত্রথলির কাছাকাছি জায়গাটায়, অনুভব করে থাকেন। প্রতিবার জরায়ু সংকুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি অনুভব করেন তাঁর সারা পেটটাই শক্ত হয়ে উঠছে। এরই সঙ্গে তিনি হয়তো তলপেটের নিচের দিকে একটা ভোঁতা বেদনাও বোধ করেন। এ-বেদনা অনেক সময় তলপেটের মাঝখান থেকে দু-দিকে চারিয়ে যেতে এবং দু-দিকের কুঁচকি ও উরু বেয়ে নিচের দিকে নামতেও দেখা যায়।

জরায়ুর সংকোচন এইভাবে চলতে থাকলে এবং জরায়ু-মুখ সত্যি সত্যিই খুলতে শুরু করলে, যন্ত্রণাটা তখন সাধারণত (সব ক্ষেত্রে অবশ্য নয়) পিঠের দিকেও চারিয়ে যায়। তখন শিরদাঁড়ার একেবার নিচের মাথায় নিতম্বদেশে বেদনা অনুভব করা যায়। অতঃপর প্রসূতি অনুভব করেন যেন যন্ত্রণাটা তার শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে এবং ফিক-ব্যথাটা হয় সামনে থেকে পেছনে আর নয় তো পেছন থেকে সামনের দিকে আনাগোনা করছে। আব এই সময়েই সাধারণত প্রসূতির যোনিদেশ থেকে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ঘন শ্লেষ্মার স্রাব নির্গত হয়। এই স্রাবের মধ্যে রক্তের ছিটেও থাকতে পারে।

তবে এত আগে থাকতে প্রসূতির জল ভাঙা শুরু হবে কিনা তার কোনো স্থিরতা নেই। যদি এ-সময়ে জল ভাঙেও, এমন কি প্রসব-বেদনা পাকাপাকিভাবে আরম্ভ হবার আগেই যদি জল ভাঙতে শুরু হয়, তাহলেও তার ফলে বিশেষ রকম অসুবিধায় পড়তে হবে মনে করে বিচলিত হবার কোনো হেতু নেই। বরঞ্চ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জল ভাঙতে শুরু হবার পরই প্রসববেদনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রসববেদনা একবার পাকাপাকিভাবে শুরু হয়ে গেলে পর বেদনার ধরন যে খুব একটা কিছু পালটায় তা নয়। তবে বেদনা ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে এবং আগের চেয়ে বেশি ঘন ঘন ফিরে আসতে থাকে। এই বেদনা কতখানি বাড়বে তা অবশ্য আগে থেকে বলা

সম্ভব নয়। তাছাড়া সব মেয়ের সহনশীলতাও সমান নয়। ফলে প্রসূতি কতখানি কষ্ট পাবেন সে সম্পর্কে একেবারেই কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না।

হাসপাতাল—আগেই বলেছি, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বেদনা যখন বেশ জোরালো হয়ে উঠবে এবং নিয়মিতভাবে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের ব্যবধানে ফিরে ফিরে আসবে তখনই প্রসূতিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে। হাসপাতালে যাবার অব্যবহিত আগে প্রসূতির পক্ষে কোনো কিছু না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ প্রসবের আগে প্রসূতির পাকস্থলী খালি থাকা দরকার।

হাসপাতালে পৌঁছনোর পর ভর্তির ব্যবস্থা। যদি প্রসূতি বা তাঁর স্বামী ইতিপূর্বে ভর্তির ব্যবস্থা-পর্ব শেষ করে ফেলে থাকেন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করে থাকেন কিংবা টাকা জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে এখন আর কোনোই ঝামেলা নেই। হাসপাতালে পৌঁছে রিপোর্ট করার পর প্রসূতিকে হয় সরাসরি 'লেবর রুম' বা প্রসবের ঘরে আর নয়তো তাঁকে তাঁর নিজস্ব বেড কিংবা কেবিনে নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি প্রসূতি ইতিমধ্যে ভর্তি না হয়ে থাকেন তো এই সময়ে তাঁকে কিংবা তাঁর স্বামীকে উপরোক্ত ফর্ম পূরণ করে দিতে হবে এবং পেয়িং ওয়ার্ড ইত্যাদিতে থাকতে হলে প্রয়োজনীয় টাকাও জমা দিতে হবে।

ভর্তি হবার পর প্রথমেই প্রসূতিকে তাঁর আসন্ন প্রসবের জন্যে প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে তাঁর পরনের জামাকাপড় প্রয়োজনমতো পালটে দেওয়া হয় এবং তাঁকে বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়। অতঃপর যথোপযুক্ত বিশোধনের উদ্দেশ্যে তাঁর যোনিদেশ ও তার চারিধার ভালোভাবে পরিষ্কার করে দেওয়ার রীতি। স্বাস্থ্যের খাতিরে প্রসূতির দিক থেকে এতে আপত্তি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রসবের সময় খুব বেশি ঘনিয়ে না এসে থাকলে এরপর প্রসূতিকে ডুশ দিয়ে দাস্ত পরিষ্কার করিয়ে দেওয়াই সাধারণত হাসপাতালের

রীতি। এর উদ্দেশ্য দুটি। এক, এর ফলে প্রায়শই প্রসূতির জরায়ুর সংকোচন বাড়ে ও প্রসববেদনাও বেড়ে ওঠে। দুই, এ-সময়ে গর্ভস্থ শিশুকে ঠেলে বের করে দেবার জন্যে প্রসূতির পেটের পেশী এমন সজোরে সংকুচিত হতে থাকে যে তার ফলে একদিকে মলনালি অন্যদিকে গর্ভস্থ শিশু উভয়ের ওপরই সমানে চাপ পড়তে থাকে। ফলে রোগের আক্রমণ থেকে বিশোধনের জন্যে এ-সময়ে মলনালি খালি করিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

আগেই বলেছি, প্রসূতির খালি পেটে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রসূতি হয়তো দেখবেন জল চাইলে হাসপাতালে তাঁকে জল পান করতেও দেওয়া হবে না। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। প্রসূতির জানা দরকার, প্রসবের সময় কখন যে কোন্ মেয়ের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান লোপের জন্যে ওষুধ প্রয়োগের (general anesthesia) প্রয়োজন হয় তার কিছু ঠিক নেই। একাধিক কারণে এর প্রয়োজন হতে পারে। অথচ ভরা পেটের ওপর এ-ধরনের ওষুধ প্রয়োগের ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে সাধারণভাবে সমস্ত প্রসূতির ক্ষেত্রেই আসল প্রসবযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর—বিশেষ করে যদি মনে হয় যে ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা, তাহলে– তাঁদের খাদ্য বা পানীয় না দেওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী প্রসবের সময় এই কারণেই প্রসববেদনা তেমন জোরালো না হলেও এবং প্রসূতি ক্ষুধা বোধ করলেও তাঁকে কিছু খেতে দেওয়া বিশেষভাবে অনুচিত। কেননা এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে সন্তানপ্রসব অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

যাই হোক, মলদ্বারে ডুশ প্রয়োগের পর প্রসূতি দেখবেন লেবর-রুমের নার্স'রা, তাঁর মনোনীত ডাক্তার থাকলে সেই চিকিৎসক এবং হাসপাতালের অন্যান্য ডাক্তার তাঁর পেটে হাত চেপে ধরে ঘন ঘন পরীক্ষা করছেন। এঁরা সকলেই প্রসূতির যন্ত্রণা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে কি না এবং কী পরিমাণে জোরালো হচ্ছে তাই পরখ করে দেখবেন। এতে যেন প্রসূতি বিরক্তি বোধ না করেন। তাঁর

মনে রাখা দরকার, প্রসববেদনার ভালো-মন্দ দুটি দিকই আছে। এক দিকে এর ফলে তাঁর নিজের যেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্ট, অন্যদিকে তেমনি প্রসববেদনা ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠা ও ঘন ঘন দেখা দেওয়ার সঙ্গে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসা ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আবার বেদনা এইভাবে বেড়ে ওঠার মূলে আছে জরায়ুর ক্রমবর্ধমান সংকোচন। আর হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্স'রা যন্ত্রণার সময় প্রসূতির পেটে হাত চেপে ধরে ঠিক এই জিনিসটিই পরীক্ষা করেন। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির জরায়ু কতটা শক্ত হয়ে ওঠে এবং তার সংকোচন কতক্ষণ স্থায়ী হয় তাই দেখে তাঁরা স্থির করেন যন্ত্রণা কতটা 'খাঁটি', অর্থাৎ প্রসবের সময় সত্যিই সন্নিকট কি না।

প্রসবের সময় সন্নিকট কিনা তা বোঝার আরো দুটি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায় আছে। তা হল, মলদ্বারে কিংবা যোনিদেশে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা। এ দুটির মধ্যে মলদ্বারে পরীক্ষাই অপেক্ষাকৃত সরল ও নিরাপদ। কেননা যোনিদেশে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মতো এ-পরীক্ষার সময় রোগজীবাণুর সংক্রমণের ব্যাপারে সাবধান হওয়ার দরকার করে না। অথচ এ-পরীক্ষার ফলাফল প্রায় যোনিদেশে পরীক্ষার মতোই সঠিক হয়। মলনালি ও যোনিপথের মধ্যে একটি মাত্র পাতলা মাংসের পর্দার ব্যবধান। কাজেই ডাক্তারবাবু এই পাতলা দেয়ালে আঙুল চেপে ধরে বুঝতে পারেন জরায়ুর মুখ কতটা খুলেছে। চেষ্টা করলে তিনি আবো বুঝতে পারেন গর্ভস্থ শিশুর শরীরের নিম্নাংশ জরায়ুর মধ্যে কতটা নেমে এসেছে, শিশুটি মাথা-নিচের-দিকে না পাছা-নিচের-দিকে অবস্থায় আছে এবং শিশুটি ওই প্রথমোক্ত অবস্থায় থাকলে তার মাথাটি কোনদিকে ঘুরছে।

তবে শিশুর অবস্থান যদি অস্বাভাবিক হয়ে থাকে এবং এ-সম্পর্কে আরো প্রত্যক্ষ খবরাখবরের দরকার হয় তাহলে ডাক্তারবাবু হয়তো প্রসূতির যোনিদেশে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাও করতে পারেন।

রীতি। এর উদ্দেশ্য দুটি। এক, এর ফলে প্রায়শই প্রসূতির জরায়ুর সংকোচন বাড়ে ও প্রসববেদনাও বেড়ে ওঠে। দুই, এ-সময়ে গর্ভস্থ শিশুকে ঠেলে বের করে দেবার জন্যে প্রসূতির পেটের পেশী এমন সজোরে সংকুচিত হতে থাকে যে তার ফলে একদিকে মলনালি অন্যদিকে গর্ভস্থ শিশু উভয়ের ওপরই সমানে চাপ পড়তে থাকে। ফলে রোগের আক্রমণ থেকে বিশোধনের জন্যে এ-সময়ে মলনালি খালি করিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

আগেই বলেছি, প্রসূতির খালি পেটে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রসূতি হয়তো দেখবেন জল চাইলে হাসপাতালে তাঁকে জল পান করতেও দেওয়া হবে না। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। প্রসূতির জানা দরকার, প্রসবের সময় কখন যে কোন্ মেয়ের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান লোপের জন্যে ওষুধ প্রয়োগের (general anesthesia) প্রয়োজন হয় তার কিছু ঠিক নেই। একাধিক কারণে এর প্রয়োজন হতে পারে। অথচ ভরা পেটের ওপর এ-ধরনের ওষুধ প্রয়োগের ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে সাধারণভাবে সমস্ত প্রসূতির ক্ষেত্রেই আসল প্রসবযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর—বিশেষ করে যদি মনে হয় যে ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা, তাহলে– তাঁদের খাদ্য বা পানীয় না দেওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী প্রসবের সময় এই কারণেই প্রসববেদনা তেমন জোরালো না হলেও এবং প্রসূতি ক্ষুধা বোধ করলেও তাঁকে কিছু খেতে দেওয়া বিশেষভাবে অনুচিত। কেননা এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে সন্তানপ্রসব অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

যাই হোক, মলদ্বারে ডুশ প্রয়োগের পর প্রসূতি দেখবেন লেবর-রুমের নার্সরা, তাঁর মনোনীত ডাক্তার থাকলে সেই চিকিৎসক এবং হাসপাতালের অন্যান্য ডাক্তার তাঁর পেটে হাত চেপে ধরে ঘন ঘন পরীক্ষা করছেন। এঁরা সকলেই প্রসূতির যন্ত্রণা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে কি না এবং কী পরিমাণে জোরালো হচ্ছে তাই পরখ করে দেখবেন। এতে যেন প্রসূতি বিরক্তি বোধ না করেন। তাঁর

মনে রাখা দরকার, প্রসববেদনার ভালো-মন্দ ছুটি দিকই আছে। এক দিকে এর ফলে তাঁর নিজের যেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্ট, অন্যদিকে তেমনি প্রসববেদনা ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠা ও ঘন ঘন দেখা দেওয়ার সঙ্গে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসা ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আবার বেদনা এইভাবে বেড়ে ওঠার মূলে আছে জরায়ুর ক্রমবর্ধমান সংকোচন। আর হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্স'রা যন্ত্রণার সময় প্রসূতির পেটে হাত চেপে ধরে ঠিক এই জিনিসটিই পরীক্ষা করেন। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির জরায়ু কতটা শক্ত হয়ে ওঠে এবং তার সংকোচন কতক্ষণ স্থায়ী হয় তাই দেখে তাঁরা স্থির করেন যন্ত্রণা কতটা 'খাঁটি', অর্থাৎ প্রসবের সময় সত্যিই সন্নিকট কি না।

প্রসবের সময় সন্নিকট কিনা তা বোঝার আরো ছুটি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায় আছে। তা হল, মলদ্বারে কিংবা যোনিদেশে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা। এ ছুটির মধ্যে মলদ্বারে পরীক্ষাই অপেক্ষাকৃত সরল ও নিরাপদ। কেননা যোনিদেশে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মতো এ-পরীক্ষার সময় রোগজীবাণুর সংক্রমণের ব্যাপারে সাবধান হওয়ার দরকার করে না। অথচ এ-পরীক্ষার ফলাফল প্রায় যোনিদেশে পরীক্ষার মতোই সঠিক হয়। মলনালি ও যোনিপথের মধ্যে একটি মাত্র পাতলা মাংসের পর্দার ব্যবধান। কাজেই ডাক্তারবাবু এই পাতলা দেয়ালে আঙুল চেপে ধরে বুঝতে পারেন জরায়ুর মুখ কতটা খুলেছে। চেষ্টা করলে তিনি আরো বুঝতে পারেন গর্ভস্থ শিশুর শরীরের নিম্নাংশ জরায়ুর মধ্যে কতটা নেমে এসেছে, শিশুটি মাথা-নিচের-দিকে না পাছা-নিচের-দিকে অবস্থায় আছে এবং শিশুটি ওই প্রথমোক্ত অবস্থায় থাকলে তার মাথাটি কোনদিকে ঘুরছে।

তবে শিশুর অবস্থান যদি অস্বাভাবিক হয়ে থাকে এবং এ-সম্পর্কে আরো প্রত্যক্ষ খবরাখবরের দরকার হয় তাহলে ডাক্তারবাবু হয়তো প্রসূতির যোনিদেশে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাও করতে পারেন।

সেক্ষেত্রে রোগ-সংক্রমণ নিবারণের জন্যে তাঁকে আগে থাকতে যথোপযুক্ত বিশোধনী-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রসববেদনা উপশমের উপায়—প্রসববেদনার এই প্রথম স্তরে কোনো না কোনো সময়ে প্রসূতি হয়তো জোরালো যন্ত্রণার হাত থেকে অন্তত কিছুটা অব্যাহতি চাইবেন। অবশ্য সকলেই যে এটা চাইবেন বা চেয়ে থাকেন, অর্থাৎ এটা তাঁদের দরকার হয়, তা বলছি না। তবে অস্বাভাবিক প্রসবের বেলায় তো বটেই, এমন কি কোনো কোনো সময়ে স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রেও, চিকিৎসক এর প্রয়োজন অনুভব করেন, আবার কখনো বা প্রসূতির দিক থেকে জোর তাগিদ এসে থাকে। বিশেষ করে যে-সব প্রসূতির নার্ভ দুর্বল, কিংবা যাঁরা অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাঁদের তরফ থেকেই এ-ধরনের তাগিদ আসে। তবে, দুঃখের বিষয়, প্রসূতি চাওয়ামাত্রই ডাক্তার যে সর্বত্র বেদনা উপশমের ওষুধ দিতে পারেন তা নয়। প্রসববেদনা বেশ কিছুটা পাকিয়ে ওঠার আগে প্রসূতি চাইলেও ডাক্তার এ-ধরনের ওষুধ দিতে রাজী হন না। কেননা, ডাক্তারবাবু জানেন প্রসববেদনা রীতিমতো পাকিয়ে ওঠা ও সন্তান-প্রসব সন্নিকট হবার আগে ওষুধ পড়লে শেষপর্যন্ত সে-ওষুধের পুরো ফল প্রসূতির পক্ষে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রসববেদনা রীতিমতো পাকিয়ে-ওঠা বলতে অবশ্য সব প্রসূতির পক্ষে সমান-ভাবে প্রযোজ্য কোনো অবস্থা বা সময় বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বোধহয় বলা চলে যে অন্তুতপক্ষে চার থেকে ছ-ঘণ্টার মধ্যে প্রসবের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করলে তবেই ডাক্তারবাবু এ ধরনের ওষুধপত্র ও অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করতে মনস্থ করেন।

সন্তানপ্রসবের সময় যন্ত্রণা উপশমের উপায় হিসেবে ডাক্তাররা নানা ধরনের ওষুধপত্র ও অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন, ব্র্যাণ্ডি বা ঐ জাতীয় মাদকদ্রব্য, হাল্‌কা ঘুমের কিংবা বিশেষ বিশেষ অঙ্গ অসাড় করার নানা ধরনের ওষুধ, একাধিক জ্ঞান-লোপকারক

গ্যাস ও ওষুধ, হিপ্নোটিজম্ বা সম্মোহন, ইত্যাদি। তবে এ-সমস্ত ওষুধ বা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসকদেরই জ্ঞাতব্য এবং প্রসূতির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বলে এখানে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

প্রসববেদনার স্থায়িত্ব—প্রসববেদনার এই প্রথম স্তর কতক্ষণ স্থায়ী হয়? এক কথায় এর জবাব দেওয়া শক্ত। কেননা, এ-স্তরের সূচনা ঠিক কখন হয় প্রায়-ক্ষেত্রেই তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হয় না। ধরুন, পাশাপাশি দুই প্রসূতিকে যদি এই একই প্রশ্ন করা যায়, তা হলে দেখা যাবে তাঁরা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন দু-রকম জবাব দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হয়তো বলবেন তিনি পুরো দু-দিন বা আটচল্লিশ ঘণ্টা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, আবার অন্যজন যদি জানান যে তাঁর বেলায় বেদনা মাত্র ঘণ্টা ছয়েক স্থায়ী হয়েছে তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। এর কারণ আর কিছু নয়, ওই প্রথমোক্ত মেয়েটি তাঁর প্রাথমিক টান-ধরা বা ফিক-ব্যথার শুরুকেই আসল প্রসব-বেদনার সূচনা বলে মনে করেছেন; আর দ্বিতীয় জন ব্যথা প্রবল হয়ে ওঠা ও হাসপাতালে রওনা হবার আগে পর্যন্ত প্রাথমিক ফিক-ব্যথাকে বিশেষ আমল দেননি।

অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় প্রসববেদনা ভোগ করার যে-সব রোমহর্ষক কাহিনী শোনা যায় ভালো করে খবর নিলে হয়তো দেখা যাবে তার মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওই সময়ের হিসেবের গোলমাল। অর্থাৎ এই সব প্রসূতি প্রাথমিক ফিক-ব্যথার সূচনা থেকে প্রসববেদনার শুরু ধরে নিয়ে ঘণ্টা হিসেব করেন এবং অনেকেই প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশ একটু আগে গিয়ে হাসপাতালে হাজির হন। ফলে এঁদের কাউকে কাউকে প্রসবের আগে এক দিন, দু-দিন, এমন কি তার চেয়েও বেশি সময় হাসপাতালে থাকতে হয়।

ধাত্রীবিদ্যা-সংক্রান্ত বিদেশী কেতাবে লেখা আছে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রসববেদনার এই প্রথম স্তরটি—প্রথম প্রসূতির বেলায় বারো থেকে

পনেরো ঘণ্টা এবং পরবর্তী গর্ভের সময় প্রায় আট ঘণ্টা স্থায়ী হয়। তবে বিশেষ গ্রন্থকারের এই বিশেষ হিসেবটি সর্বক্ষেত্রে হুবহু মিলে যাবে এমন মনে ভাবার কোনো কারণ নেই। এছাড়া চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুসারে "অতিরিক্ত দীর্ঘস্থায়ী প্রসববেদনা" বলতে তিরিশ ঘণ্টারও বেশি স্থায়ী বেদনার কথা বোঝানো হয়। কার্যক্ষেত্রে খাঁটি প্রসব-বেদনা কিন্তু এত দীর্ঘ সময় স্থায়ী হতে প্রায় দেখাই যায় না। অবশ্য খাঁটি প্রসববেদনা বলতে এখানে আমরা প্রসূতির জরায়ুর মুখ-খোলার সূচনা থেকে মুখটি ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে ওঠার কথাই বোঝাচ্ছি। প্রসঙ্গক্রমে এ-কথাও বলা দরকার যে জরায়ু-মুখ এইভাবে ক্রমে ক্রমে খোলাব সূচনা হবার আগেকার অস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদিকে বলা হয় প্রাথমিক ঘিনঘিনে-ব্যথার পর্যায়। এবং এও স্মরণীয় যে এই প্রাথমিক ফিক-ব্যথা পর্যায়ের কোনো বাঁধাধরা সময় থাকে না, অর্থাৎ আসল প্রসববেদনা শুরু হওয়ার কতক্ষণ আগে এর সূচনা হবে এবং এটি কতক্ষণ চলবে তার সময় বেঁধে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

তবে কেতাবে যাই লেখা থাক, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে আসল প্রসববেদনা দশ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে তাকে অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত দীর্ঘস্থায়ী বলে গণ্য করা উচিত।

আসল বেদনা শুরু হবার পর, অর্থাৎ জরায়ু-মুখ বেশ খানিকটা খোলার পর, বেদনা যদি ফের রীতিমতো জুড়িয়ে যেতে থাকে সে রকম ক্ষেত্রে প্রায় সব ধাত্রীবিৎই ওষুধ প্রয়োগ করে পেশী-সংকোচনকে ফের চাঙ্গা করে তোলার, অর্থাৎ প্রসব আসন্ন করে তোলার, চেষ্টা করেন।

প্রসূতি-ভেদে প্রসববেদনার এই প্রথম স্তরের স্থায়িত্বের তারতম্য ঘটার কয়েকটি কারণ চিকিৎসকরা খুঁজে বের করতে পেরেছেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে কার্যত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই তারতম্যের কারণ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়; কিংবা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কারণের সঙ্গে প্রসববেদনার কার্যকারণ সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে

নিরূপণ করা সম্ভব হয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে যে-সব মেয়ের বয়স আন্দাজ কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে তাঁদের ক্ষেত্রে প্রসববেদনা অপেক্ষাকৃত কার্যকরী, স্বাভাবিক ও স্বল্পস্থায়ী হয়। অর্থাৎ, এই উপরোক্ত বয়সের মেয়েরাই প্রাকৃতিক কারণে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রসূতি। সাধারণত লোকের ধারণা, প্রসূতির বয়স যত অল্প হয় তিনি ততই কম কষ্ট ভোগ করেন। এ-ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। খুব অল্পবয়সী—পনেরো-ষোলো-সতেরো বছরের—প্রসূতিকে সন্তানপ্রসব করতে গিয়ে বরং অপেক্ষাকৃত বেশি কষ্ট ভোগ করতে দেখা যায়। আবার, উল্টোদিকে যে-সব মেয়ের বয়স পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়েছে তাঁরাও প্রথম প্রসূতি হলে প্রসববেদনার সময় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

এই রকম, প্রসূতি অতিরিক্ত মোটা হলে তাঁর প্রসববেদনা দীর্ঘস্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত কম কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা। বস্তি-প্রদেশের হাড়ের কাঠামো ছোটবড় হওয়ার সঙ্গেও প্রসববেদনা ও সন্তান-প্রসবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবে এই কাঠামো অতিরিক্ত ছোট হওয়ার দরুন যোনিদেশ দিয়ে সন্তানপ্রসব অসম্ভব বলে বিবেচিত হলেও তার দরুন জরায়ু-মুখ খোলা ও মুখ ক্রমশ বড় হওয়া যে স্থগিত থাকবেই তার কোনো মানে নেই। বস্তি-প্রদেশের হাড়ের কাঠামোর গড়ন ছোট কিংবা অস্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে প্রসববেদনা অস্বাভাবিক বা অকার্যকরী হওয়ার কোনো আবশ্যিক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। এছাড়া গর্ভস্থ শিশুর অবস্থানের অস্বাভাবিকতাও প্রসববেদনাকে বিলম্বিত কিংবা অকার্যকরী করে তোলার একটা কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। শিশু যদি মাতৃগর্ভে আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে থাকে, কিংবা অন্য এমন কোনো অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে যার ফলে তার শরীরের অংশবিশেষ প্রথম অবস্থায় জরায়ু-মুখ ফাঁক করে নিয়ে গলে বেরোতে অসমর্থ হয়, তাহলেও প্রসববেদনা বিলম্বিত হতে পারে।

পরিশেষে প্রসূতির মানসিক অবস্থাও প্রসববেদনার এই প্রথম স্তরের

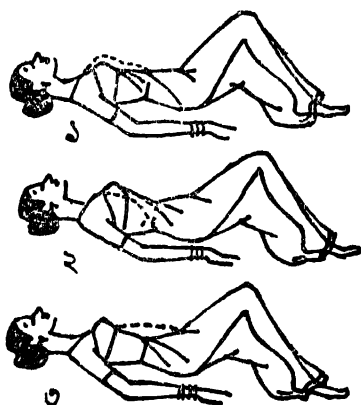
ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। যদিও জরায়ুর পেশীর সংকোচন প্রসূতির খেয়াল-খুশি বা ইচ্ছার অধীন নয়, তবু প্রসূতির অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা জরায়ুর সংকোচনকে জোরালো করে তুলতে কিংবা ঘন ঘন সংকোচন ঘটাতে সমর্থ। অতিরিক্ত ভয় পেলে যেমন অনেকের পায়খানা যাওয়ার দরকার হয় এও অনেকটা সেই ব্যাপার।

অনেক সময় বাড়ির মা-ঠাকুমাদের মুখে প্রসববেদনা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া না-হওয়ার নানাবিধ লৌকিক কারণ শোনা যায়। তার মধ্যে একটি হল (এর কথা এ-বইয়ে ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি), গর্ভাবস্থায় যে-মেয়ে যত বেশি পরিশ্রম করেন তাঁর প্রসববেদনা নাকি তত কম সময় স্থায়ী হয় ও কম কষ্টদায়ক হয়—অর্থাৎ তাঁর সুপ্রসব হয়। গর্ভাবস্থায় আলস্যে দিন কাটানোর চেয়ে পরিমিত রকম পরিশ্রম প্রসূতির স্বাস্থ্যের পক্ষে অবশ্যই ভালো। কিন্তু যাঁরা অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দৌড়ঝাঁপ করেন কিংবা করতে পারেন, অর্থাৎ যাঁদের শরীর সাধারণের চেয়ে একটু বেশি শক্ত-সবল কিংবা পুরুষালি, তাঁদের যে অন্যান্যদের চেয়ে বেশি ভালোভাবে প্রসব হবেই তার কোনো মানে নেই। এ-ব্যাপারে ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা বরং অন্যরকম। তাঁরা বলেন, একেবারে মেয়েলি বা অতিরিক্ত নরম-সরম দেহ যে-সব প্রসূতির, তাঁদেরই প্রসববেদনা প্রায়-ক্ষেত্রে আশ্চর্যরকম স্বল্পস্থায়ী হতে দেখা যায়। এছাড়া আরো একটি লৌকিক ধারণা এই যে, সন্তানপ্রসব দ্রুত বা বিলম্বিত হওয়ার পিছনে গর্ভস্থ সন্তানেরও কিছুটা হাত আছে। আসলে এটি সত্যি নয়। শিশু নেহাতই অকর্মক, নিছক যাত্রীমাত্র। সন্তানপ্রসব দ্রুত বা বিলম্বিত হওয়ার পিছনে শিশুর কিছুমাত্র হাত নেই। তবে একমাত্র মাতৃগর্ভে কখনো কখনো অস্বাভাবিকভাবে অবস্থান করার দরুন প্রসব বিলম্বিত হওয়ার জন্যে যদি বেচারা শিশুকে দায়ী করা হয় তো অন্য কথা।

প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তর ঃ শিশুর জন্ম

সূচনা—আপনাআপনি সংকুচিত হতে হতে জরায়ু যখন তার সবচেয়ে নিম্নাংশ বা জরায়ু-মুখ পুরোপুরি খুলে ফেলতে সমর্থ হয়, তখনই প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়। গর্ভস্থ শিশু অতঃপর জরায়ু থেকে বেরিয়ে যোনিপথের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রথমটায় মলনালির দেয়ালের ওপর চাপ দিতে থাকে। এর ফলে প্রসূতির মলদ্বার এই সময়ে বারবার খুলতে ও বন্ধ হতে দেখা যায়।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রসূতির বেদনার ধরন পালটে যায়। ফলে তার সঙ্গে প্রসূতির প্রতিক্রিয়ার ধরনেও পরিবর্তন ঘটে। প্রসববেদনার প্রথম স্তরে প্রসূতির পক্ষে করণীয় বিশেষ কিছু থাকে না। বড় জোর তিনি অস্থির হয়ে এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন, হাত মুঠো করেন ও গোঙাতে থাকেন কিংবা কোনো কোনো ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো শরীরটাকে এলিয়ে মাংসপেশীগুলি শিথিল করে দেবার জন্যে এক বিশেষ ধরনে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকেন।



প্রসববেদনার প্রাথমিক স্তরে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম

সাধারণত "স্বাভাবিক প্রসবের" প্রবক্তারা এই পদ্ধতিটি অনুমোদন করেন। তাঁরা মনে করেন এই ব্যায়ামের ফলে খানিক পরিমাণে প্রসববেদনার তীব্রতা কমে। প্রতিবার যন্ত্রণার দমক শুরু হবার মুখে প্রসূতিকে এইভাবে শ্বাস টানতে হবে।

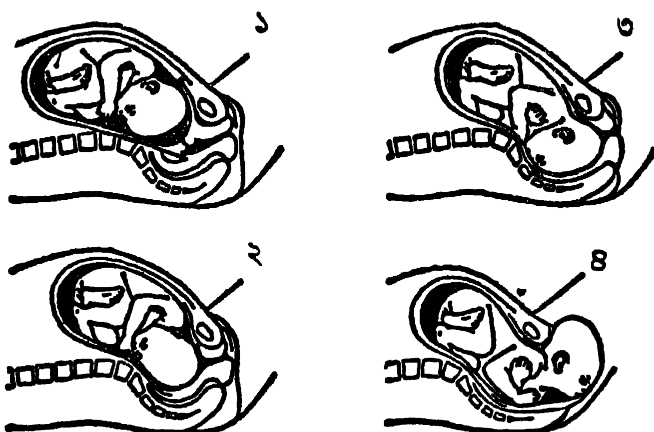
১ ও ২ নং ছবিতে হাঁ করে শ্বাস টানার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। শ্বাস টানার সময় বুকের হাড় কি ভাবে ওঠানামা করবে ফুটকিযুক্ত রেখা দিয়ে ছবি দুটিতে তা দেখানো হয়েছে।

৩নং ছবিতে মুখ বন্ধ করে গভীরভাবে শ্বাস টানার কায়দা দেখানো হয়েছে। এইভাবে শ্বাস টানার ফলে পেটের শিথিল-করে-দেওয়া মাংসপেশী তালে তালে ওঠানামা করে। ফুটকিযুক্ত রেখা দিয়ে পেটের এই ওঠানামা দেখানো হল।

কিন্তু প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তর শুরু হলে—এমন কি অর্ধ-অচেতন অবস্থাতেও– আপনার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা দেবে কোনো কিছুকে শরীরের ভেতর থেকে নিচের দিকে ঠেলে বের করে দেবার বা ঝেড়ে ফেলবার। পায়খানায় বসার পর মল কষে গেলে লোকের যে-ধরনের ইচ্ছা জাগে এ প্রায় তারই রকমফের। ফলে প্রসূতি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করুন আর না করুন তাঁর পেট, জরায়ু ও যোনিদেশের পেশীগুলি সংকুচিত ও প্রসারিত হতে হতে কোনো কিছুকে ঠেলে নিচের দিকে বের করে দেবার চেষ্টা করতে থাকবে। আর এইভাবে ঠেলে নিচের দিকে বের করে দেবার সময় একটি বিশেষ লক্ষণ দেখে চিকিৎসক বুঝতে পারেন যে সন্তানপ্রসব সমাসন্ন। সেটি হল, প্রসূতির মলদ্বার খুলে-যাওয়া। শিশুকে প্রত্যেকবার নিচের দিকে ঠেলে দেবার ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির মলদ্বার একটি আধুলি-পরিমাণ হাঁ হয়ে যায়। এই কারণে প্রসূতির পক্ষে এ-সময়ে পুরোপুরি সচেতন থাকলেও বোঝা সম্ভব নয় যে এত বড় একটা পদার্থ তাঁর যোনিপথের মধ্যে দিয়ে নেমে আসছে। উল্টো, সজাগ থাকতে পারলে তিনি মনে ভাববেন তাঁর মলনালির মধ্যে দিয়েই বুঝি প্রকাণ্ড একটা পদার্থ নেমে আসছে। একমাত্র যে-সব প্রসূতির ওপর সর্বাঙ্গীণ জ্ঞাননাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় তাঁরা বাদে, অন্যান্য সকলে—এমন কি যাঁদের ওপর হাল্‌কা ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তাঁরাও – এ-সময়ে রীতিমতো অস্থির হয়ে ওঠেন। উপরোক্ত কারণে তাঁদের ভয় হয় বুঝি তাঁদের বিছানা নোংরা হয়ে যাচ্ছে। ফলে, আসল ব্যাপার কী

তার বোধ না থাকায় প্রতিবার শুই কোনো কিছুকে নিচের দিকে ঝেড়ে ফেলার অনুভূতিটি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে যেতে চান।

দ্বিতীয় স্তরের স্থায়িত্ব—একমাত্র প্রথম প্রসূতি ছাড়া আর সকলের বেলাতেই প্রসববেদনার এই দ্বিতীয় স্তরটি খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। যোনিদেশের চারিপাশের মাংসপেশী ও যোনিমুখ ইতিপূর্বে একই কারণে এক বা একাধিক বার বিস্ফারিত হয়ে থাকলে শিশুর নেমে আসার পথে এবারও খুব বেশিক্ষণ বাধার সৃষ্টি করবে না। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে জরায়ুর মুখ পুরোপুরি খুলে যাবার পর শিশু ভূমিষ্ঠ হতে মাত্র মিনিট কয়েক—এমন কি কখনো কখনো কয়েক সেকেণ্ড মাত্র—লাগে।



সন্তানের জন্ম : চারটি বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম প্রসূতির বেলায় অবশ্য উপরোক্ত যোনিদেশের মাংসপেশী ইত্যাদি খানিকটা সময় ধরে বাধার সৃষ্টি করে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় এই সব মাংসপেশী প্রায় ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশি সময় ধরে অল্পে অল্পে প্রসারিত ও সংকুচিত হতে হতে তবে শিশুকে ভূমিষ্ঠ হবার রাস্তা পুরোপুরি ছেড়ে দেয় কিংবা তার পরে ফরসেপ বা চিমটের সাহায্যে শিশুকে নিরাপদে ভূমিষ্ঠ করানো সম্ভব হয়। তবে

এই সময়-লাগার ব্যাপারেও প্রসূতি-ভেদে বেশ বেশিরকম তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে কোনো কোনো প্রথম প্রসূতির বেলাতেও প্রসবের এই দ্বিতীয় স্তরটি খুবই সংক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা। প্রাচীন ধারণা অনুসারে, সন্তানপ্রসবের অর্থ প্রসূতির পক্ষে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করা। আগেকার দিনে (এমন কি এখনও যে সব জায়গায় অশিক্ষিত ধাত্রী সন্তান প্রসবের ভার নেয়) ধাত্রীরা মনে করত, প্রসববেদনার যে-কোনো স্তরে প্রসূতি যদি সক্রিয়ভাবে শিশুকে শরীরের ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন তাহলে সন্তানপ্রসব তরান্বিত হয়। অথচ আসল ব্যাপার এই যে প্রসূতির জরায়ু-মুখ যতক্ষণ না পুরোপুরি খুলে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তর শুরু হচ্ছে, ততক্ষণ এ-ধরনের সক্রিয় চেষ্টার শুধু যে কোনো মানে নেই তা নয়, এর ফলে অযথা প্রসূতির এতদূর ক্লান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা যে প্রসবের দ্বিতীয় স্তরে কখনো যদি সত্যিই তাঁর পক্ষে সক্রিয় চেষ্টার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তখন তিনি সে-চেষ্টা ঠিকমতো করে উঠতে পারবেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তরে (সব সময়ে না-হলেও) কখনো কখনো প্রসূতির পক্ষে সক্রিয়ভাবে শিশুকে শরীরের ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে চেষ্টা করার দরকার হতে পারে। বিশেষ করে যে-সব ক্ষেত্রে প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের হাড়ের কাঠামোটি ঠিক মাপে-মাপে আছে, কিংবা শিশুটি আকারে বড়, কিংবা শিশুর মাথা পুরোপুরি স্বাভাবিকভাবে নিচের দিকে ঘোরানো নয়, সেখানে প্রসূতি যদি সাহস ও সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এরূপ সক্রিয়ভাবে শিশুকে ঠেলে নিচের দিকে বের করে দেবার ব্যাপারে নিজের শরীরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন তাহলে সে-সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় নিরাপদে ও অপেক্ষাকৃত সহজে সন্তানপ্রসব সুসম্পন্ন হয়, অন্যথায় ভাবী মা ও শিশুর পক্ষে নানারকম বিপদ-আপদ ঘটতে পারে। তবে, সুখের কথা, এ-ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা খুবই বিরল।

"লেবর-রুমে"—হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ কিংবা আপনার ডাক্তারবাবু যখন স্থির করবেন যে প্রসব আসন্ন, তখনই একটা চাকা-লাগানো স্টেচারে শুইয়ে আপনাকে লেবর-রুমে নিয়ে যাওয়া হবে এবং প্রসবের টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হবে। এই টেবিলে আপনাকে চিত হয়ে শুতে হবে এবং হাঁটু দুটো তুলে আপনার পা-দুটো ফাঁক করে রাখা হবে। দরকার পড়লে আপনার হাত দুটোও শরীরের দু-দিকে কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে রাখতে হতে পারে। এই টেবিলগুলো এমনভাবে তৈরি করানো হয় যাতে দরকার পড়লে প্রসবের সময় এদের নিচের অর্ধাংশ খুলে রাখা চলে। এভাবে খুলে রাখলে প্রসূতির নিতম্ব টেবিলের একেবারে কানা-বরাবর থাকবে।

প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তরের শেষ বা চরম পর্যায় হচ্ছে শিশুর জন্ম। এই পর্যায়ে আস্তে আস্তে প্রসূতির যোনিমুখটি প্রসারিত হতে থাকে এবং শিশু ক্রমে ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়।

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে প্রসূতির যোনিপথের মধ্যে নেমে আসার পর শিশুর মাথার চাপ প্রথমত গিয়ে পড়ে প্রসূতির মলনালির দেয়ালে। এর পর শিশুর মাথাটি সামনের দিকে উঁচু হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ ধাক্কা দিয়ে দিয়ে প্রসূতির যোনিমুখটি খুলতে থাকে। যোনিমুখ ক্রমশ প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে শিশু মাথার চাঁদিটি অল্পে অল্পে দেখা দেয়।

কাটা-ছেঁড়া ও সেলাই—যোনিমুখের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এইভাবে শিশুর মাথার চাঁদি দুই কি তিন ইঞ্চি পরিমাণ দেখা দেওয়ার সময়ই চিকিৎসককে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, প্রসূতির দেহের ওই অংশের মাংসপেশী ইত্যাদি যথোপযুক্ত পরিমাণে নমনীয় বা সম্প্রসারণশীল কিনা এবং ওই পেশীগুলি প্রসারিত হতে হতে ইতিমধ্যেই চরম সীমায় পৌঁছে গেছে কিনা, অর্থাৎ যোনিমুখটি ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কিনা। যোনিমুখ এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ডাক্তারবাবুকে মনস্থির করতে

হয়, তিনি প্রসূতির ওই অঙ্গে "এপিসিওটমি" করবেন কিনা, অর্থাৎ যোনিমুখটি নিচের দিকে লম্বালম্বি কিংবা স্থানবিশেষে আড়াআড়ি ভাবে অল্প একটু চিরে দেওয়ার মতো ছোট্ট একটি অস্ত্রোপচার করবেন কিনা।

অবশ্য এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসকেরই জ্ঞাতব্য ও করণীয়, প্রসূতির নয়। তবু এখানে এর উল্লেখ করা হল এই কারণে যে বহু মেয়েকে এই অস্ত্রোপচার ও বিশেষ করে এর পরবর্তী 'সেলাই' সম্বন্ধে অনাবশ্যকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে দেখা যায়। অবশ্য এটা ঠিক, সন্তানপ্রসবের মতো এমন একটি স্বাভাবিক ব্যাপারে প্রায় সব ক্ষেত্রেই যে এপিসিওটমির মতো ছোটখাট একটি অস্ত্রোপচার করতে হয়—এটি মেনে নেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। প্রসবের পর প্রায়ক্ষেত্রেই প্রসূতি ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চান তাঁকে "কতগুলো সেলাই দেওয়া হল"। ডাক্তাররাও সব কিছু বুঝিয়ে বলার ঝামেলা এড়ানোর জন্যে তাঁদের কৌতূহল মেটান এই বলে যে দুই, তিন, চার কি পাঁচটা সেলাই পড়েছে। কিন্তু প্রসূতির মনে রাখা দরকার যে এই রকম সেলাই-এর সংখ্যা গণনার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। প্রসূতির আরো জানা দরকার, সন্তানপ্রসবের সময় যোনিমুখ আপনা থেকে না ফাটলে কথাই নেই। সে তো কি প্রসূতি কি ডাক্তার সকলেরই কাম্য। কিন্তু যদি তা ফাটবার উপক্রম করে এবং আপনা থেকে ফেটে যায় তাতে ভবিষ্যতে প্রসূতির যতখানি অস্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষতির সম্ভাবনা, আপনা থেকে ফাটবার আগেই ডাক্তারবাবু যোনিমুখে এপিসিওটমি করলে ক্ষতির সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক কম। আপনা থেকে ফাটলে যোনিমুখ আঁকাবাঁকা রেখায় ফাটবে, জায়গাটি থেঁতলে যাবে এবং শুকোতেও দেরি লাগবে। অথচ ডাক্তারবাবু ছুরি দিয়ে চিরে দিলে রেখাটি সরল হবে ও সেলাইও সহজসাধ্য হবে। ফলে ঘাও শুকোবে তাড়াতাড়ি ও দাগ থাকবে না। তাছাড়া ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা এই যে আপনা থেকে ফাটার চেয়ে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের ফলে প্রসূতির ওই অঙ্গের পেশীগুলি

অপেক্ষাকৃত বেশি অটুট ও কার্যক্ষম থাকে। এর ফলে প্রসূতির পরবর্তী জীবনে যোনির মধ্যে মূত্রথলি ও মলনালি ঢুকে যাওয়া কিংবা জরায়ুমুখটা যোনিমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা, প্রভৃতি বিরক্তিকর উপসর্গ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

পরিশেষে, এই ধরনের কাটা-ছেঁড়ায় ও সেলাই-এর সময় প্রসূতি কতটা বেদনা অনুভব করবেন সে-সম্পর্কে দু-একটি কথা। বলা বাহুল্য, যে-সব প্রসূতি এ-সময়ে ঘুমের ওষুধ কিংবা জ্ঞাননাশক ওষুধের প্রভাবে থাকবেন কিংবা যাঁদের ওই বিশেষ অঙ্গটি ইন্‌জেকশনের সাহায্যে অসাড় করে দেওয়া হবে তাঁরা প্রায় কেউই এতে বিন্দুমাত্র বেদনা অনুভব করবেন না, কিংবা টেরই পাবেন না। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ-সময়ে ওই অঙ্গের মাংসপেশীগুলি এতদূর বিস্ফারিত হয়ে থাকবে এবং একই সঙ্গে শিশুর মাথাটি ভূমিষ্ঠ হবার উপক্রম করবে যে তার ফলে অঙ্গটি রীতিমতো অসাড় হয়ে থাকবে। ফলে, প্রসূতির জ্ঞান থাকলেও, সাধারণ অবস্থায় শরীরের কোনো অঙ্গে কেটে-ছড়ে গেলে যতটা লাগে, এ-সময়ে নিশ্চয়ই তিনি তার চেয়ে কম বেদনা অনুভব করবেন।

শিশুর জন্ম—আগেই বলা হয়েছে, প্রসববেদনার এই দ্বিতীয় স্তরে প্রসূতি প্রায় ক্ষেত্রেই আপনা থেকে দম বন্ধ করে ও পেটের পেশীগুলি অনবরত সংকুচিত করে কোনো কিছুকে ঠেলে নিচের দিকে বের করে দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। পায়খানা সাংঘাতিক কষে গেলে লোকে যেভাবে জোর করে মলত্যাগ করার চেষ্টা করে, এ যেন অনেকটা সেই রকম। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এই চেষ্টার ফলে আপনাআপনি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। অনেক সময় ডাক্তারবাবু কিংবা তাঁর সহযোগী নার্স প্রসূতিকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন। প্রসূতির পেটে অল্পে অল্পে চাপ দিয়ে তিনি পেশীর সংকোচনকে বাড়িয়ে তোলেন। শিশুর মাথা কি গতিতে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে (অর্থাৎ মাথাটি যাতে আচমকা সজোরে বেরিয়ে পড়ে

যোনিমুখকে গুরুতরভাবে ফাটিয়ে না-দেয়) এ-সময়ে ডাক্তারবাবু সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

শিশুর মাথা যোনিমুখ ছেড়ে বেরোতে শুরু করলে ডাক্তারবাবু হাত বাড়িয়ে শিশুর ভ্রূর কাছে কপালের দু-পাশ ধরতে চেষ্টা করবেন। এটা ধরতে পারলে তিনি তখন একাই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, প্রসূতির তরফ থেকে সাহায্যের আর দরকার হবে না। অতঃপর, দরকার হলে, প্রসূতি শরীর এলিয়ে দিতে পারবেন।

সাধারণত শিশুর মাথাটি ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসে ও ভূমিষ্ঠ হয়। মাথাটি যোনিমুখ বরাবর প্রথম দেখা দেওয়ার সময় শিশুর চিবুক বা থুতনিটি তার বুকের ওপর নামানো বা সোজা থাকে। অতঃপর যোনিমুখের বাধা অতিক্রম করার পর প্রথমে মাথার চাঁদি, তারপর একে একে কপাল, ভ্রূ, নাক ও অবশেষে থুতনি বাইরে বেরিয়ে আসে।

এরপর শিশুর মাথাটি তার নিজের শরীরের সঙ্গে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য-পূর্ণ অবস্থায় আসার জন্য ঘুরতে থাকে। তার শরীর কিন্তু তখনও প্রসূতির দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর পিঠ প্রসূতির বাঁ-দিকে ঘোরানো থাকে। এই সময়ে ডাক্তারবাবু আস্তে আস্তে টেনে টেনে শিশুর একটা কাঁধ প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের সামনের দিককার হাড়ের খিলানের ঠিক তলায় নিয়ে আসেন এবং শিশুকে সামান্য একটু তুলে ধরে তার অপর কাঁধটি যোনিমুখ থেকে ছাড়িয়ে নেন। অতঃপর, শিশুর জন্ম সম্পূর্ণ হয়।

ফর্‌সেপ্‌স্‌ বা চিমটের সাহায্যে প্রসব—মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক প্রসূতিই যে সক্রিয়ভাবে ঠেলে-নিচের-দিকে-বের-করে-দেবার চেষ্টার ফলে আপনা থেকে সন্তানপ্রসব করতে পারেন তা নয়। বহুক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে এভাবে চেষ্টা করলে অনেকে যে শেষপর্যন্ত সফল হন না তা নয়, কিন্তু ব্যাপার এই যে ডাক্তাররাই অনেকে প্রসূতিকে

অনেকক্ষণ ধরে হয়রান করতে নারাজ হন। তাঁরা মনে করেন, এর ফলে বিশেষ-যে কিছু সুফল ফলে তা নয়। যে-কোনো প্রকারে হোক প্রাণপাত করে প্রসূতিকে "স্বাভাবিক" প্রসব করতেই হবে—এঁরা বলেন—তার কোনো মানে নেই।

স্বাভাবিক প্রসবের বেলা শিশুর মাথাটি মুগুরের মতো অনবরত ঘা দিয়ে দিয়ে প্রসূতির যোনিমুখ ক্রমশ বিস্ফারিত করে তোলে। এর ফলে, করোটির হাড়ের ওপর রক্ত জমে যাওয়ার দরুন জন্মের পর অনেক শিশুর মাথার চাঁদি বেশ খানিকটা ফুলে থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে ফর্‌সেপ্‌স্‌ বা প্রসবের জন্যে ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরনের ডাক্তারি চিমটে ব্যবহার করলে শিশুর নরম ও নমনীয় করোটির হাড় ও তার মধ্যেকার মস্তিষ্কের ওপর চাপ পড়ে না। কেননা এই চিমটে দিয়ে শিশুর মাথার নিচে চোয়ালের হাড় দু-দিক থেকে চেপে ধরা হয়।

অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে প্রতিটি প্রসবের বেলাতেই ফর্‌সেপ্‌স্‌ ব্যবহার করতে হবে। একমাত্র যেখানে এটি অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে সেখানে ডাক্তারবাবু চিমটে ব্যবহার করবেন কিনা স্থির করেন।

জন্মের পর—ভূমিষ্ঠ হবার পরমুহূর্তেই নবজাতকের শুশ্রূষা। প্রসূতি নন (কেননা এ-সময়ে তাঁর কোনো কিছু করার ক্ষমতাও থাকে না), শুশ্রূষা করেন ডাক্তার ও নার্স। আগেকার দিনে রীতি ছিল, জন্মের পরমুহূর্তেই শিশুর পাছায় সজোরে একটি চাপড় মেরে তাকে কাঁদানো। বহুদিনের প্রত্যাশিত নবজাতকের কান্না! বর্তমানে অবশ্য এ-রীতির তেমন চল নেই। আজকাল, জন্মের পর প্লাসেণ্টার সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতেই (প্লাসেণ্টা বা ফুলটি এ-সময়েও জরায়ুর মধ্যে রয়ে গেছে) শিশুকে মায়ের পেটের ওপর, মাথাটি একটু নিচের দিকে ঝুলিয়ে, শুইয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে শ্লেষ্মা, রক্ত ও অন্যান্য জলীয় পদার্থ যা-কিছু প্রসূতির দেহ থেকে নির্গত হয়ে শিশুর মুখের

মধ্যে ঢুকে ছিল, সে-সমস্ত বের করে ফেলা সম্ভব হয়।

কাচের চুষি-লাগানো একটি নরম রবারের নলের সাহায্যে কোনো কোনো হাসপাতালে নবজাত শিশুর নাক ও গলা থেকে এই সব জলীয় পদার্থ বের করে ফেলার ব্যবস্থা আছে। ফলে শ্বাস টানতে শুরু করার আগেই তার নাক ও গলার বায়ু-চলাচলের রাস্তাটা পরিষ্কার করা সম্ভব হয় এবং ফুসফুসের মধ্যে বাইরের ওই সব জলীয় পদার্থ ঢুকতে পায় না। তাছাড়া, বিশেষ করে শিশুর নাকের মধ্যে রবারের নল ঢুকিয়ে ওইভাবে শুষে নেওয়ার ফলে, তার নাক সুড়সুড় করে হাঁচি-কাশি দেখা দেবে, আর তারই সঙ্গে শোনা যাবে নবজাতকের প্রথম কান্না। কাজেই আজকাল আর চড় মেরে শিশুকে কাঁদাবার দরকারও যেমন পড়ে না, তেমনি শিশুর নাক-মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করার আগে ডাক্তাররা তাঁকে কাঁদাতে চানও না।

স্বাভাবিক ক্ষেত্রে নবজাত শিশু সাধারণত ভূমিষ্ঠ হবার মিনিট খানেকের মধ্যেই কেঁদে ওঠে। শিশু কেঁদে ওঠে কেন এ-নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত। এখানে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তাহলে শিশুর জন্মের পর প্রথম কাজ হল, শিশুর নাক-মুখ পরিষ্কার করে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের পথ সুগম করা। এরপর, শিশু কেঁদে উঠলে পর, দ্বিতীয় কাজ হল, তার নাড়ি কাটা। সাধারণত দু-দিকে গোটা দুই ডাক্তারি ক্ল্যাম্পের সাহায্যে নাড়ির মধ্যেকার রক্ত-চলাচল বন্ধ করে মাঝখান থেকে নাড়িটি কাটা হয়। নাড়ি কাটার পর শিশুকে মায়ের কাছ থেকে স্থানান্তরিত করা হয়।

সাধারণত নাড়ির যে-অংশ শিশুর শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে সেটির একটি কি দুটি জায়গায় এক বিশেষ ধরনের সুতোর বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। শিশুর নাভিমূল থেকে এক ইঞ্চির চারভাগের তিনভাগ অংশ বাদ দিয়ে তার ওপরে নাড়ির গায়ে এই বাঁধন দেওয়া হয়। নাড়ির এই অংশটুকু দিনে দিনে শুকিয়ে কালো হয়ে যায় এবং

অবশেষে শিশুর জন্মের পর সাত দিন থেকে দশ দিনের মধ্যে আপনা থেকে ঝরে যায়।

প্রসববেদনার তৃতীয় স্তর

"ফুল" পড়া—শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রসববেদনার দ্বিতীয় স্তর সাঙ্গ হল। কিন্তু তখনও প্লাসেণ্টা বা ফুলটি প্রসূতির জরায়ুর মধ্যে রয়ে গেছে। গর্ভফুলের সঙ্গে সংযুক্ত নাড়িটি তখনও যোনিমুখ দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে এবং তার শেষাংশে ক্ল্যাম্প লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করা হয়েছে। এই ক্ল্যাম্পটি খুলে নিলে নাড়ি থেকে যে রক্তপাত হবে, সে-রক্ত প্রসূতির নয়, শিশুর। কাজেই অন্য কোনো কারণে নয়, নিছক পরিচ্ছন্নতার জন্যেই এ-রক্তপাত বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

প্রসূতি-ভেদে জরায়ুর দেয়াল থেকে গর্ভফুল খসে পড়ার সময়ের তারতম্য ঘটে। এটি ঘটতে শিশুর জন্মের পর কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হতে পারে।

স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে—যেখানে প্রসূতিব ওপর যন্ত্রণা-উপশমের কিংবা জ্ঞানলোপের কোনো ওষুধ প্রয়োগ করা হয়নি, সেখানে—শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রসববেদনার অবসান ঘটে না। প্রসবের পরই অবশ্য প্রসূতির জরায়ু বেশ খানিকটা কুঁকড়ে যায়, ফলে প্রসূতি কয়েক মিনিট শান্তভাবে শুয়ে থাকার অবকাশ পান। তারপর ফের আবার যন্ত্রণাভোগের পালা শুরু হয়। এ-সময়ে প্রসূতির জরায়ু ফের সংকুচিত হয়ে হয়ে তার মধ্যেকার খসে পড়া গর্ভফুলটিকে বাইরে বের করে দেবার চেষ্টা করতে থাকে।

জরায়ুর দেয়াল থেকে গর্ভফুলটি খসে পড়ার সময় ওই ফুলের পেছনে জমা রক্ত একটা ক্ষীণ ধারায় যোনির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। এরপর জরায়ুর সংকোচনের ফলে ফুলটিও জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসে। যোনিপথের মধ্যে এসে এটি খানিকটা আটকে যায় বা চাপ সৃষ্টি করে। এ-অবস্থায় প্রাকৃতিক তাগিদেই প্রসূতি ফের সেটাকে ঠেলে নিচের দিকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন

বা কোঁত পাড়তে থাকেন। ফলে আবার খানিকটা রক্তস্রাবের সঙ্গে গর্ভফুলটি বাহিরে বেরিয়ে আসে।

"ফুল" বের করা—স্বাভাবিক প্রসবের কথা ওপরে বলা হল। কিন্তু যে-সব প্রসূতি যন্ত্রণা উপশমের ওষুধ কিংবা জ্ঞাননাশক ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, তাঁদের বেলা একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বনের দরকার হতে পারে। জরায়ুর দেয়াল থেকে ফুলটি বিচ্ছিন্ন হবার পর ফুলটিকে বাইবে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে এঁরা স্বভাবতই নিজের শরীরের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে পারেন না। এঁদের ক্ষেত্রে তাই ডাক্তারবাবু বাইরে থেকে জরায়ুর এই সময়কার অবস্থান বুঝে নিয়ে, কিংবা ওই পূর্বোক্ত রক্তের ধারাটি যোনিমুখ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে, স্থির করেন ফুলটি কখন জরায়ুর দেয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হল। অতঃপর তিনি প্রসূতির পেটে হাত দিয়ে বাইরে থেকেই জরায়ুটিকে চেপে ধরেন এবং আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকেন। এইভাবে প্রসূতির সহযোগিতা ব্যতিরেকেই ফুলটিকে বাইরে বের করে ফেলা সম্ভব হয়।

এছাড়া অন্যান্য অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে—যেমন, যেখানে অত্যধিক রক্তপাত হচ্ছে এবং ফুলটি সহজে বেরিয়ে আসছে না—চিকিৎসকের হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এ-সব ক্ষেত্রে জ্ঞান-লোপকারক ওষুধের সাহায্যে প্রসূতিকে আচ্ছন্ন করে তারপর চিকিৎসক প্রসূতির জরায়ুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেন। ফুল জরায়ুর দেয়াল থেকে খসে জরায়ুর থলির মধ্যে আলগাভাবে পড়ে থাকলে অবশ্য ডাক্তারবাবুর কাজ সহজ হয়। তিনি সরাসরি সেটিকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বাইরে বের করে আনেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে—যেখানে হয়তো গর্ভফুলের একটা কোণ মাত্র খসেছে কিন্তু বাকি অংশটুকু জরায়ুর দেয়ালে তখনো সেঁটে আছে এবং সেই সঙ্গে রক্তস্রাবও সমানে চলেছে—ডাক্তারবাবুকে অপেক্ষাকৃত সতর্ক হতে হয়। জরায়ুর দেয়াল থেকে ফুলটিকে ছাড়িয়ে আনা অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ,

কেননা দেয়ালের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তেমন দৃঢ় নয়। ব্যাপারটা অনেকটা কোনো এক সমতল জায়গায় সেঁটে-থাকা ভিজে কাগজ ছাড়ানোর মতোই। তবে কাজটা খুব আস্তে-আস্তে সতর্কভাবে করতে হয় এবং লক্ষ্য রাখতে হয় সমগ্র গর্ভফুল-অঙ্গটিই যাতে আস্তো বের করে আনা যায়। কেননা তার কোনো অংশ ছিঁড়ে ভেতরে থেকে গেলে ঠিক কতটা ভেতরে রইল এবং সেই অবশিষ্টাংশের সবটুকুই বেরোল কিনা তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

কিন্তু ফুল যদি একটু অস্বাভাবিক দৃঢ়ভাবে জরায়ুর দেয়াল কামড়ে থাকে, তাহলে এমন কি খুব অভিজ্ঞ ও সুপটু ডাক্তারের পক্ষেও সবক্ষেত্রে ফুলটিকে আস্তো বের করে আনা সম্ভব হয় না। এ-সব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুকে দোষী করে কোনো লাভ নেই। কেননা, এমন কোনো উপায় জানা নেই যার দ্বারা ডাক্তারবাবু নিশ্চিত হতে পারেন যে সবটুকু ফুলই বেরিয়ে এসেছে। এমন ঘটনা খুব দুর্লভ নয় যেখানে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে ডাক্তার হয়তো নিশ্চিন্ত হলেন যে আস্তো ফুলটাই বেরিয়ে এসেছে, অথচ তার কয়েকদিন পরে ওই ফুলেরই বেশ বড় একটা ছেঁড়া অংশ ফের জরায়ুর মধ্যে থেকে নির্গত হতে দেখা গেল।

তবে গর্ভফুলের ছেঁড়া অংশ এইভাবে জরায়ুর মধ্যে থেকে গেলে অনেক সময়ই তা পরে—কখনো কখনো বেশ কিছুদিন পরেও—আপনা থেকে বেরিয়ে যায়। এবং এজন্যে প্রসূতিকে কোনো কষ্ট পেতে হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এর জন্যে প্রসবের এক বা একাধিক সপ্তাহ পরেও বেশ বেশিরকম রক্তস্রাব ঘটতে দেখা যায়। কখনো-বা এ-কারণে সদ্য-প্রসূতিকে তাঁর জরায়ুর দেয়াল কিউরেট করিয়ে বা চাঁছিয়ে ফুলের অংশবিশেষ বা টুকরোগুলি বের করে ফেলার জন্যে ফের হাসপাতালে এসে ভর্তিও হতে হয়।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে জরায়ু থেকে গর্ভফুল নিষ্কাশিত হবার পর এবং যোনিদেশে অস্ত্রোপচার হয়ে থাকলে সেই চেরা অংশে সেলাই সারা হলে তবেই প্রসব-পর্ব সমাধা হল বলে ধরা হয়।

রক্তস্রাব ও "হেঁতাল-ব্যথা" বা প্রসব পরবর্তী বেদনা—হাসপাতালের একটি সাধারণ নিয়ম এই যে প্রসবের পরও সদ্য-প্রসূতিকে আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা বেশি সময় লেবর-রুমে রাখা। প্রসবের পর জরায়ুর দৃঢ়ভাবে সংকুচিত হয়ে থাকাটা স্থায়ী হচ্ছে কিনা তাই লক্ষ্য করার জন্যে এই ব্যবস্থা। কেননা জরায়ুর পেশী শক্তভাবে গুটিয়ে না-থেকে যদি ঢিলে হয়ে যায় তাহলে মায়ের রক্তবহা নালিগুলোর মুখ আবার খুলে যেতে পারে এবং ফের রক্তস্রাব শুরু হতে পারে। এ-কারণে এ-সময়ে প্রসূতিকে কিছুক্ষণ লেবর-রুমে আটকে রেখে একজন নার্স সদাসর্বদা তাঁর দিকে নজর রাখেন। এমন কি এর পরেও প্রসূতি যে ক-দিন হাসপাতালে থাকেন সেই ক-দিনই তাঁর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, কেননা এ-সময়ে যে-কোনো মুহূর্তে ফের ওই রক্তস্রাব শুরু হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনমতো ডাক্তারবাবু প্রসূতিকে জরায়ুর পেশী-সংকোচনে সাহায্য হতে পারে এমন ওষুধও—যেমন আরগট নামের উপাদান মিশ্রিত কিংবা পিটুইটারি গ্রন্থির পেছনের অংশের গ্রন্থিক্ষরণ জাতীয় ওষুধবিষুধ—এ-সময়ে দিয়ে থাকেন।

বিশেষ করে যে-সমস্ত প্রসূতির ইতিপূর্বেই এক বা একাধিক সন্তানাদি হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে এ-সময়ে জরায়ুর পেশী অল্পবিস্তর শিথিল হয়ে যাওয়া ও রক্তস্রাব ঘটা অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাভাবিক। তবে এঁদের বেলায় জরায়ুর পেশী একবার আলগা হবার পরই দ্বিগুণ জোরে সংকুচিতও হয়। এই সংকোচনের ফলে এঁদের পেটে প্রসবের পরও এক ধরনের যন্ত্রণা হয়। এই প্রসব-পরবর্তী বেদনাকে চলতি কথায় বলে, "হেঁতাল-ব্যথা"।

তিন | প্রসবকালীন জটিলতা

প্রসবকালীন জটিলতা সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এটি সম্পূর্ণরূপেই চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য বিষয়। এ-ব্যাপারে প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই প্রসূতির করণীয় যেমন কিছু থাকে না, তেমনি তাঁর জ্ঞাতব্যও থাকে সামান্যই। এ-কারণে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই জটিলতার ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

সীজারিয়ন সেকসন—কোন্ বিশেষ বিশেষ প্রসূতির ক্ষেত্রে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করতে হবে গর্ভাবস্থার গোড়ার দিকে তা ডাক্তারবাবুর পক্ষেও বলতে পারা সম্ভব নয়। এই বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপচারটি সম্পর্কে আমাদের দেশের কিছু কিছু শহুরে প্রসূতির মনে অস্বাভাবিক ভয় আছে, দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকে গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই ডাক্তারবাবুকে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিজের প্রসব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের হাড়ের কাঠামোর নিচে যে দরজা আছে – শিশু যার মধ্যে দিয়ে গলে এসে ভূমিষ্ঠ হয়- তার আকৃতি, প্রসবের সময়ে-সময়ে গর্ভস্থ শিশুর আকার (শিশুর পক্ষে ওই দরজা দিয়ে গলে আসা সম্ভব হবে কিনা তাই নির্ণয় করার জন্যে), ওই সময়ে শিশুর অবস্থানের ধরন, জরায়ুর পেশীগুলির অবস্থা ও কর্মক্ষমতা, ইত্যাদি বহু প্রকারের তথ্য গর্ভাবস্থার গোড়ার দিকে কিংবা এমন কি মাঝামাঝি সময়েও ডাক্তারবাবুর পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ফলে প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই এ-বিষয়ে প্রসূতির কৌতূহল চরিতার্থ করা ডাক্তারবাবুর পক্ষে সম্ভব হয় না। একমাত্র গর্ভাবস্থার শেষ বা নবম মাসে

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সাহায্যে ডাক্তারবাবু খানিকটা বোঝবার চেষ্টা করতে পারেন যে প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের উপরোক্ত হাড়ের দরজা শিশুর গলে আসার পক্ষে উপযুক্ত কিনা। তবে এ পরীক্ষা সফল হবে কিনা, কিংবা শুধুমাত্র গর্ভস্থ শিশু নিচের দিকে গলে বেরিয়ে আসতে পারে এইটুকু জানতে পারলেই সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার সম্পর্কে আগে থাকতে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া চলে কিনা, তা রীতিমতো সন্দেহের বিষয়।

প্রসূতির জানা দরকার যে বর্তমানে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার সম্পর্কে অতিরিক্ত ভয় পাবার কোনো হেতু নেই। সত্যি বটে, কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই অস্ত্রোপচারটিকে ডাক্তাররাও বেশ কিছুটা ভয়ের চোখে দেখতেন। কিন্তু যুগ পালটেছে। এখন এই অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে এবং সাল্‌ফা-জাতীয় ও বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রুপের রোগ-সংক্রমণনিরোধক মহৌষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কাজেই সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার এখন যথেষ্ট নিরাপদ চিকিৎসা—একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

আগে যে-সব প্রসূতির বেলায় সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করার দরকার বোধ হত সে-রকম সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রসববেদনা শুরু হবার আগে অস্ত্রোপচার করা হত। রোগ-সংক্রমণ নিরোধের জন্যেই সে-সময়ে এই সাবধানতাটি অবলম্বন করা হত। বর্তমানে কিন্তু অবস্থা দাঁড়িয়েছে উল্টো। এখন প্রসূতিকে কিছু সময় প্রসববেদনা ভোগ করতে দেওয়ার পরই সাধারণত চিকিৎসকরা এই অস্ত্রোপচারটি করা পছন্দ করেন। এমন কি স্বাভাবিক প্রসব সম্ভব নয় আগে থেকে এরকম ধারণা জন্মালেও তাঁরা এই আশায় প্রসূতিকে কিছু সময় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেন যে হয়তো তাঁদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে স্বাভাবিক প্রসব সম্ভব হলেও হতে পারে। অতঃপর প্রসববেদনা ঠিকমতো পাকিয়ে না উঠলে অগত্যা তাঁরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন।

সীজারিয়ন অস্ত্রোপচারটি পেটের অন্য যে-কোনো অস্ত্রোপচারেরই

সামিল। অস্ত্রোপচারের আগে প্রসূতিকে সাধারণত সর্বাঙ্গীণ জ্ঞাননাশক ওষুধের সাহায্যে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়। অতঃপর অধিকাংশ অস্ত্র-চিকিৎসকই প্রসূতির নাভিমূলের একটু ওপর থেকে বস্তি-প্রদেশ পর্যন্ত লম্বালম্বি ওপর থেকে নিচে পেটের মাঝামাঝি চিরে ফেলেন। এছাড়া, এভাবে পেট চেরায় যাঁরা আপত্তি জানান তাঁদের কিংবা অতিরিক্ত মোটা মেয়েদের ক্ষেত্রে, বস্তি-প্রদেশের নিচের দিকে আড়াআড়িভাবে ও নিচের দিকে বেঁকিয়ে অস্ত্রোপচার করার অপর একটি পদ্ধতিও আছে।

তবে পেটের অন্য প্রায় সব ধরনের অস্ত্রোপচারের চেয়ে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচারের পরেকার অস্বাচ্ছন্দ্য কম হওয়ার সম্ভাবনা। এই অস্বাচ্ছন্দ্য প্রধানত পেট ফাঁপা ও তজ্জনিত বেদনা হিসেবে দেখা দেয়। মোট কথা, স্বাভাবিক প্রসবের পর সুস্থ হয়ে উঠতে প্রসূতির যত সময় লাগে, এই অস্ত্রোপচারের পরও প্রসূতি প্রায় সেই সময়ের মধ্যে সেরে ওঠেন। এবং অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতালে সাধারণত দিন আষ্টেকের বেশি থাকার দরকার করে না।

সীজারিয়নের পরবর্তী গর্ভ সম্পর্কে—একটি প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায় : সীজারিয়ন অস্ত্রোপচারের পর প্রসূতির ভবিষ্যৎ কি? তাঁর পক্ষে পুনর্বার গর্ভধারণ কি উচিত? কিংবা একবার কোনো প্রসূতির দেহে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করতে হলে তাঁর পক্ষে পরে আর স্বাভাবিক প্রসব সম্ভব কি?

আগে একথা প্রায়ই শোনা যেত যে একবার যাঁর দেহে সীজারিয়ন করতে হয়েছে প্রতিবারই তাঁর দেহে সীজারিয়ন করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে চিকিৎসা-জগতে কিন্তু এ-সম্পর্কে দ্বিমত শোনা যাচ্ছে। বস্তি-প্রদেশের হাড়ের দরজা ছোট হওয়ার জন্যে ছাড়া অন্যবিধ কারণে যে-সব প্রসূতির দেহে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, বিশেষ করে এই শেষোক্তদের বেলা পরের বার খুব স্বাভাবিকভাবে প্রসববেদনা

পাকিয়ে-ওঠা ও প্রসব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রশ্ন এই, এঁদের এইভাবে স্বাভাবিক প্রসবের জন্যে ছেড়ে রাখাটা কি উচিত? এর ফলে এঁদের আগের বারের কাটা জায়গাটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কি প্রবল নয়? এবং এইভাবে আগের বারের সেলাই-করা জায়গাটা ফাটার চেয়ে নতুন করে দ্বিতীয়বার সীজারিয়ন করাটা কি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও নিরাপদ নয়?

যদিও এইসব প্রশ্নের জবাবের ব্যাপারে চিকিৎসকরা সবাই একমত নন, তবু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ-সমস্ত ক্ষেত্রে প্রসূতির স্বাভাবিক প্রসবের জন্যে দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করা ও প্রসূতির কাটা ঘায়ের দিকে নজর রাখার চেয়ে তাঁর দেহে দ্বিতীয়বার সীজারিয়ন করাই অনেক সহজ সরল কাজ। এই কারণেই একবার যে প্রসূতির দেহে সীজারিয়ন করা হয়েছে, ডাক্তাররা পরের বার কিংবা তার পরেও তাঁর দেহে ওই একই অস্ত্রোপচার করে থাকেন। করতে বাধ্য বলে নয় অবশ্য, করাটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে।

একবার যে-মেয়ের দেহে সীজারিয়ন হয়েছে তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার আবার গর্ভধারণ করা কি উচিত, কিংবা এ-হেন মহিলা সবসুদ্ধ ক-বার গর্ভধারণ করতে পারেন— এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। নিশ্চয়ই প্রসূতিভেদে এ-সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। যদি এ-ধরনের কোনো মেয়ে একাধিক সন্তানের মা হতে অভিলাষী হন এবং একাধিক অস্ত্রোপচারের ধকল সহ্য করার মতো শারীরিক শক্তি যদি তাঁর থাকে, তাহলে তাঁকে জোর করে বাধা দেবার মানে নেই। তবে সাধারণভাবে এদেশের মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থা যা তাতে খুব বেশি সংখ্যক মেয়ের পক্ষে একবার কি বড় জোর দু-বারের বেশি এ-ধরনের ঝুঁকি নেওয়া বোধহয় উচিত হবে না।

ত্বরান্বিত প্রসববেদনা

খাঁটি প্রসববেদনা স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবার আগেই কৃত্রিম উপায়ে ওই বেদনা ও সন্তানপ্রসব ত্বরান্বিত করা সম্ভব। খাঁটি প্রসববেদনা

দেখা দেবার আগে প্রাথমিক টান-ধরা বা ফিক-ব্যথার পর্যায়ে এই সব কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়। বিশেষ করে যে-সব প্রসূতির দেহে রক্তদুষ্টি-রোগ দেখা দেয় কিংবা যাঁদের প্রসবের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যায় অথচ তখনও আসল প্রসববেদনা শুরু হয় না, তাঁদের বেলাতেই এই পদ্ধতি নেওয়া হয়।

ত্বরান্বিত প্রসববেদনার নানা পদ্ধতি– এর নানা পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হল, প্রসূতিকে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ানো। অবশ্য প্রসূতির আসল প্রসববেদনা আপনা থেকে শুরু হব-হব অবস্থায় এটি পড়লে তবেই এর পুরো ফল পাওয়া যায়।
এছাড়া আরো একটি পদ্ধতির চলও আজকাল বাড়ছে। সেটি হল, প্রসূতির দেহে ইন্‌জেক্‌শনের সাহায্যে পিটুইট্রিন নামে পিটুইটারি গ্রন্থির গ্রন্থিক্ষরণটি ঢুকিয়ে দেওয়া। তবে মাংসপেশী কিংবা চামড়ার নিচে নয়, এই ইন্‌জেক্‌শনটি একটু অভিনব কায়দায় দেওয়া হয়। পিটুইট্রিন নামের গ্রন্থিক্ষরণটি খুব কড়া বলে, মাত্র এক কিউবিক সেন্টিমিটার (1c.c) পিটুইট্রিন গ্লুকোজ কিংবা স্যালাইন সলিউশন-মিশ্রিত এক হাজার কিউবিক সেন্টিমিটার জলে গুলে পাতলা করে নিতে হয়। তারপর সেটি খুব আস্তে আস্তে ফোঁটায় ফোঁটায় সূচের সাহায্যে প্রসূতির শিরায় বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দিতে হয়। এর ফলে জরায়ুর মাংসপেশীর সংকোচন রীতিমতো বেড়ে ওঠে। জরায়ু তৈরি থাকলে এর ফলেই আসল প্রসববেদনা শুরু হয়ে যায়।
এ তো গেল কৃত্রিম পদ্ধতির কথা। এছাড়া, বিশেষ করে প্রসূতির জরায়ুর নিম্নাংশ পাতলা হয়ে যাওয়ার ও জরায়ু-মুখ খানিকটা খোলার পর যদি তাঁর জলের থলিটি ফেঁসে যায় তাহলে তার ফলে আপনা থেকেই তাঁর প্রসববেদনা ত্বরান্বিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। বিশেষত, জলের থলিটি ওইভাবে ফাঁসার পর অবস্থা বিবেচনা করে তার সঙ্গে পিটুইট্রিন ইন্‌জেক্‌শন দিতে পারলে তার ফলাফল প্রায় অব্যর্থ হয়ে থাকে।

অপরিণত বা অকাল-প্রসব

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, প্রসূতির অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা নবম মাসে পৌঁছনোর আগে এবং গর্ভস্থ শিশুর ওজন সাড়ে চার পাউণ্ডের কম থাকতে প্রসববেদনা দেখা দিলে ও শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে অপরিণত বা অকাল-প্রসব বলা হয়।

অকালপ্রসবের ফলে শিশুমৃত্যুর হার সব দেশেই বেশ বেশি। বিশেষ করে খুব অল্পবয়স্ক প্রসূতি এবং যে-সব প্রসূতি যথোচিত পুষ্টিকর খাদ্য পান না তাঁদের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব নজরে পড়ে। অথচ, দুঃখের বিষয়, অকাল-প্রসবের কোনো বিশেষ প্রতিকারের উপায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের জানা নেই।

প্রসবের স্বাভাবিক সময়ের আগে আট কি নয় সপ্তাহের মধ্যে জন্মালে ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুর পক্ষে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দশ সপ্তাহ কি তারও আগে জন্মালে না বাঁচার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে ওঠে।

অকাল-প্রসবের সময় প্রসববেদনার ধরন স্বাভাবিক প্রসবের সময়কার মতোই হয়। গর্ভস্থ শিশুর বাঁচার সম্ভাবনা আছে বলে ধারণা জন্মালে ডাক্তারবাবু এ-সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুর মঙ্গলের জন্যে প্রসূতির ওপর যন্ত্রণা-লাঘবকারী ওষুধ প্রয়োগ করবেন না। বড় জোর স্থানীয়ভাবে অসাড় করে দেবার ওষুধ দেবেন।

এ-সব ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশু ছোট ও অপরিণত থাকে বলে প্রসবের সময় বিশেষ কোনো ঝামেলা হয় না। কেবলমাত্র অল্প দু-চারটি ক্ষেত্রে, যেখানে প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের কাঠামো নিতান্তই সরু কিংবা গর্ভস্থ শিশুর অবস্থানটি অস্বাভাবিক, সেখানে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। অকাল-প্রসবের বেলা প্রায়ই শিশুকে পাছা-নিচের-দিকে-করা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হতে দেখা যায়। তবে শিশুর দেহ নিতান্ত ছোট থাকে বলে এর ফলে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না।

অপরিণত শিশুর তত্ত্বাবধান - অপরিণত শিশুদের নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তাদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা। এদের সদাসর্বদা চোখে-চোখে রাখা এবং নিপুণভাবে শুশ্রূষা করার দরকার হয়। তাছাড়া এদের জন্যে সাধধানে প্রয়োজনমতো অক্সিজেন সরবরাহ করা এবং অনেক কসরত করে খাওয়ানোরও দরকার পড়ে। এ-সমস্ত কারণে মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত পরিবারে এ-ধরনের অপরিণত শিশু জন্মালে সে-পরিবারকে আর্থিক কারণে রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। তাছাড়া যে সমস্ত হাসপাতালে এ-ধরনের শিশুকে তত্ত্বাবধান করার যথোচিত ব্যবস্থা নেই সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা এদের চোখে-চোখে রাখার জন্যে বিশেষ নার্সও নিয়োগ করতে হয়। এবং এরকম শুশ্রূষা একাধিক সপ্তাহ ধরে চালিয়ে যেতে হয়। ফলে ভূমিষ্ঠ হবার পর অপরিণত শিশু চারদিকে বেশ একটা সোরগোল তোলে। শিশুটি কতটা অপরিণত তার ওপর নির্ভর করছে তাকে কতদিন এভাবে বিশেষ শুশ্রূষাধীনে রাখতে হবে। অনেক সময় সাড়ে তিন পাউণ্ড ওজনেব শিশুও ভূমিষ্ঠ হবার পর এত দ্রুত নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় যে তার জন্যেও বেশিদিন এই বিশেষ শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হয় না। এই ধরনের শিশু যদি জন্মের কয়েক দিন পবেও রীতিমতো প্রাণচঞ্চল থাকে, তাহলে জানবেন যত দিন যাবে ততই তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এবং প্রমাণ-সাইজ হয়ে বেড়ে উঠলে পর শিশুটি বেঁচে গেল বলে ধরে নেওয়া চলবে।

স্বাভাবিক প্রসবের বেলায় যেমন অকাল-প্রসবের পরও প্রসূতি ঠিক তেমনিভাবেই ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওই দুই ক্ষেত্রে প্রসূতিকে প্রায় এক সময় হাসপাতালে থাকতে হবে। কেবল যে ক্ষেত্রে সদ্য-প্রসূতি তাঁর অপরিণত শিশুকে স্তন্যদান করতে চাইবেন কিংবা শিশুটি মা-র দুধ খাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠবে, সেরকম ক্ষেত্রে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করার দরকার হবে। এ সব জায়গায় মায়ের বুক থেকে দুধ সংগ্রহ করার জন্যে স্তন থেকে

হাত দিয়ে দুধ গেলে নিতে হবে কিংবা এক বিশেষ ধরনের পাম্প ব্যবহার করতে হবে। এইভাবে দুধ সংগ্রহ করার পর সেই দুধ আলাদাভাবে শিশুকে খাওয়াতে হবে।

বিলম্বিত বা সময়-পেরিয়ে-যাওয়া প্রসব

প্রসবের পূর্ব-নির্ধারিত স্বাভাবিক তারিখটি পেরিয়ে গেলেও প্রসব-বেদনা দেখা না দিলে ডাক্তারবাবুর কাছে সেটি একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। অবশ্য প্রথমেই দেখা দরকার প্রসবের দিন হিসেব করতে কোনো ভুল হয়েছে কিনা। তা না হয়ে থাকলে, ডাক্তার-বাবুকে এ-বিষয়ে মনস্থির করতে হয় যে পূর্ণগর্ভা নারীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা আর কতদিন চলতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, যাকে বলে "অতি-পরিণত" গর্ভাবস্থা, প্রসূতির ক্ষেত্রে সেই বিশেষ অবস্থাটির সূচনা দেখা দিয়েছে কিনা এবং এই অবস্থাটির সূচনা হওয়ামাত্র কিংবা তার আগেই গর্ভাবস্থার অবসান ঘটানো।

"অতি-পরিণত" গর্ভাবস্থা কি ?—এটি সেই অবস্থা, যে-পর্যায়ে গর্ভস্থ শিশু অতি-পরিণত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, শিশুটির মাতৃজঠরে থাকা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে এত বেশি স্থায়ী হয় যে তার ফলে তার দেহে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহের অভাব ঘটে। প্লাসেন্টা বা গর্ভফুলটি একটু বেশি বুড়ো হয়ে পড়ে বলে তার কর্মক্ষমতা কমে যায়। ফলে এই উপরোক্ত অবস্থা। এ-অবস্থায় জরায়ুর মধ্যেকার অ্যাম্নিয়টিক জল ফের জরায়ুর দেয়াল শুষে নিতে শুরু করে, গর্ভস্থ শিশুর বাড় বন্ধ হয়ে গেছে মনে হয় এবং কার্যত শিশুকে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ছোটই দেখায়। এ-ধরনের অতি-পরিণত শিশু প্রায়ই রোগা, উপোসী চেহারা নিয়ে জন্মায়।

সাধারণত চিকিৎসকদের ধারণা যে গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রসব না হলে গর্ভাবস্থা অতি-পরিণত হয়ে পড়ার ভয় থাকে।

প্রসবের নির্দিষ্ট স্বাভাবিক সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর স্বভাবতই

প্রশ্ন ওঠে, কৃত্রিম উপায়ে প্রসববেদনা ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন কিনা। এরকম ক্ষেত্রে, প্রথমেই দেখা প্রয়োজন গর্ভস্থ শিশুর স্বাভাবিক বাড় বন্ধ হয়েছে কিনা। শিশুর বাড় বন্ধ না হয়ে থাকলে বুঝতে হবে তার দেহে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য-সরবরাহ বন্ধ হয়নি। অর্থাৎ প্রসূতির গর্ভাবস্থা তখনো অতি-পরিণত পর্যায়ে পৌঁছয়নি। এ-সব জায়গায় গর্ভাবস্থা তার পরেও চলতে দেওয়া হবে কিনা তা ক্ষেত্র বিচার অর্থাৎ সব দিক বিবেচনা করে ডাক্তারবাবু স্থির করবেন।

কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক সময় পার হয়ে যাবার পর আপাতদৃষ্টিতে বোধ হবে যে শিশু আর বাড়ছে না সেখানে কৃত্রিম উপায়ে প্রসব-বেদনা ত্বরান্বিত করা হবে কিনা নিশ্চয়ই তা ডাক্তারবাবুকে ভাবতে হবে। বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায় যে জরায়ুর নিম্নাংশ ইতিমধ্যেই পাতলা হয়ে এসেছে ও জরায়ু-মুখ অল্প একটু খুলেছে এবং উত্তেজক ওষুধ পড়লে জরায়ুর পেশী সংকুচিত হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে প্রসূতির প্রসববেদনা শুরু হব-হব করছে, এখন ব্যাপারটা শুধু শুরু করিয়ে দেওয়ার ওয়াস্তা। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা সাধারণত প্রসববেদনা ত্বরান্বিত করিয়েই থাকেন।

তবে প্রসূতিকে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর যদি মনে হয় যে কৃত্রিম উপায়ে প্রসববেদনা ত্বরান্বিত করার প্রচলিত পদ্ধতিতে কাজ না হবার সম্ভাবনা, তখন, বিশেষ করে তিরিশের কম বয়সী প্রসূতিকে তাঁরা অনেক সময় আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। অবশ্য উপরোক্ত অতি-পরিণত গর্ভাবস্থা শুরু না হলেই এ-ব্যবস্থা করা হয়, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে-সব মেয়ের বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে এবং যাঁদের এই প্রথম গর্ভ তাঁদের ক্ষেত্রে ওই অতি-পরিণত অবস্থা দ্রুত শুরু হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে প্রসববেদনা শুরু করার মৃদু এবং কড়া এই উভয় পদ্ধতিতে কাজ না দিলে স্বাভাবিক প্রসবের জন্যে অপেক্ষা করে না থেকে প্রসূতির দেহে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বলে চিকিৎসকরা মনে করেন।

প্রসবকালীন অন্যান্য জটিলতা

পাছা-নিচের-দিকে অবস্থায় প্রসব—শিশু স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ে সম্পূর্ণ ঘুরে-যাওয়া অবস্থায় প্রসব হলে, তাকে বলে পাছা-নিচের-দিকে করে প্রসব। এ-অবস্থায় মাতৃগর্ভে শিশু মাথা-নিচের-দিকে-করা অবস্থায় থাকে না এবং মাথাটি প্রথমে ভূমিষ্ঠ হয় না, উল্টো মায়ের পেটে শিশু মাথা-ওপর-দিকে-করা অবস্থায় অবস্থান করে। এ-সব ক্ষেত্রে হয় শিশু হাঁটু-ভেঙে-বসা-অবস্থায় আর নয়তো পা দুটি ওপর দিকে সোজা টান করে দিয়ে থাকে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর পাছাটি সবচেয়ে নিচের দিকে অবস্থান করে। শিশু হাঁটু-ভেঙে-বসা-অবস্থায় থাকলে অনেক সময় তার একটি কিংবা একসঙ্গে দুটি পা-ই সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ হয়।

চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা এই যে বহুক্ষেত্রেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার অষ্টম মাস পর্যন্ত শিশু মাতৃগর্ভে এইরকম পাছা-নিচের-দিকে-করা অবস্থায় অবস্থান করে এবং প্রসবের আগে-আগে মাথা-নিচের-দিকে করে ঘুরে যায়। এ-কারণে পূর্ণ পরিণত শিশুদেব চেয়ে অকাল-প্রসূত শিশুদের মধ্যেই এভাবে পাছা-নিচের-দিকে করে জন্মানো অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ঘটনা।

তবে অকাল-প্রসূত শিশু পাছা-নিচের-দিকে করে জন্মালে সমস্যা ততটা দেখা দেয় না। কেননা, আগেই বলেছি, এ-ধরনের শিশু আকারে সাধারণত এত ছোট হয় যে তার ফলে প্রসবের সময় বিশেষ কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না। অকাল-প্রসূত শিশুদের মধ্যে মৃত্যুহার যে বেশি তার কারণ পাছা-নিচের-দিকে করে জন্মানোর ফলে বিপদ আপদ ঘটা ততটা নয়, তার প্রধান কারণ এ-ধরনের শিশুর শারীরিক অপুষ্টি বা অপরিণতি। কিন্তু পূর্ণ পরিণত শিশুর ক্ষেত্রে—বিশেষ করে ওই শিশুর মায়ের বস্তি-প্রদেশের কাঠামোটি বা তার নিচের দরজাটি অতিরিক্ত সরু বলে যদি ডাক্তারবাবুর সন্দেহ হয়, তা হলে—পাছা-নিচের-দিকে-করা অবস্থায় প্রসব ডাক্তারবাবুকে ঝামেলায় ফেলতে পারে। কেননা, শিশুর মাথাটিই তার শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বড়

অংশ এবং ওই অংশটি অপেক্ষাকৃত শক্ত বলে ওটি ভূমিষ্ঠ হওয়াও অপেক্ষাকৃত কঠিন। কাজেই যে-শিশু মাথা-নিচের-দিকে করে নামে, তার মাথাটি কষ্টেসৃষ্টে একবার ভূমিষ্ঠ হলে বাদবাকি দেহ বেরিয়ে আসতে আর বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয় না। এমন কি, মাথাটি ভূমিষ্ঠ না হতে চাইলেও যে কোনো সময়ে অন্য উপায় অবলম্বন করা যায়, এমন কি প্রসূতির দেহে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করেও শিশুকে বের করে আনা চলে। কিন্তু, বিশেষ করে প্রথম প্রসূতির বেলায় শিশু পাছা-নিচের-দিকে করে নামলে এবং প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের দরজা যথেষ্ট বড় না হলে ডাক্তারবাবুকে নানান সমস্যায় পড়তে হয়। কেননা শিশুর পাছা ও শরীরের অন্যান্য অংশ তার মাথার চেয়ে চওড়ায় ছোট হয় বলে প্রসূতির সরু বস্তি-প্রদেশ থেকেও অনেক সময় সেগুলি অক্লেশে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার পর তার মাথাটি ওই দরজায় বেধে যেতে পারে। এ-অবস্থায় প্রসূতির দেহে সীজা-রিয়নও করা চলে না অথচ কয়েক মিনিটের ভেতরে শিশুটিকে খালাস না করতে পারলে শিশু তো মারা পড়বেই, প্রসূতিও বিপদে পড়বেন। এ-সব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুকে যেন-তেন প্রকারে, শিশুর বাঁচা-মরার দিকে খেয়াল না রেখেই, প্রসূতিকে খালাস করতে হয়। এ-কারণে শিশুর পাছা-নিচের-দিকে করা প্রসবের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রসব সন্দেহজনক বলে মনে করলে ডাক্তাররা সাধারণত শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আগেই প্রসূতির দেহে সীজারিয়ন করে থাকেন।

একসঙ্গে একাধিক সন্তান প্রসব- একসঙ্গে একাধিক সন্তান প্রসব বলতে প্রায় সবক্ষেত্রেই যমজ-সন্তান প্রসবই বুঝিয়ে থাকে, কেননা দুই-এর বেশি সন্তান প্রসব নেহাত বিরল ঘটনা। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন যে প্রতি ৮৫ জন প্রসূতিতে মাত্র একজন যমজ-সন্তান প্রসব করে থাকেন।

যমজ-সন্তান প্রসবের সময় সাধারণত কোনো ঝামেলা হয় না। এর একটা কারণ এই যে যমজ দুটি প্রত্যেকে আলাদা ভাবে একটি পূর্ণ

পরিণত শিশুর চেয়ে আকারে ছোট হয়ে থাকে, ফলে পৃথকভাবে তারা সহজেই ভূমিষ্ঠ হয়। এর দ্বিতীয় কারণ যমজ-সন্তানের ক্ষেত্রে প্রসূতির অকাল-প্রসব ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে, আর অকাল-প্রসব ঘটলে শিশু দুটি স্বাভাবিকের চেয়ে আরো ছোট হওয়ার সম্ভাবনা। এ-সমস্ত কারণে যমজ-সন্তান প্রসবের বেলা প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের দরজা ছোট হওয়ার দরুন সীজারিয়ন করার প্রয়োজন খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে।

যমজ-সন্তানের ক্ষেত্রে প্রসববেদনা দেখা দেওয়া ও বেড়ে ওঠার ধরন হুবহু স্বাভাবিক প্রসবের মতোই। শিশুও প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সাধারণত মাথা-নিচের-দিকে করা অবস্থায় থাকে। সন্তানপ্রসবও মোটের ওপর স্বাভাবিক (অর্থাৎ একটি সন্তান) প্রসবের মতো। যমজরা (তা সে সদৃশ কিংবা দু-ধরনের যাই হোক না কেন) প্রত্যেকে জরায়ুর মধ্যে আলাদা আলাদা নিজস্ব জলের থলির মধ্যে থাকে।

যমজ-সন্তানেরা সাধারণত পর পর ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তবে কোনো ক্ষেত্রে প্রথমটির পর দ্বিতীয় শিশুটির ভূমিষ্ঠ হতে দেরি ঘটলে ডাক্তাররা সাধারণত জোর করে প্রসব ত্বরান্বিত করে থাকেন। কেননা, এ-সব ক্ষেত্রে, প্রথম শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পর জরায়ু আপনা থেকে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, ফলে গর্ভফুলটি জরায়ুর দেয়াল থেকে খসে পড়ার সম্ভাবনা। আর ফুল একবার খসে পড়লে দ্বিতীয় যে শিশুটি তখনো মাতৃগর্ভে আছে তার শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে বাইরে আনতে না পারলে শিশুটির মারা পড়ার সম্ভাবনা। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু সাধারণত ওই দ্বিতীয় শিশুর জলের থলিটি ফুটো করে দেন। তারপর শিশুটি পাছা-নিচের-দিকে করা অবস্থায় থাকলে হাত ঢুকিয়ে তার দুটো পা ধরে বাইরে বের করে আনেন। শিশু মাথা-নিচের-দিকে করা অবস্থায় থাকলে হয় ডাক্তারবাবু এরপর স্বাভাবিক প্রসবের জন্যে অপেক্ষা করেন, আর নয়তো শিশুটিকে গর্ভের মধ্যেই উল্টে দিয়ে পাছা-নিচের-দিকে করা অবস্থায় পা ধরে বের করে আনেন।

প্রসবের পূর্বে রক্তস্রাব—অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার একেবারে শেষের ক-মাসে নানা কারণে যোনিমুখ থেকে রক্তস্রাব হতে পারে। সবচেয়ে নির্দোষ ক্ষরণ হল, আসল প্রসববেদনা শুরু হওয়ার মুখে শ্লেষ্মা ও রক্তের মিশ্র অল্পস্বল্প (অর্থাৎ কাপড়ে সামান্য দাগ লাগার মতো) স্রাব। কিন্তু যদি আচমকা বেশ খানিকটা স্রাব হতে থাকে এবং তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক কোনো বেদনা না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ব্যাপার গুরুতর। এ-অবস্থা দেখা দেয় সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল জরায়ুর একেবারে নিচের অংশে—জরায়ু-মুখের কাছাকাছি কিংবা তাকে আবৃত করেই—দেয়াল কামড়ে অবস্থান করে। এ-সব জায়গায়, আসল প্রসববেদনা শুরু হওয়ার আগেই জরায়ুর নিচের অংশ প্রসারিত হয়ে ওঠার ফলে গর্ভফুলের অংশবিশেষ জরায়ুর দেয়াল থেকে খসে যায়। ফলে রক্তস্রাব দেখা দেয়।

ক্ষেত্রেভেদে এ-উপসর্গের নানা রকম চিকিৎসা হয়ে থাকে। প্রথম প্রসূতির বেলায়, বিশেষ করে প্রসবের কাল ঘনিয়ে ওঠার কাছাকাছি সময়ে, এ-হেন স্রাব দেখা দিলে প্রসূতির দেহে সাধারণত সীজারিয়ন করাই বিধেয়। এর ফলে প্রায় পরিণত শিশুটিও রক্ষা পায় এবং সময়মতো গর্ভফুল বের করে ফেলায় প্রসূতি অতিরিক্ত রক্তপাতের বিপদ থেকেও রেহাই পান। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে এই রক্তস্রাব সাত মাসে কিংবা তারও আগে দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সীজারিয়ন করলে অপুষ্ট শিশুর বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না। এ-সব জায়গায় অবশ্য রক্তস্রাব মারাত্মক রকম ঘটলে ডাক্তারবাবুর পক্ষে সীজারিয়ন করা ছাড়া উপায় থাকে না। তবে স্রাব মারাত্মক না হলে প্রসূতিকে দীর্ঘকাল হাসপাতালে রেখে স্রাব-নিয়ন্ত্রণের ও প্রসূতির দেহে রক্তদানের ব্যবস্থা করে গর্ভকালকে সম্ভবস্থলে আরো কিছুদিন বিকশিত হতে দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এতে জীবন্ত শিশুর জন্ম সম্ভব হলেও হতে পারে।

এছাড়া, প্রসববেদনা শুরু হওয়ার পূর্বে কিংবা তার সঙ্গে আরো এক ধরনের রক্তস্রাব দেখা দিতে পারে। এই শেষোক্ত ধরনের স্রাবের

সঙ্গে প্রসূতি সাধারণত বেদনাও অনুভব করে থাকেন। জরায়ুর ওপরের দেয়ালে স্বাভাবিকভাবেই প্রোথিত গর্ভফুলটি কমবেশি দেয়াল থেকে খসে এলে এ-ধরনের স্রাব ইত্যাদি দেখা দেয়। এ-সব ক্ষেত্রে অনেক সময় যোনিমুখ থেকে স্রাব দেখা দেওয়ার আগেই প্রসূতি এক ধরনের স্থায়ী ঘিনঘিনে ব্যথা অনুভব করেন ও তাঁর সারা জরায়ুটিই শক্ত হয়ে উঠেছে বলে বুঝতে পারেন। সাধারণত এইভাবে ব্যথা কিছু সময় ধরে চলার পর তবে যোনিমুখে রক্তের ধারা কিংবা চাপবাঁধা রক্ত দেখা দেয়।

মনে রাখা দরকার যে এই শেষোক্ত ধরনের রক্তস্রাব প্রথম ধরনের (অর্থাৎ গর্ভফুল জরায়ুর নিচের দিকে অস্বাভাবিকভাবে অবস্থিত হওয়া ও আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে যে ধরনের স্রাব হয়) স্রাবের চেয়ে আরো বেশি বিপজ্জনক। কেননা এক্ষেত্রে রক্তস্রাব শরীরের অভ্যন্তরে ঘটতে থাকে বলে বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। ফলে সকলের অজ্ঞাতে অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুন প্রসূতি মারাত্মক বিপদে পড়তে পারেন। এ-অবস্থাটি গর্ভস্থ শিশুর পক্ষেও সমান বিপজ্জনক। কেননা গর্ভফুল বেশ কিছুটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে অক্সিজেনের অভাবে শিশুটি নিশ্চিত মারা পড়বে। এ ধরনের ক্ষেত্রে, অবস্থা যেখানে রীতিমতো গুরুতর হয়ে উঠেছে সেখানে, এমন কি গর্ভস্থ শিশু ইতিপূর্বেই মারা গেছে বলে বুঝতে পারলেও, প্রসূতির স্বার্থে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করা অত্যাবশ্যক। অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যেখানে গর্ভফুলের সামান্য একটু অংশমাত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও আনুষঙ্গিক রক্তপাত পরিমাণে কম ও তার সবটাই বাহ্যিক হয়েছে সে-জায়গায়) অবশ্য ক্ষেত্র বিবেচনা করে ডাক্তারবাবু স্থির করবেন স্বাভাবিক প্রসব আসন্ন কিনা এবং তিনি স্বাভাবিক প্রসবের জন্যে অপেক্ষা করবেন কিনা।

"শুকনো প্রসব"—লোকের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে আসল প্রসববেদনা শুরু হওয়ার কমবেশি আগেই যদি প্রসূতির

জরায়ুর মধ্যেকার জলের থলিটি ফেঁসে যায়, তাহলে সবটুকু জল বেরিয়ে যাওয়ার দরুন প্রসববেদনা ও সন্তানপ্রসব কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। একেই বলা হয়ে থাকে, "শুকনো প্রসব"।

কিন্তু আসলে "শুকনো প্রসব" বলে কোনো বস্তু নেই। আসলে, যে-সব ক্ষেত্রে প্রসববেদনা শুরু হওয়ার আগে প্রসূতির জল ভাঙে ও তারপর প্রসব দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর হতে দেখা যায়, তার মূলে অন্যবিধ কারণ থাকে। অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর অবস্থানের অস্বাভাবিকতা কিংবা প্রসূতির বস্তি-প্রদেশ সরু হওয়ার দরুন একদিকে যেমন আগে থাকতেই জলের থলিটি ফেঁসে যায় পরে তেমনি প্রসবও দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে, অবস্থা অনুকূল হলে, অর্থাৎ জরায়ু-মুখটি পাতলা ও আংশিকভাবে খোলা অবস্থায় থাকলে এবং শিশুর মাথাটি নিচের-দিকে-করা ভঙ্গিতে নেমে এলে, বরং অপেক্ষাকৃত আগে থাকতে জল ভাঙলে প্রসববেদনা ও সন্তানপ্রসব বিলম্বিত হওয়ার বদলে ত্বরান্বিতই হয়ে থাকে।

"ঘোমটা দেওয়া শিশু"—প্রায় সমস্ত প্রসূতির ক্ষেত্রে প্রসববেদনা শুরু হওয়ার সময় থেকে আরম্ভ করে জলের থলিটি ক্রমশ এতদূর ফেঁসে যায় যে গর্ভস্থ শিশুব মাথা ওই থলির ফোকরের মধ্যে দিয়ে সহজেই গলে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফুটোটি যথেষ্ট বড় না হওয়া বা জলের থলিটি একেবাবেই না-ফাঁসার দরুন শিশু তার মুখের ওপর ওই থলির আবরণ জড়িয়ে নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়। একেই বলে, "ঘোমটা দেওয়া শিশু"।

শিশুর মুখে আবরণ দেখলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এর বিশেষ কোনো তাৎপর্যও নেই। স্বভাবতই, এরকম ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু প্রথমেই এই আবরণটি কেটে ছাড়িয়ে দেন এবং তারপর শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ পরিষ্কারে মনোযোগ দেন।

চার | জাতক-পরিচয়

এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১৬২) থেকে জের টানছি। অর্থাৎ ধরুন, এখনো আপনি লেবর-রুমে শুয়ে আছেন। ইতিমধ্যে কিন্তু নবজাত সন্তানকে আপনার পেটের ওপর আড়াআড়ি-ভাবে শুইয়ে দিয়ে তার নাক-মুখ থেকে শ্লেষ্মা ও অন্যান্য জলীয় পদার্থ বের করে দেওয়া হয়েছে এবং শিশুটি কেঁদে উঠেছে ও শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে শুরু করেছে। অতঃপর নাড়ি কাটা ও বাঁধার পর শিশুকে ট্রেতে শুইয়ে ওই ঘরেই আপনার কাছ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

বহু শিশুর মধ্যে গোলমালে আপনার শিশু যাতে ভুলক্রমে হস্তান্তরিত না হয়ে যায় তা দেখা হাসপাতালেরই দায়িত্ব। এজন্যে অযথা আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না। এ-ধরনের ভুলের যে-সব খবর আপনি খবরের কাগজ মারফত পেয়ে থাকেন সেগুলি নেহাতই বিরল ঘটনা। কালেভদ্রে এরকম যে এক-আধটা ঘটনা ঘটে অতিরিক্ত প্রচারের জন্যেই সেগুলি অত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে জানবেন। হাসপাতাল-ভেদে প্রসূতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক-নির্ণয়ের পদ্ধতি নানা ধরনের হয়ে থাকে। সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতিটি হচ্ছে, আপনার ও শিশুর হাতে একই নম্বর-দেওয়া ছোট পিতলের চাকতি সুতো দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দেওয়া। নবজাত শিশুকে লেবর-রুমের বাইরে নিয়ে যাবার আগেই এইভাবে তার হাতে চাকতি বেঁধে দেওয়া হয় এবং আপনার নম্বরের সঙ্গে শিশুর নম্বর ভালো করে মিলিয়ে দেখা হয়।

এই নবজাত শিশুকে দেখতে কেমন লাগে ?—প্রসবের সময় যদি আপনার ওপর গভীর ঘুমের কিংবা জ্ঞাননাশক কোনো ওষুধ প্রয়োগ না করা হয়ে থাকে, তাহলে গর্ভফুল পড়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

সাধারণত আপনার পক্ষে চেতনা ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। অতএব ওই লেবর-রুমে থাকতে-থাকতেই আপনি আপনার নবজাতককে প্রথম দেখতে পাবেন। অবশ্য এ-দেখাটা যে পুরো স্বাভাবিক অবস্থায় দেখার সমান কার্যকরী হবে তা নয়। প্রথমত, আপনার এ-সময়ের স্মৃতি পরে তত স্পষ্ট নাও থাকতে পারে; দ্বিতীয়ত, তখনও পর্যন্ত নবজাতকের চেহারা এমন কিম্ভুত হয়ে থাকবে যে তার আসল রূপ বুঝতে পারা সম্ভব নাও হতে পারে। এ-অবস্থায় নানা ধরনের স্রাব লেগে শিশুর মাথার চুল ভিজে মাথার চাঁদিতে লেপটে থাকবে; অনেক সময় শিশুর গায়ে তার নিজের মলের দাগও লেগে থাকে। এছাড়া তার সারা অঙ্গে সাদা নরম একরকম পদার্থ মাখামাখি হয়ে থাকবে; এ-জিনিসটি মুছলেও গা-থেকে সহজে যেতে চাইবে না। এর ওপর আপনার শরীরের অভ্যন্তরের চাপবাঁধা রক্তও শিশুর গায়ে শুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা। এই সবকিছু মিলিয়ে শিশুকে খানিকটা কিম্ভূতকিমাকার দেখতে লাগবে। অনেক হাসপাতালের লেবর-রুমে শিশুর ওজন নেবার ও দৈর্ঘ্য মাপবার যন্ত্র থাকে না। এ-সব জায়গায় এ-ব্যাপারে নিছক আন্দাজ করা ছাড়া আপাতত অন্য কোনো উপায় থাকে না। অন্যত্র, যেখানে এ-সব যন্ত্র লেবর-রুমেই মজুত থাকে, সেখানে এই সময়েই শিশুর ওজন ও দৈর্ঘ্য মেপে নেওয়া হয়।

নার্সারি-ঘরে—অতঃপর আপনার শিশুকে লেবর-রুম থেকে যে-ঘরে হাসপাতালের নবজাত শিশুরা থাকে সেই নার্সারি-ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে প্রথমেই শিশুকে স্নান করিয়ে তার গা থেকে সব রকম ক্লেদ পরিষ্কার করে ফেলা হবে। এতে সাধারণত কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা সময় লাগবে।

এ-সময়ে শিশু কি করবে তার কিছু ঠিক নেই। চোখ দুটি একেবারে বন্ধ করে সে শান্তশিষ্ট হয়ে ঘুমোতেও পারে, আবার ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থেকে প্রচণ্ড কান্না জুড়ে দিতে পারে। জন্মের পরমুহূর্ত

থেকেই নবজাতক চোখে দেখতে পায়, আলো ও অন্ধকারের তফাত বুঝতে পারে। ঘরের মধ্যে হঠাৎ দপ করে আলো জ্বলে উঠলে নবজাতকের চোখে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তবে এ-সময়ে কোনো কিছু একদৃষ্টে দেখা, কি চোখ ঘুরিয়ে কারো গতিবিধি লক্ষ্য করা কিংবা কাউকে চিনতে পারা—এ-সব কোনো কিছুই সে পারে না। অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি বলতে যা কিছু বোঝায়, যেমন উপরোক্ত ব্যাপারগুলি ছাড়াও কোনো কিছুর আকৃতি কি গভীরতা কি দূরত্ব বুঝতে পারা, নবজাতকের তা থাকে না।

জন্মের পর প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা শিশু নাক মুখ দিয়ে অনবরত শ্লেষ্মা তুলতে থাকে। এর খানিকটা হল প্রসবের সময় মায়ের দেহ থেকে যা শিশুর পেটে চলে গিয়েছিল তাই। বাকিটা, সম্ভবত, ওই সময়ে মায়ের জরায়ু ইত্যাদি জায়গার স্রাব নাক দিয়ে শোঁকার ফলে তার নিজের নাসারন্ধ্রে যে শ্লেষ্মা জন্মায় সেইটাই।

শিশুর খাদ্য—জন্মের পর সাধারণত প্রথম তিন দিন শিশু সত্যিকার খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। এতে মানুষের কোনো হাত নেই, এটা প্রাকৃতিক বিধান। কেননা ওই তিন দিন পরে মায়ের স্তনে পাকাপাকি-ভাবে দুধ আসে। অবশ্য মাতৃস্তন্য পায় না বলে এ-সময়ে শিশুকে যে কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর দরকার পড়ে তা নয়। প্রথমত, নবজাত শিশু এত শীঘ্র কোনো জিনিস ঠিকমতো চুষে খেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে শিশু নাক-মুখ দিয়ে শ্লেষ্মা তুলতে ব্যস্ত থাকে বলে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করলে তার নাক ও গলার বায়ু-চলাচলের রাস্তা বন্ধ হবার বা দম আটকে যাবার ভয় থাকে।

সাধারণ নিয়ম হল, জন্মের পর প্রথম বারো ঘণ্টা শিশুকে কিছুই খেতে না দেওয়া। অতঃপর, এর পরের বারো ঘণ্টার মধ্যে তাকে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প শুধু জল কিংবা মিশ্রীর জল দেওয়া চলতে পারে। অবশেষে চব্বিশ ঘণ্টা পার হলে পর একেবারে পাতলা করে গুলে কোনো কৃত্রিম দুধ খুব সামান্য পরিমাণে দেওয়া চলে।

শিশুর ওজন—জন্মের পর প্রথম কয়েক দিনে শিশুর ওজন খানিকটা কমে যায়। এটি খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা।

জন্মের পরই উপোস করতে হয় বলে যে শিশুর ওজন কমে তা কিন্তু নয়। শিশুর ওজন কমার কারণ এই যে, জন্মের সময় শিশুর দেহ বা দেহ-কোষসমূহ অতিরিক্তমাত্রায় রসস্থ হয়ে থাকে। প্রসূতির দেহের নানা গ্রন্থিক্ষরণের প্রভাবের দরুনই শিশুর দেহে অতিরিক্ত জল জমে। অতঃপর কয়েক দিন ধরে শিশুর দেহের মধ্যেকার এই অতিরিক্ত জলীয় অংশ কমতে থাকে বা শিশুর শরীর শুকোতে থাকে। ফলে তার দেহের ওজনও সমপরিমাণে কমে যায়।

এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে গর্ভাবস্থায় সন্তানপ্রসবের সময় পর্যন্ত প্রসূতির দেহও নানা গ্রন্থিক্ষরণের প্রভাবের দরুন লবণ ও জলীয় পদার্থ কোষসমূহে জমা করে করে রসস্থ হয়ে ওঠে। প্রসবের পর দ্রুত এই সব জলীয় পদার্থ কমে যায়, ফলে এ-সময়ে প্রসূতির ওজনও দ্রুত কমে যায়। একেকজন প্রসূতিকে এই সময়ে সব মিলিয়ে প্রায় ষোলো থেকে আঠারো পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন হারাতে দেখা যায়।

শিশুকে দেখা ও খাওয়ানো—প্রসবের পর প্রসূতিকে ভালো করে তাঁর নবজাত সন্তানকে দেখানো ও চিনতে দেওয়া ছাড়া বিশেষ বিশেষ হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে প্রতিদিন এক কিংবা একাধিকবার শিশুকে নার্সারি-ঘর থেকে মায়ের বেডে আনা হয়। জন্মসময় থেকে তিন দিনের পর কোনো কোনো হাসপাতালে দিনে যতবার শিশুকে খাওয়ানোর দরকার হয় ততবারই স্তন্যদানের জন্যে তাকে মায়ের কাছে আনা হয়। আবার এমন হাসপাতালও আছে যেখানকার কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে সদ্য-প্রসূতির পক্ষে শিশুকে স্তন্যদান অভ্যাস করার চেয়ে এ-সময়ে তাঁর পক্ষে বিশ্রাম গ্রহণই বেশি প্রয়োজন। ফলে এ-সব জায়গায় দিনে মাত্র একবার করে শিশুকে তার মায়ের কাছে দেওয়া হয়। এছাড়া যে-সমস্ত প্রসূতি স্বতন্ত্র কেবিনে থাকেন ও জন্মের তিন দিন পর

যাঁদের সন্তান মোটামুটি শক্ত-সমর্থ হয়ে ওঠে তাঁদের শিশুদের সাধারণত নার্সারি থেকে এনে ওই কেবিনেই অপর একটি কানা-উঁচু ছোট খাটে রাখা হয়।

কেবিনের প্রসূতি ছাড়া অন্যান্য প্রসূতিদের শিশুরা নার্সের তত্ত্বাবধানে নার্সারি-ঘরেই বাস করে। সাধারণত হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ারে প্রসূতির বাড়ির লোকজন নার্সারিতে গিয়ে তাঁদের শিশুকে দেখে আসতে পারেন।

শিশুর লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন—এদেশে মুসলমান ও ইহুদি ধর্ম-মতাবলম্বীরাই তাঁদের ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী পুরুষ সন্তানদের লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন করিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এর তেমন চল না থাকলেও, বর্তমানে ইওরোপ ও আমেরিকায় এর প্রচলন ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্য বলাই বাহুল্য, ধর্মের জন্যে নয়, প্রধানত স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে। এই অস্ত্রোপচারটি আর কিছুই নয়, পুরুষ-লিঙ্গের অনুত্তেজিত অবস্থায় চামড়ার যে আবরণটি লিঙ্গের অগ্রভাগ আলগাভাবে ঢেকে রাখে সেটিকে খানিকটা পরিমাণে ছেটে দেওয়া। এর ফলে লিঙ্গের অগ্রভাগ আর চামড়ার আবরণে ঢাকা পড়ে না। ফলে ওই আবরণের নিচে ময়লা বা smegma জমে নবজাত শিশুর লিঙ্গ বিষিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও থাকে না। একেবারে নবজাতকের বেলায় এই অস্ত্রোপচারের সময় অঙ্গটি ওষুধ প্রয়োগে অসাড় করে নেবারও প্রয়োজন হয় না। বিদেশী চিকিৎসকরা শিশুর জন্মের সাত-আট দিনের মধ্যেই এই অস্ত্রোপচারটি করে ফেলার পক্ষপাতী। কেননা, তাঁরা বলেন, শিশুর বয়স যত বাড়ে অস্ত্রোপচারের পদ্ধতিও তত জটিল হয়ে ওঠে।

পাঁচ | স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন

নবজাতকের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া গেল, এবার ফের প্রসূতির কথায় আসা যাক। ফের সেই লেবর-রুমে ফিরে যাওয়া যাক। এবারে প্রশ্ন হল, প্রসবের পর প্রসূতিকে আর কতক্ষণ লেবর-রুমে থাকতে হবে? লেবর-রুমে থাকার এই সময়টি কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত, এটি নির্ভর করে আপনার প্রসব কত ভালোভাবে হল তার ওপর। অর্থাৎ, সন্তানপ্রসব কতখানি কষ্টদায়ক হয়েছে, প্রসূতি কত দীর্ঘ সময় ধরে প্রসববেদনা ভোগ করেছেন, প্রসবের সময়ে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণে রক্তস্রাব হয়েছে কিনা, প্রসবের পরে প্রসূতির জরায়ুর পেশী শিথিল হয়ে পড়ার লক্ষণ ও সেই সঙ্গে ফের রক্তক্ষরণের সূচনা দেখা যাচ্ছে কিনা, ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনার ওপর নির্ভর করছে আপনাকে ঠিক কত সময় প্রসবের পরেও লেবর-রুমে কাটাতে হবে।

কিন্তু এ তো গেল প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলির কথা। এছাড়া, এই সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আরো কতকগুলি বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন আছে। যেমন, আলোচ্য হাসপাতালটি কত বড়, অর্থাৎ সে-হাসপাতালের লেবর-রুমে স্থানাভাব আছে কিনা। কিংবা, প্রসবের সময় আপনার ওপর জ্ঞাননাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা, এবং তা হয়ে থাকলে সে-ওষুধ কতটা কড়া ও আপনার জ্ঞান ফিরে আসতে কতটা সময় লাগতে পারে। হাসপাতালে যদি প্রসূতি-সংখ্যার অনুপাতে লেবর-রুমের অভাব থেকে থাকে তাহলে অন্য প্রসূতির প্রয়োজনে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে প্রসববেদনা কষ্টকর বা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া কিংবা প্রসব-সংক্রান্ত অন্যান্য জটিলতা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও, কিংবা প্রসবের পর প্রসূতির ওপর জ্ঞাননাশক ওষুধের

প্রভাব পুরোপুরি না কাটলেও তাঁকে তাঁর বেডে কিংবা কেবিনে স্থানান্তরিত করে সেখানে তাঁর ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এতে প্রসূতি বা তাঁর পরিজনের ক্ষুণ্ণ হলে চলবে না।

বিশেষ করে যেখানে প্রসূতির ওপর সর্বাঙ্গীণ জ্ঞাননাশক কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং তাঁর জ্ঞান পুরোপুরি ফিরতে একাধিক ঘণ্টা সময় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে বহু ক্ষেত্রে ওষুধের প্রভাব অল্পবিস্তর থাকা অবস্থাতেই প্রসূতিকে তাঁর বেড়ে কিংবা কেবিনে স্থানান্তরিত করতে হয়। প্রসূতিকে আগের মতোই চাকা-লাগানো স্ট্রেচারে শুইয়ে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং আরামদায়ক বিছানায় তাঁকে ঠিকমতো শুইয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁর স্বামী এবং বাড়ির অন্যান্য যাঁরা অন্যত্র অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের ডেকে এনে প্রসূতির কাছে বসতে দেওয়া। এ-সময়ে প্রসূতির পক্ষে ঘুম প্রয়োজন বলে ডাক্তারবাবু মনে না-করলে বাড়ির লোকজনকে সাধারণত কিছুক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হয়। যে-প্রসূতির ওপর জ্ঞাননাশক ওষুধের ক্রিয়া তখনো বর্তমান, বিশেষ করে তাঁর কাছে লোক থাকা ও তাঁর ওপর নজর রাখার প্রয়োজনটিও এর দ্বারা সাধিত হয়।

স্বাভাবিক অবস্থা—প্রসবের পর প্রসূতি ফের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন কখন? এক কথায় বলা চলে, প্রথম যেদিন শয্যাত্যাগ করে প্রসূতি কয়েক পা হাঁটেন, সেই দিন থেকেই তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে থাকে। আগেকার দিনে আমাদের দেশের প্রসূতিরা ন-দিনের দিন আঁতুড় ঘর ছেড়ে স্নান সেরে বেরোতেন। অর্থাৎ, ধরে নেওয়া হত, ওই আট দিন পরেই প্রসূতি মোটের ওপর স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। আজকালও হাসপাতাল প্রসূতি-সদনগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থায় সাত কিংবা আট দিনের বেশি প্রসূতিদের রাখা হয় না। অবশ্য আমাদের গরিব দেশে খুব কম

প্রসূতির পক্ষেই সাত-আট দিনের বেশি শয্যাশায়ী হয়ে থাকা কিংবা যাঁদের হাসপাতালের খরচ দিতে হয় তাঁদের পক্ষে খরচ যোগানো সম্ভব হয়।

কিন্তু হাসপাতালগুলি কি প্রসূতিদের নিছক আর্থিক সামর্থ্যের অভাব আছে বলেই সাত-আট দিন পরে বাড়ি ফিরে যেতে দেয়। ব্যাপারটা তা নয়, এর মধ্যে অন্য প্রশ্নও আছে। ইওরোপ-আমেরিকায় আগেকার দিনে হাসপাতালগুলি প্রসূতিদের কমপক্ষে সাত দিন পুরোপুরি শয্যাশায়ী করে তো রাখতই, এমন কি কোথাও কোথাও দশ, বারো কি চোদ্দ দিন পর্যন্ত তাঁদের মাটিতে পা পর্যন্ত ঠেকাতে দিত না। তখন অধিকাংশ ডাক্তারের ধারণা ছিল যে প্রসূতিকে এইভাবে যত বেশি দিন শয্যাশায়ী করে রাখা যাবে ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল। কেননা, তাঁরা বলতেন, যে-সব মাংসপেশীর সাহায্যে মেয়েদের জরায়ু পেটের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, প্রসবের পর সেগুলি কয়েক দিন বেশ দুর্বল থাকে, এদিকে জরায়ুটিও তখন অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী থাকে। কাজেই এ-সময়ে মেয়েরা সোজা হয়ে দাঁড়ালে কিংবা হাঁটাচলা করলে তাঁদের জরায়ু (স্থানচ্যুত হয়ে) পেটের নিচের দিকে নেমে যাবে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অবশ্য বাস্তব কারণে (অর্থাৎ হাসপাতালগুলিতে স্থানাভাব ইত্যাদি কারণে) ওদেশের প্রসূতিদের আর আগের মতো দীর্ঘ সময় শয্যাশায়ী হয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আজকাল একদল বিশেষজ্ঞ ধাত্রীবিৎ এমন কথাও বলছেন যে অভিজ্ঞতার ফলে তারা দেখেছেন, প্রসবের পর যে-প্রসূতি যত দ্রুত হাঁটাচলা ইত্যাদি শুরু করেন তাঁর শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি ও তাঁদের কাজকর্মও তত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, ফলে প্রসূতির পক্ষে স্বাভাবিক-ভাবে মলমূত্রত্যাগ তত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। অথচ এর ফলে প্রসূতিদের জরায়ু নিচের দিকে নেমে যাওয়ার মতো ঘটনাও তাঁরা তেমন কিছু ঘটতে দেখেননি। এর একমাত্র অসুবিধা তাঁরা এই লক্ষ্য করেছেন যে শুয়ে থাকার চেয়ে এত তাড়াতাড়ি ওঠা, বসা ও

হাঁটাচলা করলে যে-সব প্রসূতির যোনিদেশে প্রসবকালে সেলাই পড়েছে তাঁরা একটু বেশি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। যাই হোক, আজকাল ওই সব দেশের হাসপাতালে সদ্য-প্রসূতিকে—এমন কি যাঁদের দেহে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তাঁদেরও—প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে থাকার পরামর্শ দেয় না, এবং হাসপাতালেও সাত দিনের বেশি ধরে রাখে না। যে-হাসপাতালে আপনি আছেন হয়তো দেখবেন সেখানকার ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে প্রসবের এক, দুই কিংবা তিন দিন পর থেকেই আপনাকে উঠে বসতে ও অল্প অল্প হাঁটাচলা করতে পরামর্শ দেবেন। তিনি আপনাকে এই অভ্যাস ক্রমশ বাড়িয়ে যাবার কথাও হয়তো বলবেন। এ-পরামর্শ আপনি স্বচ্ছন্দে মেনে চলতে পারেন। কেবল মনে রাখবেন, শরীরে যতটুকু রয়-সয় প্রতিদিন ততটুকুই পরিশ্রম করবেন, শরীরের ওপর জোর ফলিয়ে নিজেকে অতিরিক্ত ক্লান্ত করে তুলবেন না। কেননা, সনাতনী ও আধুনিক সব ধরনের চিকিৎসকই এ সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাটা ক্ষতিকর বলে মনে করেন।

মূত্রত্যাগ—সন্তানপ্রসবের পর সাধারণত বারো ঘণ্টার মধ্যে সদ্য-প্রসূতি প্রথমবার মূত্রত্যাগ করবেন বলে আশা করা যায়। তবে এ-ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যায় না। প্রসূতি যদি প্রসবের বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই জল খাওয়া বন্ধ করে থাকেন এবং প্রসবের সময় তাঁর ওপর কড়া জ্ঞাননাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ও প্রসববেদনা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তাঁর প্রস্রাব বারো ঘণ্টার চেয়েও বেশি সময় বন্ধ থাকতে পারে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। কেননা, এরকম ক্ষেত্রে মূত্রথলিতে প্রস্রাব জমে রয়েছে অথচ প্রস্রাব হচ্ছে না এমনও নয়। এক্ষেত্রে প্রসূতিকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে ও আপনা থেকে মূত্রত্যাগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে।

তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে নার্স দেখেন যে প্রসূতির মূত্রথলি ফেঁপে উঠেছে—অর্থাৎ ওই থলিতে প্রস্রাব জমে গেছে—অথচ আপনা থেকে মূত্রত্যাগ সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনি অবশ্যই প্রয়োজনমতো এক কিংবা একাধিকবার ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রসূতিকে মূত্রত্যাগ করিয়ে দেবেন। এভাবে মূত্রত্যাগ করতে অসুবিধা বোধ করার কারণ নেই। কাজেই ক্যাথিটার প্রয়োগের নাম শুনে প্রসূতি যেন ভয় না পান।

তবে, জেনে রাখুন, শতকরা নব্বুইভাগ প্রসূতিই আপনা থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করে থাকেন। হয়তো শতকরা দশজনের ওপর ক্যাথিটার প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

কিন্তু সদ্য-প্রসূতির পক্ষে মূত্রত্যাগে অসুবিধা ঘটার কারণ কি ?—প্রসবের সময় বারবার প্রসারিত হওয়া এবং তার ওপর ডাক্তারবাবুর কাটাছেঁড়া ও সেলাই-এর ফলে প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের সমস্ত পেশী ইত্যাদি এতই উত্তেজিত হয়ে থাকে যে তার ফলে অনেক সময় মূত্রথলির মুখটা বন্ধ থাকে। একারণে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রসূতির পক্ষে আপনা থেকেই মাংসপেশী ঢিলে করে দিয়ে মূত্রথলি খালি করে ফেলা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে যে-সব প্রসূতি মানসিক দিক থেকে একটু বেশি উত্তেজনাপ্রবণ তাঁদের বেলাতেই এই অসুবিধা ঘটতে দেখা যায়।

মলত্যাগ—সন্তানপ্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে মলত্যাগে কিছু বিলম্ব ঘটবে এবং সাধারণত আপনা থেকে পায়খানা হতে চাইবে না। সন্তানপ্রসব যতই স্বাভাবিক হোক না কেন (এমন কি প্রসবের সময় কাটাছেঁড়া ও সেলাই-এর প্রয়োজন না হলেও) এবং প্রসূতি স্বাভাবিকভাবে যতই খাওয়াদাওয়া করুন না কেন, প্রসবের পর তৃতীয় দিনের আগে সাধারণত পায়খানার বেগ আসেই না।

হাসপাতালগুলিতে নিয়ম হচ্ছে প্রসবের পর দ্বিতীয় দিন রাত্রে প্রসূতিকে জোলাপ দেওয়া। এতে কাজ হলে, আর কিছু করার

হাঁটাচলা করলে যে-সব প্রসূতির যোনিদেশে প্রসবকালে সেলাই পড়েছে তাঁরা একটু বেশি অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। যাই হোক, আজকাল ওই সব দেশের হাসপাতালে সদ্য-প্রসূতিকে—এমন কি যাঁদের দেহে সীজারিয়ন অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তাঁদেরও—প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে থাকার পরামর্শ দেয় না, এবং হাসপাতালেও সাত দিনের বেশি ধরে রাখে না।

যে-হাসপাতালে আপনি আছেন হয়তো দেখবেন সেখানকার ডাক্তারবাবু আপনার শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে প্রসবের এক, দুই কিংবা তিন দিন পর থেকেই আপনাকে উঠে বসতে ও অল্প অল্প হাঁটাচলা করতে পরামর্শ দেবেন। তিনি আপনাকে এই অভ্যাস ক্রমশ বাড়িয়ে যাবার কথাও হয়তো বলবেন। এ-পরামর্শ আপনি স্বচ্ছন্দে মেনে চলতে পারেন। কেবল মনে রাখবেন, শরীরে যতটুকু রয়-সয় প্রতিদিন ততটুকুই পরিশ্রম করবেন, শরীরের ওপর জোর ফলিয়ে নিজেকে অতিরিক্ত ক্লান্ত করে তুলবেন না। কেননা, সনাতনী ও আধুনিক সব ধরনের চিকিৎসকই এ সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাটা ক্ষতিকর বলে মনে করেন।

মূত্রত্যাগ—সন্তানপ্রসবের পর সাধারণত বারো ঘণ্টার মধ্যে সদ্য-প্রসূতি প্রথমবার মূত্রত্যাগ করবেন বলে আশা করা যায়। তবে এ-ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যায় না। প্রসূতি যদি প্রসবের বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই জল খাওয়া বন্ধ করে থাকেন এবং প্রসবের সময় তাঁর ওপর কড়া জ্ঞাননাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ও প্রসববেদনা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তাঁর প্রস্রাব বারো ঘণ্টার চেয়েও বেশি সময় বন্ধ থাকতে পারে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। কেননা, এরকম ক্ষেত্রে মূত্রথলিতে প্রস্রাব জমে রয়েছে অথচ প্রস্রাব হচ্ছে না এমনও নয়। এক্ষেত্রে প্রসূতিকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে ও আপনা থেকে মূত্রত্যাগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে।

তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে নার্স দেখেন যে প্রসূতির মূত্রথলি ফেঁপে উঠেছে—অর্থাৎ ওই থলিতে প্রস্রাব জমে গেছে—অথচ আপনা থেকে মূত্রত্যাগ সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনি অবশ্যই প্রয়োজনমতো এক কিংবা একাধিকবার ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রসূতিকে মূত্রত্যাগ করিয়ে দেবেন। এভাবে মূত্রত্যাগ করতে অসুবিধা বোধ করার কারণ নেই। কাজেই ক্যাথিটার প্রয়োগের নাম শুনে প্রসূতি যেন ভয় না পান।

তবে, জেনে রাখুন, শতকরা নব্বুইভাগ প্রসূতিই আপনা থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করে থাকেন। হয়তো শতকরা দশজনের ওপর ক্যাথিটার প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

কিন্তু সদ্য-প্রসূতির পক্ষে মূত্রত্যাগে অসুবিধা ঘটার কারণ কি ?—প্রসবের সময় বারবার প্রসারিত হওয়া এবং তার ওপর ডাক্তারবাবুর কাটাছেঁড়া ও সেলাই-এর ফলে প্রসূতির বস্তি-প্রদেশের সমস্ত পেশী ইত্যাদি এতই উত্তেজিত হয়ে থাকে যে তার ফলে অনেক সময় মূত্রথলির মুখটা বন্ধ থাকে। একারণে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রসূতির পক্ষে আপনা থেকেই মাংসপেশী ঢিলে করে দিয়ে মূত্রথলি খালি করে ফেলা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে যে-সব প্রসূতি মানসিক দিক থেকে একটু বেশি উত্তেজনাপ্রবণ তাঁদের বেলাতেই এই অসুবিধা ঘটতে দেখা যায়।

মলত্যাগ—সন্তানপ্রসবের পর প্রসূতির পক্ষে মলত্যাগে কিছু বিলম্ব ঘটবে এবং সাধারণত আপনা থেকে পায়খানা হতে চাইবে না। সন্তানপ্রসব যতই স্বাভাবিক হোক না কেন (এমন কি প্রসবের সময় কাটাছেঁড়া ও সেলাই-এর প্রয়োজন না হলেও) এবং প্রসূতি স্বাভাবিকভাবে যতই খাওয়াদাওয়া করুন না কেন, প্রসবের পর তৃতীয় দিনের আগে সাধারণত পায়খানার বেগ আসেই না।

হাসপাতালগুলিতে নিয়ম হচ্ছে প্রসবের পর দ্বিতীয় দিন রাত্রে প্রসূতিকে জোলাপ দেওয়া। এতে কাজ হলে, আর কিছু করার

দরকার হয় না। প্রসূতিকে কী জোলাপ দেওয়া হবে তা ডাক্তার-বাবুই স্থির করবেন। একেক প্রসূতির জন্যে একেক রকম জোলাপের ব্যবস্থা। একজনের কাছে যা নরম, অন্যের কাছে তাই কড়া জোলাপ। এছাড়া আরো একটা বিষয় বিবেচনা করা দরকার। সেটি হল, প্রসূতি শিশুকে স্তন্যদান করছেন কিনা। যে-প্রসূতি স্তন্যদান করছেন তাঁকে এমন জোলাপ দিতে হবে যাতে সে-জোলাপ প্রসূতির শরীর না শুষে নেয়। প্রসূতির দেহে জোলাপ শুষে গেলে তা তাঁর বুকের দুধের সঙ্গেও বেরোবে, ফলে সেই দুধ খেয়ে শিশুরও পেট খারাপ হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন রাত্রে জোলাপ দেবার পর তৃতীয় দিনে প্রসূতির পায়খানা না হলে ডাক্তারবাবু বিবেচনা করে দেখবেন তাঁকে ডুশ-প্রয়োগে পায়খানা করানোর দরকার আছে কিনা।

প্রসবের পর প্রথম বার পায়খানায় যেতে বহু প্রসূতিই ভয় পান। বিশেষ করে প্রসবের সময় যোনিদেশে কাটাছেঁড়া ও সেলাই হয়ে থাকলে মলদ্বারে অল্পস্বল্প বেদনা বোধ করেন বলে প্রসূতি মনে করেন পায়খানা সম্ভবত অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার হবে। আসলে ব্যাপার কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রসবের পর প্রস্রাব করার চেয়ে পায়খানা করায় বেশি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় না। যা কিছু অসুবিধা বোধ হয় তা শুধুমাত্র এক বিশেষ ভঙ্গিতে বসার জন্য হয়, মলত্যাগের দরুন নয়।

পথ্য—প্রসবের পরে প্রসূতির খাওয়ার বিশেষ ইচ্ছা থাকে না। বিশেষ করে তাঁর ওপর ঘুমের বা জ্ঞাননাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হলে তো বটেই। তবে প্রসবের পর দ্বিতীয় দিন থেকে প্রসূতি তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য খেতে পারেন।

"হেঁতাল-ব্যথা"—প্রথম প্রসূতির ক্ষেত্রে প্রসবের পরবর্তী ফিক-ব্যথা দেখা দিলেও তা এত মৃদু ধরনের হয় যে তাতে তাঁর খুব বেশি

অসুবিধা হয় না। এঁদের বেলা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই জরায়ু বেশ শক্তভাবে কুঁকড়ে যায় এবং পরেও তা ওই অবস্থায় থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা পরবর্তী প্রসবের পর জরায়ুর পেশী একবার কুঁকড়ে যাওয়ার পরও ফের অল্প অল্প শিথিল হয়ে যেতে ও তার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিগুণ জোরে সংকুচিত হতে দেখা যায়। ফলে এর সঙ্গে যে যন্ত্রণা বোধ হয় তা অনেক সময় প্রসববেদনারই সমতুল্য। বিশেষ করে প্রসূতি যদি শিশুকে স্তন্যদান করেন তাহলে স্তন্যদানের সময়টাতেই যন্ত্রণা খুব বেশি বাড়তে দেখা যায়। তাছাড়া আরগটের উপাদানমিশ্রিত ওষুধ খেলেও এটি খুব বাড়ে।

সাধারণত, প্রসবের পরের দিন দুই এই হেঁতাল-ব্যথা খুব বেশি বোধ হতে থাকে এবং তারপর ক্রমশ কমে যায়।

প্রসবের পর রক্তস্রাব—প্রসবের পর সেই দিনই ফিনকি দিয়ে কিংবা চাপ বেঁধে অল্প খানিকটা রক্তস্রাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতঃপর ওই প্রথম কয়েক দিন রোজই এই ধরনের টকটকে লাল রক্তের স্রাব খানিকটা করে ঘটতে থাকবে। এই ধরনের স্রাব মাসিক ঋতুস্রাবের দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনের রক্তের পরিমাণের চেয়ে বেশিই হবে। প্রসবের দিন তিন-চার পর থেকে এই স্রাবের রঙ আর আগের মতো টকটকে লাল থাকবে না ; এর রঙ হবে তখন গাঢ় গোলাপী ধরনের। যত দিন যাবে এই গাঢ় গোলাপী রঙটাও তত ক্রমশ ফিকে হয়ে আসবে। অবশেষে, প্রসবের পর আট থেকে দশ দিনের ভেতর এই স্রাবের রক্ত ফিকে গোলাপী হয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে বাদামী হতে থাকবে, কিংবা প্রায়-সাদা হয়ে যাবে। এই ফিকে রঙিন স্রাব এরপর আরো প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহ চলবে।

তবে অনেক সময় হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় স্থান পরিবর্তন জনিত উত্তেজনার ফলে কয়েক দিনের জন্যে ফের আবার ঘোর লাল রঙের স্রাব দেখা দিতে থাকে।

সেলাই-এর জের—আজকাল ডাক্তারবাবু প্রসূতিকে প্রসবের পর দ্রুত উঠে বসতে ও হেঁটে-চলে বেড়াতে পরামর্শ দেন বলে সে-অনুসারে চলতে গিয়ে প্রসূতি তাঁর সেলাই-করা জায়গাটায় কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন। তবে এই অসুবিধা নিতান্তই সাময়িক এবং এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

প্রসবের সময় কাটাছেঁড়া ও সেলাইয়ের ফলে প্রথমত প্রসবের পরের কয়েক ঘণ্টা মলদ্বারের কাছাকাছি ওই জায়গাটায় একটা জ্বালাপোড়ার ভাব অনুভব করা যায়, তারপর ক্রমে ক্রমে এটি জুড়িয়ে যায় এবং প্রসূতি এর কথা প্রায় ভুলেই যান। তবে হঠাৎ কখনো হাঁচলে কিংবা কাশলে ফের ব্যথাটা অল্প কিছুক্ষণের জন্যে চাগিয়ে উঠতে পারে। অতঃপর আবার উঠে বসা ও হাঁটা-চলা অভ্যাস কবা শুরু করলে কারো কারো প্রথম প্রথম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হতে পারে।

তবে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হলেও এটি মারাত্মক ব্যাপার কিছু নয় জানবেন। যন্ত্রণা উপশমের বড়ি খেলেই ব্যথাটি সাময়িকভাবে কমে যাবে। মলম ব্যবহারেও ব্যথার জায়গাটা নরম থাকবে। তাছাড়া গরম সেঁক নিলেও উপকার পাওয়া যায়।

এই সেলাই প্রায় সব ক্ষেত্রে ক্যাটগাট নামের একরকম তন্তু দিয়ে করা হয় বলে সেলাই কাটার বড় একটা প্রয়োজন হয় না। কাটা জুড়ে যাবার পর এর তন্তু আপনা থেকে প্রসূতির শরীরে মিশে যায়। তবে বেদনা উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে থাকলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুকে কাটা ঘা জোড়বার পর সেলাই কেটে দিতে হয়।

প্রসবের পরে মনমরা ভাব—প্রসবের পর সাধারণত চতুর্থ কি পঞ্চম দিন নাগাত কিছু কিছু প্রসূতির মধ্যে একটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এঁদের কেউ বা মনমরা হয়ে পড়েন, কারো বা কথায়-কথায় অভিমান উথলে ওঠে ও চোখে জল এসে পড়ে। অথচ কেন যে তাঁদের এমন হচ্ছে তা তাঁরা বলতে পারবেন না।

সুখের কথা, প্রায় সব ক্ষেত্রেই তু-চার দিনের মধ্যে প্রসূতির এই মানসিক চাঞ্চল্য কেটে যায়। কখনো কখনো বড় জোর ডাক্তার-বাবুর এক-আধটুকু ওষুধেই কাজ দেয়।

মনে রাখা দরকার, এর কারণ মূলত মানসিক নয়, শারীরিক। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির দেহ নানা ধরনের গ্রন্থিক্ষরণে পূর্ণ থাকে। প্রসবের পর দ্রুত এই সব ক্ষরণ শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়। আচমকা শরীরে গ্রন্থিক্ষরণের মাত্রা কমে যাওয়ার দরুনই সদ্য-প্রসূতির এ-ধরনের মানসিক বৈকল্য ঘটে।

স্তন্যদান—ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে প্রসূতি শিশুকে স্তন্যদান করবেন মনস্থ করে থাকলে বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শেষের কয়েক সপ্তাহে তাঁকে স্তন্যাগ্রের যত্ন নিতে হবে। অর্থাৎ স্তনাগ্র তুটি যাতে বেশ নরম থাকে ও উত্তেজিত হলে শক্ত ও খাড়া হয়ে ওঠে সে-বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। এ তুটি পূর্বশর্ত ঠিক মতো পালিত না হলে প্রসূতির পক্ষে স্তন্যদান করা কষ্টকর, এমন কি অসম্ভব হয়েও উঠতে পারে।

প্রসবের পর প্রসূতি হয়তো দেখবেন তাঁর কি খাওয়া উচিত না-উচিত সে-সম্পর্কে নানারকম জল্পনা চলছে। কেউ হয়তো বলবেন প্রচুর পরিমাণে তুধ খেলে তাঁর বুকের তুধ বাড়বে; কেউ আবার ওই একই কারণে ফলমূল বেশি না-খেতে বলবেন। এ-সব কথার প্রায়ই কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না। আসল কথা হল প্রসূতির খাদ্য সুষম ও লঘুপাক হওয়া দরকাব।

কিভাবে শিশুকে স্তন্যদান কবতে হবে অনভিজ্ঞ বা প্রথম প্রসূতিকে তা বলে বোঝানো শক্ত। এটি হাতে-কলমে শেখার জিনিস। সাধাবণত হাসপাতালে থাকার সময় নার্সই (কিংবা সম্ভবস্থলে প্রসূতির কোনো অভিজ্ঞ আত্মীয়া) তাঁকে শিখিয়ে দেবেন কিভাবে শিশুকে স্তন দিতে হয়, কিভাবে তাকে জাগিয়ে রেখে সবটুকু তুধ শুষে নিতে শেখাতে হয়, কিভাবে স্তন্যপানের সময় শিশুর নাকটি

খোলা রাখতে হয় যাতে তার দম বন্ধ হবার ভয় না থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে স্তন্যদানের এই পদ্ধতিটি সাধারণভাবে বর্ণনা করা হল। একথা মনে রাখবেন, অধিকাংশ শিশুই অত্যন্ত সহজে স্তন্যদান আয়ত্ত করে নেয়। শিশুর জন্মের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ প্রসূতির পক্ষে বিছানায় শুয়ে পড়ে শিশুকে স্তন্যদান করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। নিজে শোবার পর শিশুকেও আপনার পাশে বিছানায় শুইয়ে নিন। অতঃপর তার দিকে মুখ করে আপনি পাশ ফিরে শুন এবং তার এতটা কাছে এগিয়ে আসুন যাতে স্তনের বৃন্তটি তার ঠোঁট স্পর্শ করে। স্তনাগ্রটিকে শিশুর ঠোঁটের মধ্যে সঠিক অবস্থানে আনার জন্যে এই সময়ে আপনাকে এক হাতের কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়েও শুতে হতে পারে। অবশ্য স্তনাগ্রটি শিশুর মুখ স্পর্শ করলে সে নিজে থেকেই মুখ ঘুরিয়ে সেটিকে দুই ঠোঁটের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করবে। শিশুর নাকেব ফুটো দুটি স্তনের মধ্যে যাতে চাপা না পড়ে তার জন্যে কখনো কখনো আপনাকে স্তনের ওপর একটি আঙুলেব চাপ দিয়ে নাকটি ছাড়িয়ে দিতেও হভে পাবে।

স্তন্যদানে অভ্যস্ত হবাব পর অবশ্য সব সময়েই যে বিছানায় শুয়ে শিশুকে স্তন দিতে হবে তাব কোনো মানে নেই। বিশেষ কবে যে-সময়ে প্রসূতির চোখে তন্দ্রার ভাব থাকবে সেই সময়ে (যেমন, মাঝরাত্রে ও শেষরাত্রে) স্তন দিতে হলে বিছানায় বা চেয়াবে উঠে বসে স্তন্যদানই বিধেয়। কেননা এরকম ক্ষেত্রে স্তন্যদান করতে করতে প্রসূতির পক্ষে ঘুমিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। আর ঘুমিয়ে পড়লে প্রসূতির স্তন কিংবা হাতের চাপে শিশুর দম আটকে যাওয়ার ভয় থাকে।

প্রসূতির মানসিক অবস্থার সঙ্গে স্তনে দুধের সরবরাহের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। অনেক সময় শিশুর কান্না শুনলেই প্রসূতির স্তনাগ্রে দুধ আসতে দেখা যায়। আবার প্রসূতির মানসিক কষ্ট ও উৎকণ্ঠা থাকলে স্তনে দুধ আসতে দেরি হয়। এ-কারণে শিশুকে স্তন্যদানের আগে মন থেকে সব রকম দুশ্চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা

উচিত। সম্ভবস্থলে প্রতিবার স্তন্যদানের আগে অন্তত মিনিট পনেরো বিছানায় শুয়ে শরীর মন এলিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়।

প্রসূতির স্তনাগ্রগুলি যথোচিত সুগঠিত, শক্ত ও খাড়া না হলে নবজাত শিশু অনেক সময় মাতৃস্তন্য পান করতে চায় না। বিশেষ করে স্তন্যপানের সময় মায়ের স্তনাগ্র খুঁজে না পেলে (অর্থাৎ স্তনাগ্র দুটি খুব বেশি ভেতরদিকে ঢোকানো হলে) শিশু ভীষণ চটে যায় ও কাঁদতে থাকে এবং মাথা সরিয়ে নিতে চায়। এরকম ক্ষেত্রে প্রসূতি কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করে দেখতে পারেন শিশুকে স্তন্যপানে উৎসাহিত করা যায় কিনা। যেমন, খুব ভোরবেলা শিশু ঘুম থেকে জেগে ওঠামাত্রই তাকে স্তন্যদান করুন। এ সময়ে শিশুর মেজাজ দিনের অন্য সময়ের চেয়ে ভালো থাকার কথা, কাজেই তাকে স্তন্যপানে প্রবৃত্ত করানো যেতে পারে। কিন্তু এ-সময়েও শিশু যদি কাঁদতে থাকে তাহলে জবরদস্তি তাকে স্তন্যদানের চেষ্টা না করে অবিলম্বে তা বন্ধ করে শিশুকে শান্ত করুন এবং কিছুক্ষণ পরে ফের চেষ্টা করে দেখুন। অনেক সময় ধৈর্য ধরে ও সময় নিয়ে চেষ্টা করলে সুফল ফলাতে দেখা যায়। এছাড়া, অনেক সময় স্তন্যদানের ঠিক আগে (ভালো করে সাবান-জলে হাত ধুয়ে নিয়ে) স্তনাগ্র দুটি আস্তে আস্তে ঘষলে সে দুটি শক্ত ও খাড়া হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় আবার স্তনাগ্রে ঢাকনি বা চুষি লাগিয়ে মিনিটখানেক স্তন্যদানের পরও স্তনাগ্র শক্ত ও খাড়া হতে দেখা যায়। কিন্তু এতেও ফল না পেলে আরো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখা যেতে পারে। সেটি হল, স্তনের সামনের দিকের চামড়া টান করে নিয়ে ও হাতের বুড়ো আঙুল ও অন্য আঙুলগুলির মধ্যে সেই অংশটি চেপে ধরে স্তনাগ্রের চারপাশের সমগ্র কালো অংশটিই শিশুর মুখের মধ্যে গুঁজে দেওয়া। শিশু ওই অংশটি বারকয়েক চুষলে পর স্তনাগ্রটি শক্ত হয়ে উঠে বেরিয়ে এলেও আসতে পারে। এইভাবে স্তন্যপানের সময় প্রসূতি যদি স্তনাগ্র থেকে কয়েক ফোঁটা দুধ বের করার কৌশলটিও আয়ত্ত করতে পারেন, তাহলে শিশুকে স্তন্যপানে প্রলুব্ধ করা

অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

স্তন্যদানের সময় শিশু যাতে স্তন্যপানে নিরুৎসাহিত না হয় বা চটে না-ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। এ-সময়ে শিশুর মাথা চেপে ধরে স্তনাগ্রের দিকে তার মুখ ঘোরাবার কিংবা দু-আঙুলে তার গাল দুটি টিপে ধরে হাঁ-করানোর চেষ্টা করলে শিশু সাধারণত চটে ওঠে। কেননা, প্রথমত, শিশু মাথা চেপে ধরা পছন্দ করে না। চেপে ধরলে সব সময়ে সে মাথা ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, গালে কোনো কিছু ঠেকলে মুখটি সেই দিকে ঘোরানো তার একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও এইভাবেই শিশু আপনা থেকে মায়ের স্তনাগ্র খুঁজে নেয়। কাজেই এক সঙ্গে তার দুটি গাল টিপলে কোন্ দিকে মুখ ফেরাবে স্থির করতে না পেরে সে চটে ওঠে।

এছাড়া, স্তন্যদানেব আবো কয়েকটি সমস্যা আছে। যেমন, একটি হল, স্তন্যপান শেষ হবার পরও শিশুর স্তনাগ্র ছাড়তে না-চাওয়া। এরকম ক্ষেত্রে শিশুব মাথা ঠেলে সরিয়ে স্তন ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করবেন না। এতে স্তনাগ্রে ঘা লাগবে। এক্ষেত্রে স্তন ছাড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হল, স্তনের একটা পাশ এক আঙুলে চেপে ধবে শিশুব মুখের একটা কোণ ফাঁক করে দেওয়া। এর ফলে ওই ফাঁকেব মধ্যে দিয়ে হাওয়া ঢুকলেই শিশুর মুখ স্তন থেকে খসে যাবে। এছাড়া, কোনো কোনো শিশুকে স্তন্যপানের সময় স্তনাগ্র চিবোতে দেখা যায়। এটি বিশেষ করে প্রথম কয়েক সপ্তাহে ঘটে। শিশুর এই বদভ্যাস সর্বক্ষেত্রেই বন্ধ করা দরকার, বিশেষ করে মায়ের স্তনাগ্র ফাটবাব সম্ভাবনা থাকলে তো কথাই নেই। এরকম ক্ষেত্রে, স্তন্যদানেব পালা শেষ হবামাত্র স্তনটি যে অবিলম্বে ছাড়িয়ে নেবেন তা বলাই বাহুল্য। এমন কি স্তন্যদান শেষ না-হয়ে থাকলেও মিনিটখানেকের জন্যে শিশুর মুখ স্তন থেকে ছাড়িয়ে দিন এবং পরে ফের স্তন্যদানের চেষ্টা কবে দেখুন।

স্তন্যদানের একটি সাধারণ নিয়ম হল প্রসবের চব্বিশ ঘণ্টা পর নবজাত শিশুকে প্রথম স্তন দিতে হয়। এর দ্বিতীয় নিয়মটি হল

প্রতিবার স্তন্যদানের সময় শিশুকে পর পর দুটি স্তনই দিতে হয়। তৃতীয়ত বুকে দুধের সরবরাহ পাকাপাকিভাবে স্থায়ী না-হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রসবের পর তৃতীয় চতুর্থ কি পঞ্চম দিন না-আসা পর্যন্ত, শিশুকে একসঙ্গে খুব বেশিক্ষণ স্তন চুষতে না-দেওয়া কিংবা ঘন ঘন স্তন্যদান না-করা কর্তব্য। এ-সময়ে প্রতিবার পাঁচ থেকে দশ মিনিট করে দিনে বার দুই স্তন্যদানই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। অতঃপর, বুকে দুধের সরবরাহ স্থায়ী হলে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর (ভোর ছটা, সকাল দশটা, দুপুর দুটো, সন্ধ্যা ছটা—এইভাবে) স্তন্যদান সাধারণ-ভাবে প্রচলিত নিয়ম। তবে প্রথম দিকে কয়েক দিন মাঝরাত্রের (রাত্রি দুটোর) খাওয়ানাটা বন্ধ রাখলেই ভালো হয়। বুকে দুধের সরবরাহ অব্যাহত থাকলে এবং স্তনাগ্রের কোনো অসুবিধা বা কষ্ট না থাকলে প্রতিবারের স্তন্যদানের সময়ও ক্রমে ক্রমে বাড়ানো চলবে এবং ওই উপরোক্ত পাঁচ বা দশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিট ও পরে বিশ মিনিট পর্যন্ত একেকবার স্তন্যদান করা চলবে। তবে বুকে দুধের সরবরাহ যথেষ্ট না হলে এবং শিশুর পক্ষে একবার স্তন্যপানের পর চার ঘণ্টা করে অপেক্ষা কবা সম্ভব না হলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। সম্ভবত এবকম ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু প্রসূতিকে চার ঘণ্টার বদলে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তন্যদানেব পরামর্শ দেবেন।

শিশুকে স্তন্যদানের এই পর্বেও স্তনাগ্রের যত্ন চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। প্রতিদিন দুটি স্তনই ভালো করে ধুয়ে ছোট্ট চৌকো দু-টুকরো গজ-কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা কর্তব্য। এছাড়া স্তনাগ্র নরম রাখার উদ্দেশ্যে ও চামড়া যাতে না-ফাটে সেজন্যে ভিটামিন এ ও ডি অয়েন্টমেন্টজাতীয় মলমও নিয়মিত মালিশ করা দরকার। এতদ্‌সত্ত্বেও স্তনাগ্র ফাটলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো চলতে হবে এবং প্রয়োজনমত প্রতিবারের স্তন্যদানের সময় অন্তত চার মিনিট করে কমিয়ে দিতে হবে- অর্থাৎ বিশ মিনিটের জায়গায় প্রতি স্তনে আট মিনিট করে মোট যোলো মিনিট ধার্য করতে হবে।

কিন্তু এ তো গেল যে-সব প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যদানে ইচ্ছুক তাঁদের

কথা। এছাড়া এমনও অল্পসংখ্যক প্রসূতি আছেন একাধিক কারণে যাঁদের পক্ষে শিশুকে স্তন্যদান সম্ভব নয়। আবার শিশুকে স্তন্যদানে ইচ্ছুক নন এমন প্রসূতিও যে আমাদের দেশে নেই তা নয়। এই শেষোক্ত দু-ধবনের প্রসূতির ক্ষেত্রে প্রসবের পব সাধারণত যে-সমস্যাটি দেখা দেয় তা হল বুকে অতিরিক্ত পরিমাণ দুধ জমে যাওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এব দরুন প্রসূতির স্তন টনটন করা, পেকে ওঠা, জ্বর হওয়া ইত্যাদি। বুকে অতিরিক্ত দুধ জমে গেলে হাসপাতালগুলিতে পাম্পের সাহায্যে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বুক থেকে দুধ টেনে বের কবে ফেলার ব্যবস্থা আছে। এর চেয়েও ভালো আবেকটি উপায় হচ্ছে, হাত দিয়ে টিপে স্তন থেকে দুধ গেলে ফেলা। স্তনেব মধ্যে দুধ যে-সমস্ত থলিতে জমা হয় সেগুলি স্তনাগ্রের চারপাশের কালো জায়গাটার অনেকটা নিচে থাকে। একটি ভাঙা কানাওয়ালা চায়েব কাপ নিয়ে তার নিচের কানাটি স্তনাগ্রের নিচের দিকে ঠেসে ধবতে হয় এবং একটি কি দুটি আঙুল দিয়ে স্তনাগ্রের ওপর দিকটা বেশ খানিকটা জোবে টিপতে হয়। স্তনাগ্র ও তার চারপাশেব কালো জায়গাটা কাপেব কানা ও হাতের আঙুলের মধ্যে পিষ্ট হলে তার মধ্যেকার থলিগুলি থেকে দুধ বেবিয়ে আসে। এতেও পুবো ফল না পেলে আজকাল ডাক্তারবা প্রসূতির ওপর স্টিল্‌বেস্‌টেরল ও আরো নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি গ্রন্থিক্ষরণ অল্প পরিমাণে ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করে থাকেন। এতে বেশ সুফল ফলতে দেখা যায়। এ-চিকিৎসায় হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফেরাব সময় নাগাদই প্রসূতির স্তনদ্বয় নরম ও স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে ফেব ওই উপসর্গ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বাড়ি ফেরা—বর্তমানে প্রসবের পর প্রসূতির হাসপাতাল-বাসের গড়পড়তা সময় হচ্ছে সাত দিন। অতঃপব ফের বাড়ি ফেরা।

বাড়ি ফেরার সময়ও প্রসূতির কাপড়ে দাগ লাগার মতো অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। অনেক সময় বাড়ি ফেরাব উত্তেজনায় এ

সময়ে আচমকা স্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, স্রাবের রঙও টকটকে লাল হয়ে ওঠে। এরকম কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ফের প্রসূতিকে জরায়ুর পেশী সংকোচনের ওষুধ খেতে ও কয়েকদিন শয্যাশায়ী থেকে বিশ্রাম নিতে হতে পারে। এ-সময়ে যোনিদেশের সেলাই-এর জায়গাটায় বেদনা বেড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। তবে তার জন্যে বিশেষ কোনো চিকিৎসার দরকার হবে না বলেই মনে হয়।

বাড়ি ফেরার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ—মনে রাখবেন, সাত দিনে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এখনো আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক নন। এখনো অনেক ব্যাপারে আপনাকে কড়া নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন, ধরুন, বাড়ি ফেরার পর অন্তত প্রথম সপ্তাহটা আপনাকে যথাসম্ভব বেশি সময় শয্যা আশ্রয় করে থাকতে হবে বা বিশ্রাম নিতে হবে। সম্ভবস্থলে এর পরেও আরো এক-আধ সপ্তাহ সকালবেলায় খানিকটা সময় ও সারা দুপুর আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে এবং রাত্রে ন-টার মধ্যে ঘুমোতে হবে। তাছাড়া এ-সময়ে অন্তত পক্ষে সপ্তাহ দুই আপনার পক্ষে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরুনো নিষেধ। অন্যান্য নিষেধের মধ্যে একটি হল, অন্ততপক্ষে সপ্তাহ দুই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা বন্ধ রাখা কিংবা, তা সম্ভব না হলে, খুব কম করা (ধরুন, দিনে একবার কি বড় জোর দু-বার, তার বেশি নয়)। আরেকটি নিষিদ্ধ বস্তু, স্বামী-সহবাস ও যোনির মধ্যে ডুশ নেওয়া। স্নান নিষিদ্ধ নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু টবের মধ্যে স্নান করা অন্ততপক্ষে মাসখানেক বন্ধ রাখা কর্তব্য।

অবশ্য এত নিষেধের অর্থ এ নয় যে প্রসূতি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সারাদিন বিছানায় শুয়ে কাটাবেন। বাড়ি ফেরার পর আপনার ওঠা-বসা চলা-ফেরা কোনো কিছুই বারণ নয়। এমন কি সংসারের কম পরিশ্রমসাধ্য টুকিটাকি কাজেও বাধা নেই। তবে যাই করুন না কেন, সবই মাত্রা রেখে, নিজেকে ক্লান্ত না করে সারতে হবে। তবে কাজের মাত্রা অল্প থেকে ক্রমে বাড়িয়ে যেতেও পারবেন।

কথা। এছাড়া এমনও অল্পসংখ্যক প্রসূতি আছেন একাধিক কারণে যাঁদের পক্ষে শিশুকে স্তন্যদান সম্ভব নয়। আবার শিশুকে স্তন্যদানে ইচ্ছুক নন এমন প্রসূতিও যে আমাদের দেশে নেই তা নয়। এই শেষোক্ত দু-ধরনের প্রসূতির ক্ষেত্রে প্রসবের পর সাধারণত যে-সমস্যাটি দেখা দেয় তা হল বুকে অতিরিক্ত পরিমাণ দুধ জমে যাওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর দরুন প্রসূতির স্তন টনটন করা, পেকে ওঠা, জ্বর হওয়া ইত্যাদি। বুকে অতিরিক্ত দুধ জমে গেলে হাসপাতালগুলিতে পাম্পের সাহায্যে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বুক থেকে দুধ টেনে বের করে ফেলার ব্যবস্থা আছে। এর চেয়েও ভালো আরেকটি উপায় হচ্ছে, হাত দিয়ে টিপে স্তন থেকে দুধ গেলে ফেলা। স্তনের মধ্যে দুধ যে-সমস্ত থলিতে জমা হয় সেগুলি স্তনাগ্রের চারপাশের কালো জায়গাটার অনেকটা নিচে থাকে। একটি ভাঙা কানাওয়ালা চায়ের কাপ নিয়ে তার নিচের কানাটি স্তনাগ্রের নিচের দিকে ঠেসে ধরতে হয় এবং একটি কি দুটি আঙুল দিয়ে স্তনাগ্রের ওপর দিকটা বেশ খানিকটা জোরে টিপতে হয়। স্তনাগ্র ও তার চারপাশের কালো জায়গাটা কাপের কানা ও হাতের আঙুলের মধ্যে পিষ্ট হলে তার মধ্যেকার থলিগুলি থেকে দুধ বেরিয়ে আসে। এতেও পুরো ফল না পেলে আজকাল ডাক্তাররা প্রসূতির ওপর স্টিল্‌বেস্‌টেরল ও আরো নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি গ্রন্থিক্ষরণ অল্প পরিমাণে ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করে থাকেন। এতে বেশ সুফল ফলতে দেখা যায়। এ-চিকিৎসায় হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফেরার সময় নাগাদই প্রসূতির স্তনদ্বয় নরম ও স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে ফের ওই উপসর্গ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বাড়ি ফেরা—বর্তমানে প্রসবের পর প্রসূতির হাসপাতাল-বাসের গড়পড়তা সময় হচ্ছে সাত দিন। অতঃপর ফের বাড়ি ফেরা। বাড়ি ফেরার সময়ও প্রসূতির কাপড়ে দাগ লাগার মতো অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। অনেক সময় বাড়ি ফেরার উত্তেজনায় এ

সময়ে আচমকা স্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, স্রাবের রঙও টকটকে লাল হয়ে ওঠে। এরকম কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ফের প্রসূতিকে জরায়ুর পেশী সংকোচনের ওষুধ খেতে ও কয়েকদিন শয্যাশায়ী থেকে বিশ্রাম নিতে হতে পারে। এ-সময়ে যোনিদেশের সেলাই-এর জায়গাটায় বেদনা বেড়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। তবে তার জন্যে বিশেষ কোনো চিকিৎসার দরকার হবে না বলেই মনে হয়।

বাড়ি ফেরার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ—মনে রাখবেন, সাত দিনে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এখনো আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক নন। এখনো অনেক ব্যাপারে আপনাকে কড়া নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন, ধরুন, বাড়ি ফেরার পর অন্তত প্রথম সপ্তাহটা আপনাকে যথাসম্ভব বেশি সময় শয্যা আশ্রয় করে থাকতে হবে বা বিশ্রাম নিতে হবে। সম্ভবস্থলে এর পরেও আরো এক-আধ সপ্তাহ সকালবেলায় খানিকটা সময় ও সারা দুপুর আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে এবং রাত্রে ন-টার মধ্যে ঘুমোতে হবে। তাছাড়া এ-সময়ে অন্ততপক্ষে সপ্তাহ দুই আপনার পক্ষে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরুনো নিষেধ। অন্যান্য নিষেধের মধ্যে একটি হল, অন্ততপক্ষে সপ্তাহ দুই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা বন্ধ রাখা কিংবা, তা সম্ভব না হলে, খুব কম করা (ধরুন, দিনে একবার কি বড় জোর দু-বার, তার বেশি নয়)। আরেকটি নিষিদ্ধ বস্তু, স্বামী-সহবাস ও যোনির মধ্যে ডুশ নেওয়া। স্নান নিষিদ্ধ নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু টবের মধ্যে স্নান করা অন্ততপক্ষে মাসখানেক বন্ধ রাখা কর্তব্য।

অবশ্য এত নিষেধের অর্থ এ নয় যে প্রসূতি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সারাদিন বিছানায় শুয়ে কাটাবেন। বাড়ি ফেরার পর আপনার ওঠা-বসা চলা-ফেরা কোনো কিছুই বারণ নয়। এমন কি সংসারের কম পরিশ্রমসাধ্য টুকিটাকি কাজেও বাধা নেই। তবে যাই করুন না কেন, সবই মাত্রা রেখে, নিজেকে ক্লান্ত না করে সারতে হবে। তবে কাজের মাত্রা অল্প থেকে ক্রমে বাড়িয়ে যেতেও পারবেন।

এবং এইভাবে ধীরেসুস্থে মাত্রা চড়াতে চড়াতে দ্বিতীয় সপ্তাহের পর আপনি আগের চেয়ে বেশি সিঁড়ি ভাঙতে ও এমন কি বাড়ির বাইরেও বেরুতে পারবেন।

অতঃপর শিশুর বয়স চার সপ্তাহ পূর্ণ হবার পর আপনার শরীরের অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়েছে বলে ধরে নিতে পারেন। শিশুকে কবে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন তা আপনার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। বাড়ির বাইরে প্রাকৃতিক অবস্থা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিচার করে ডাক্তারবাবু আপনাকে তাঁর মতামত জানাবেন।

প্রসবের পর দেহসৌষ্ঠব রক্ষা -পরিণত গর্ভাবস্থায় প্রসূতির ওজন পনেরো থেকে পঁচিশ পাউণ্ডেব মতো বেড়ে থাকলে ভবিষ্যৎ ভেবে খুব বেশি চিন্তিত হবাব কারণ নেই। কারণ, দেহের ওজন ওই পরিমাণ বেড়ে থাকলে সন্তানপ্রসবেব পর আপনার পক্ষে অতিরিক্ত মোটা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। এব ফলে আপনার বর্তমান ওজন গর্ভাবস্থার আগেকাব ওজনের চেয়ে বড় জোব পাঁচ-সাত পাউণ্ডের মতো বাড়বে। এবং কালক্রমে এই পাঁচ সাত পাউণ্ডও ঝরে যাওয়া খুবই সম্ভব।

কিন্তু প্রসূতির শরীরের গঠন এমনিতেই যদি একটু মোটা ধাঁচের হয়, কিংবা গর্ভাবস্থায় তাঁর ওজন অস্বাভাবিকরকম বেড়ে গিয়ে থাকে এবং প্রসবের পবও এই অতিরিক্ত ওজনের বেশ খানিকটা বর্তমান থেকে যায়, তাহলে অবশ্য ওজন কমানোর সমস্যা দেখা দিতে পারে। যে-সব প্রসূতি গর্ভাবস্থায় এদিকে তেমন নজর দেন না, তাঁদের শরীরের ওজন ওই সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি চল্লিশ-পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্যন্ত বেড়ে যেতে দেখা যায়। এই সব মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রসবের পর থেকেই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হতে পারে।

তবে যে-সমস্ত প্রসূতি নবজাতককে স্তন্যদান করছেন তাঁদের বেলায় এই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ে একটু ভেবে-দেখার ব্যাপার আছে।

কেননা, শিশুকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যগুণযুক্ত দুধ সরবরাহের জন্যে এঁদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো খাওয়াদাওয়া করা দরকার। তাছাড়া, স্তন্যদানকারিণী প্রসূতির পক্ষে আপনা থেকেই ওজন কমিয়ে ফেলা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ, তাঁর শরীরে মজুত মেদ প্রতিদিনই খানিকটা করে দুধের আকারে নির্গত হয়ে যায় তবে এ ধরনের প্রসূতির দেহে যদি অস্বাভাবিক রকম মেদ সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং প্রসূতির পক্ষে খাদ্যগুণযুক্ত ভালো খাবার-দাবার—অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণে খনিজ দ্রব্য, প্রোটিন ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য—পাবার কোনো অসুবিধা না থাকে, তাহলে তাঁর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনিও অন্যান্য খাদ্য ও অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থেকে কিছু পরিমাণে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

প্রসূতি যে-সব ক্ষেত্রে সন্তানকে স্তন্যদান করছেন না সেখানে অবশ্য কড়াকড়িভাবে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ করে ওজন কমিয়ে ফেলা অনেক সহজ। এরকম ক্ষেত্রে সদ্য-প্রসূতি ও অন্যান্য মেয়ের মধ্যে কোনো তারতম্য করারও দরকার পড়ে না। তবে সর্বত্রই একটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার যে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাত, রুটি ও শাকসব্জিজাতীয় ভারী জিনিস (যাতে পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কার হয়) মাছ, মাংস, ছানা, ডাল ইত্যাদি প্রোটিন (যাতে দৈনন্দিন পরিশ্রমের ফলে শরীরের যে ক্ষতি হয় তার পূরণ সম্ভব হয়) এবং খনিজ দ্রব্য ও ভিটামিনের যোগান যেন অব্যাহত থাকে।

সন্তানপ্রসবের পর প্রায় সব মেয়েরই পেটের মাংসপেশী শিথিল হয়ে যায় বা ঝুলে পড়ে। এটি অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়ম। পেটের মধ্যে একটি পূর্ণ-পরিণত শিশুর থাকার জায়গা করে দেওয়ার জন্যে মাংস-পেশীগুলিকে অতিরিক্ত রকম প্রসারিত হতে হয়। প্রসবের পরক্ষণে এই প্রসারিত পেশীগুলি রবারের মতো গুটিয়ে আবার আগের আকার ধারণ করবে এতটা আশা করা যায় না। এর জন্যে প্রসবের পর কয়েক সপ্তাহ সময়ের দরকার। তবে পেটে অতিরিক্ত জল জমার

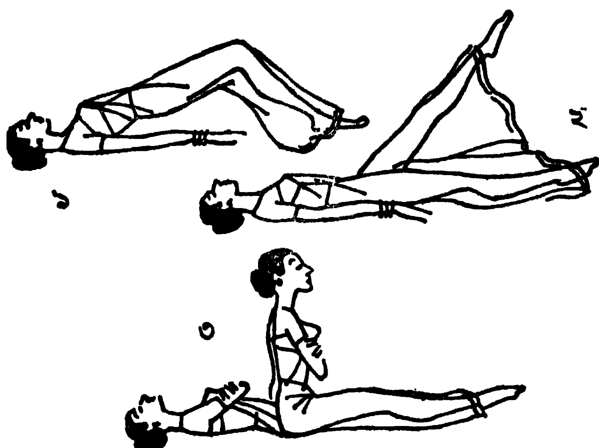
জন্যে কিংবা গর্ভস্থ শিশুর আকার অতিরিক্ত বড় হওয়া বা গর্ভে যমজ সন্তান থাকার দরুন পেটের পেশীগুলি খুব বেশি রকম প্রসারিত হয়ে থাকলে তা কখনোই গর্ভাবস্থার আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

এককালে অবশ্য লোকের ধারণা ছিল যে প্রসবের পর সদ্য-প্রসূতির পেট বেঁধে রাখলে পেটের পেশীগুলি দ্রুত দৃঢ় হয়ে ওঠে ও গর্ভ-সঞ্চারের আগেকার অবস্থায় ফিরে যায়। এখন খুব কম ধাত্রীবিৎই এতে বিশ্বাস করেন। এঁরা যে এইভাবে পেট বেঁধে রাখায় আপত্তি করেন তা নয়, বরং যাঁদের পেট একটু বেশি ঝুলে যায়, পেট বেঁধে রাখলে তাদের শরীরের গঠন অপেক্ষাকৃত ভালোই দেখায়। ধাত্রীবিৎরা শুধু মনে করেন যে বাইরে থেকে পেট বেঁধে রেখে পেটের পেশীগুলিকে ও দেহসৌষ্ঠবকে আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে পেটের পেশী গুটিয়ে ফের প্রায় আগেকার অবস্থা ধারণ করতে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন। যদি দেখা যায় যে এভাবে ফের আগেকার অবস্থা ফিরে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাহলে প্রসবের সময় থেকে এই তিন সপ্তাহ পেরোবার পর এ-উদ্দেশ্যে কিছু কিছু পেটের ব্যায়াম অভ্যাস করা যেতে পারে। তবে, মনে রাখবেন, উপরোক্ত তিন সপ্তাহের আগে এ-ধরনের ব্যায়াম অভ্যাস করতে গেলে তাতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। কেননা ইতিপূর্বেই অতিরিক্ত পরিমাণে প্রসারিত পেশীর ওপর এহেন জবরদস্তি ওই সব পেশীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না হওয়ারই কথা।

গর্ভসঞ্চারের আগে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রসূতির শরীরের পেশীসমূহ কতখানি পরিমাণে বিকশিত ও পরিণত হয়েছে তার ওপর সদ্য-প্রসূতির দেহসৌষ্ঠব বর্তমানে কতখানি আগের অবস্থা ফিরে পাবে তা বেশ খানিকটা নির্ভর করছে। যাই হোক, সদ্য-প্রসূতির পেটের পেশী দৃঢ় করে তোলার উপযোগী কয়েক প্রকার পেটের ব্যায়াম

ছবির সাহায্যে নিচে বোঝানো হল। নারীর দেহসৌষ্ঠবের উন্নতির উপযোগী এই সব ক-টি ব্যায়ামই কি সদ্য-প্রসূতি কি অন্যান্য মেয়ে সকলের পক্ষে সমানভাবে কার্যকরী।



সদ্য-প্রসূতিব উপযোগী তিন প্রকাব পেটের ব্যায়াম

১। সোজা চিত হয়ে শুযে পড়ুন। অতঃপর শবীবেব মাঝের অংশ এমনভাবে ওপবে তুলুন যাতে শেষপর্যন্ত আপনার শরীবের পুরো ভার ওপর দিকে মাথা থেকে কাঁধের পিছন দিক ও নিচে শুধুমাত্র দুই পায়ের পাতার ওপর থাকে।

২। সোজা চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। অতঃপব হাঁটু না-বেঁকিয়ে একটি পা ধীরে ধীবে খাড়া ওপর দিকে তুলুন। আবার ওই একই ভাবে পা-টি নামান। অতঃপর অন্য পা-টি ওই একই ভঙ্গিতে ওপব দিকে তুলুন ও নামান।

৩। সোজা চিত হয়ে শুযে পড়ে হাত দুটি ভেঙে বুকের ওপব আড়াআড়িভাবে যুক্ত কবে বাখুন। অতঃপব ওই অবস্থায় হাঁটু না-ভেঙে আস্তে আস্তে উঠে বসুন ও ফের শুয়ে পড়ুন।

প্রসবের পর প্রথম ডাক্তারি পরীক্ষা—প্রসবের পর কত তাড়াতাড়ি প্রথমবার প্রসূতির ডাক্তারি পরীক্ষা হওয়া উচিত তা নিয়ে ধাত্রী-বিৎদের মধ্যেও কিছুটা মতভেদ আছে। তবে সাধারণত ডাক্তাররা প্রসবের ছ-সপ্তাহ পরে প্রথমবার প্রসূতিকে পরীক্ষা করা পছন্দ

করেন। এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ প্রসূতির জরায়ুই আকারে ফের স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং রক্তমোক্ষণও প্রায়শ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক প্রসূতি মনে করেন যে প্রসবের পর যতদিন না আবার তাঁদের নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হচ্ছে ততদিন এই ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এঁদের মনে রাখা দরকার, এ-সময়ে নিয়মিত মাসিক স্রাব যে ঠিক কবে থেকে শুরু হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। অতএব মাসিক স্রাব শুরু না-হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার দেখাব না এমন সিদ্ধান্ত করে বসে থাকলে তাঁদের অনির্দিষ্টকাল অযথা অপেক্ষা করতে হতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা সব প্রসূতিই মনে রাখতে পারেন। যেমন, প্রসবের পর পাঁচ সপ্তাহেব মধ্যে যে-কোনো ধবনের রক্তস্রাবকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। কেননা, এত অল্প সময়ের ব্যবধানে স্বাভাবিক মাসিক ঋতুস্রাবেব পালা শুরু না হওয়াই সম্ভব। এছাড়া, যে-সমস্ত প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যদান করেন না তাঁদেব ক্ষেত্রে পূর্ণ-পরিণত শিশুর জন্ম দেওয়ার পর প্রথম মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হতে কমপক্ষে ছ-সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু সময়েব ব্যবধান দশ কিংবা বারো সপ্তাহ পর্যন্ত বেড়ে গেলেও তাকে মোটে অস্বাভাবিক বলে গণ্য করা চলে না। পরিশেষে, যে-সব প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যদান করে থাকেন তাঁদের প্রথম ঋতুস্রাব এর চেয়েও দেরিতে শুরু হয়। সাধারণত প্রসূতি যতদিন ধরে স্তন্যদান করে থাকেন ততদিন তাঁর শরীরে ডিম্বস্ফোটন ও ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। ফলে এই শেষোক্ত ধরনের কোনো কোনো প্রসূতির বেলায় প্রথম মাসিক স্রাব ছ-মাস এক বছর, এমন কি দেড় বছর পর্যন্তও বন্ধ থাকতে দেখা যায়।

প্রথম ডাক্তারি পরীক্ষার কথায় আসা যাক। এ-সময়ে ডাক্তারবাবু কী কী পরীক্ষা করবেন? স্বভাবতই, প্রথমে তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন, প্রসূতির ওজন কতটা বেড়েছে। অতঃপর তিনি প্রসূতির রক্তচাপ ও প্রস্রাবও পরীক্ষা করবেন। প্রয়োজন বোধ করলে তিনি প্রসূতির রক্ত পরীক্ষাও করতে পারেন। প্রসূতির শরীরে অতিরিক্ত

আয়রন ও ভিটামিন প্রয়োগের প্রয়োজন আছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্যেই এই শেষোক্ত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া ডাক্তারবাবু এ-সময়ে প্রসূতির আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা করে থাকেন—অর্থাৎ তিনি প্রসূতির জরায়ুর আকার ও অবস্থান, জরায়ু-মুখের অবস্থা ও যোনির চারিপাশের মাংসপেশীর দৃঢ়তা পরখ করে দেখেন।

প্রসূতির যোনিদেশের পেশী শিথিল দেখলে ডাক্তারবাবু তার প্রতিকারের জন্যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের ব্যায়াম করার পরামর্শ দিতে পারেন। ইচ্ছাকৃতভাবে পায়খানা চেপে রাখার সময় মানুষ যেভাবে মলদ্বারের পেশী সংকুচিত করে রাখে, এই ব্যায়ামের সাহায্যে প্রসূতিকেও সেইভাবে তাঁর মলদ্বারের পেশী-সংকোচন অভ্যাস করতে হয়। দিনের মধ্যে বহুবার এটি অভ্যাস করলে পর ক্রমে ক্রমে যোনি, মূত্রথলি ও মলদ্বারের চারিপাশের পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে।

প্রসবের সময় প্রায় ক্ষেত্রেই জরায়ু-মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকে। এমন কি স্বাভাবিক সুপ্রসবের বেলাতেও এর বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না। রাসায়নিক ও ইলেকট্রিক কটেরি— এর দু-ধরনের চিকিৎসাই প্রচলিত আছে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করালে কিন্তু পরে এ থেকে কষ্টদায়ক স্রাব শুরু হতে পারে।

স্বামী-সহবাস—প্রথমবার ডাক্তারি পরীক্ষার সময় প্রসূতির জরায়ু-মুখ কিংবা যোনিদেশে ক্ষত আবিষ্কৃত হলে এবং তাব জন্যে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে প্রসূতির পক্ষে স্বামী-সহবাস আরো কিছুদিন বন্ধ রাখার প্রয়োজন হতে পারে। তা না হলে এই প্রথম বারের ডাক্তারি পরীক্ষার পর থেকেই তিনি সব রকম স্বাভাবিক কাজকর্ম ও স্বামী-সহবাস শুরু করতে ও চালিয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ, প্রসবের পর কমপক্ষে অন্তত ছ-সপ্তাহ বাদ দিয়ে তারপর স্বামী-সহবাস শুরু করা কর্তব্য। যে-সব দম্পতি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের

পক্ষপাতী তাঁরা এই সময়েই ভবিষ্যৎ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন।

প্রথম প্রথম স্বামী-সহবাসের সময় অনেক সদ্য-প্রসূতি যোনিদেশে বেদনা অনুভব করে থাকেন। বিশেষ করে প্রসবের সময় যোনিদেশে কাটা-ছেঁড়া ও সেলাই হয়ে থাকলে এরকম হওয়া সম্ভব। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে সহবাসের সময় ভেসিলিন বা অন্য কোনো জেলিজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করলে অস্বস্তি দূর হতে পারে।

অল্প কিছু সংখ্যক প্রসূতি প্রসবের বেশ কয়েক মাস পরেও স্বামী-সহবাসের সময় অল্পবিস্তর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন। তবে এঁদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে এর কারণ যতটা না শারীরিক তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান-পালনের আনুষঙ্গিক দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তিবোধই এর একমাত্র কারণ হিসেবে দেখা যায়। এই দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তিবোধের দরুন প্রসূতি যৌন-সংসর্গে আনন্দ পান না এবং যৌন-উত্তেজনার অভাবে সহবাসও কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। প্রসূতির পক্ষে এই দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তিবোধ ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে ওঠা ছাড়া এর অন্য কোনো চিকিৎসা নেই।

পরবর্তী গর্ভ সম্পর্কে—প্রসূতি যতদিন না পুরোপুরি স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে উঠছেন ততদিন তাঁর পক্ষে মাঝে মাঝে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করানো উচিত। অতঃপর (পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার পর) তিনি জানতে চাইতে পারেন কত তাড়াতাড়ি তাঁর পক্ষে পরবর্তী গর্ভধারণ সম্ভব বা উচিত।

শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করলে বলা চলে, সাধারণ স্বাস্থ্যবতী মহিলার পক্ষে (অবশ্য যদি তাঁর অন্য কোনো অসুবিধা, অর্থাৎ আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য, বাড়িতে সাহায্যকারী লোকের অভাব ইত্যাদি না থাকে, তাহলে) এমন কি মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দুটি শিশুর জন্ম দেওয়া খুবই সম্ভব। এতে অন্তত ওই মহিলার স্বাস্থ্য বিপন্ন হবার সম্ভাবনা নেই।

তৃতীয় খণ্ড

শিশুপালন

এক | নতুন মায়ের প্রতি

সহজবুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস—শিশু ভালোয়-ভালোয় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। নবজাতক তার নিজের বাড়িতে এসেছে। আপনি এখন সন্তানের জননী। আজ আপনার মতো সুখী ও গর্বিত পৃথিবীতে আর কে? এখন আপনি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই নবজাত সন্তানকে ভালোভাবে লালনপালন করার মতো উপযুক্ত ধারণা বা শিক্ষা আপনার আছে কি? ধরা যাক, এই আপনার প্রথম সন্তান। এবং সন্তানপালনের বিশেষ কোনো ধারণা আপনার নেই। ফলে আপনার আত্মীয়স্বজন কিংবা প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব শিশুপালন সম্পর্কে ভালো-মন্দ যা কিছু উপদেশ দিচ্ছেন, তাই আপনি মন দিয়ে শুনছেন। তাছাড়া যে-হাসপাতালে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেখানকার ডাক্তারবাবু ও নার্সরা এ-সম্পর্কে যা-কিছু পরামর্শ আপনাকে দিয়েছেন তা তো আপনার মনে আছেই। কিন্তু চারিদিক থেকে এত উপদেশ শোনার ফলে সবকিছু আপনার গুলিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। হয়তো মনে হতে পারে শিশুপালন নিতান্তই ঝামেলার ব্যাপার, এত ঝামেলা পোয়ানো আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। যেমন, ধরুন, শিশুকে কী খাওয়াতে হবে, কখন খাওয়াতে হবে, কোন্ ভিটামিন শিশুর পক্ষে প্রয়োজন এ-সম্পর্কে হাজার রকম মতামত আপনার কানে আসবে। হয়তো দেখবেন তার একটার সঙ্গে আরেকটার মোটেই মিল নেই। আপনি হয়তো শুনবেন একজন বলছেন শিশুকে কোলে-করে রাখা বা ঘাঁটাঘাঁটি করা মোটেই উচিত নয়, অথচ আরেকজন বলছেন, তা না করলে শিশু পোষ মানবে কেন? একজন যদি বলেন শিশুর মুখে রবারের চুষি দেওয়া উচিত তো অন্যজন বলবেন ওই অভ্যাসটি ভীষণ

অনিষ্টকর। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আসল কথা হল, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কথাকে মূল্য দেবেন নিশ্চয়ই কিন্তু তা নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাবেন না। এমন কি ডাক্তারবাবুর মুখে শিশুপালনের জটিল ফিরিস্তি শুনেও ঘাবড়ানোর দরকার নেই। সবার ওপরে নিজের সহজ বুদ্ধিতে আস্থা রাখুন। নিজেকে বিশ্বাস করুন। ভয় না পেয়ে সমস্ত ব্যাপারটিকে যদি আপনি সহজ ভাবে নিতে পারেন এবং নিজের সহজাত বৃত্তির ওপর নির্ভর করে মোটামুটি আপনাব ডাক্তারবাবুর নির্দেশমতো চলবার চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন শিশুপালন আসলে মোটেই জটিল ব্যাপাব নয়। কেননা, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শিশুর খাবার ঠিকমতো তৈরি করতে পারা ও ঘড়ি ধরে খাওয়ানো কিংবা সময়মতো শিশুর কাঁথা বদলে দেওয়াব চেয়ে শিশুর প্রতি স্নেহশীল পিতামাতার স্বাভাবিক ভালোবাসা ও সেবা-যত্ন হাজার গুণে বেশি মূল্যবান। প্রথম প্রথম যত আনাড়ির মতোই হোক না কেন, মা যখন শিশুকে কোলে তুলে নেন, কাঁথা বদলে দেন, স্নান করান, খাওয়ান, কচি মুখখানিব দিকে তাকিয়ে হাসেন, তখনই শিশু তার অন্তরেব অন্তঃস্থলে বুঝতে পারে সে তাব মায়েব কত আদরের জিনিস এবং মায়ের মতো এমন আপন এ-পৃথিবীতে তাবও আর কেউ নেই। মা তাঁর শিশুকে যতখানি যত্ন করতে পারেন, শিশুপালন-বিদ্যায় আর কোন্ ধুরন্ধব শিশুর জন্যে ততখানি করতে সক্ষম ?

সত্যি কথা বলতে কি, শিশুপালন-বিদ্যায় যাঁরা সত্যিকারের ধুরন্ধর তাঁদের অভিমত এই যে পিতামাতা যদি স্নেহশীল হন তাহলে সহজাত প্রবৃত্তির বশে তাঁরা শিশুকে যেভাবে লালনপালন করবেন হাজার পুঁথি পড়েও তার চেয়ে ভালোভাবে শিশুপালন সম্ভব নয়। পরিশেষে, আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিই, নতুন মা স্বাভাবিক বুদ্ধি ও সহজ আত্মবিশ্বাস নিয়ে, অযথা দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে শিশুপালনে প্রবৃত্ত হোন। মনে রাখবেন এতে অল্পবিস্তর ভুলচুক হলেও ক্ষতি হবে না।

অপত্যস্নেহ—আপনার নবজাত শিশুকে ভালোবাসুন। শিশু ভালোবাসার কাঙাল। অনেক বিচক্ষণ সংসারী ব্যক্তি আপনাকে হয়তো বোঝাবেন যে আদর দিলে শিশু মাথায় ওঠে। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। বাপ-মায়ের 'মাথায় ওঠা'-র মতো কূটবুদ্ধি নিয়ে শিশু জন্মায় না। বরং বাপ-মায়ের বন্ধু ও বিবেচক ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতেই সে চায়। শিশুর প্রতি যদি সত্যিই আন্তবিক সদয় ব্যবহার করেন, তাহলে কোনোদিনই সে তাব সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে না বা পাল্টা অশিষ্ট আচরণ কববে না। অতএব আপনার শিশুকে ভালোবাসতে বা তাব প্রয়োজনেব সময় ডাকে সাড়া দিতে কিংবা সাহায্য কবতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবেন না। মায়ের একটু হাসি, একটু কথা, এক-আধটুকু আদব, মায়েব সঙ্গে খেলাধুলো—এ প্রত্যেকটি শিশুর শুধু কাম্যই নয়, প্রত্যেকটি শিশুব পক্ষে এ-সব একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন প্রয়োজনীয় তাব কাছে উপযুক্ত পুষ্টিকব খাদ্য ও ভিটামিন। প্রথম জীবনে যে বাপ-মায়েব আদর-ভালোবাসা পায় না, পরবর্তী জীবনে তাব পক্ষে হৃদয়হীন কঠিন মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠাই বেশি সম্ভব। শিশু কাঁদতে থাকলে কখনো তা উপেক্ষা কববেন না। জানবেন, নিশ্চয়ই তাব কোনো-না-কোনো যুক্তিসঙ্গত কাবণ আছে - হয় তাব খিদে পেয়েছে, নয় পেট কামড়াচ্ছে, নয় সে প্রস্রাব কবে বিছানা ভিজিয়েছে, আব নয়তো-বা এমনিই চটে উঠেছে ও চাইছে মা এসে তাকে ভোলান। আর তাই কেঁদে কেঁদে সে মা-কে ডাকছে। শিশু যখন কাঁদে তখন আপনিই-বা অস্বস্তি বোধ করেন কিংবা অস্থিব হয়ে ওঠেন কেন এবং তাকে ভোলানোব বাসনাই-বা আপনাব মনে জাগে কেন, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? এমনটি হয় এ-জন্যেই যে এইই হল প্রকৃতির বিধান। এ-সময়ে শিশুকে কোলে তুলে কিংবা দোলনায় শুইয়ে অল্প একটু দোলা দিলে সে শান্ত হয় এবং এতে তাব উপকারই করা হয়। মোট কথা, মনে কোনো অমূলক দুশ্চিন্তা না-পুষে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করুন, আপনার শিশুকে ভালোবাসুন।

অভ্যাস, শিক্ষাদীক্ষা, সহবত—আপনি অনেককে হয়তো বলতে শুনবেন যে শিশুকে একেবারে গোড়া থেকে কড়াকড়ি নিয়মে রেখে ঘড়ি ধরে খাওয়া, ঘুমোনো, পায়খানা করা ও অন্যান্য দৈনন্দিন কৃত্য অভ্যাস করানো দরকার। কিন্তু এ-কথায় খুব বেশি কান দেবার দরকার করে না। মনে রাখবেন, আপনার শিশু একটি জীবন্ত মানুষ, যন্ত্র নয়। ফলে, প্রথমত, শিশুকে বাঁধা নিয়মে চলা শেখানো খানিকটা সম্ভব হলেও কখনও তা পুরোপুরি শেখানো সম্ভব হয় না। আপনা থেকে শিশু যতটা শিখবে হাজার চেষ্টা করেও তাকে আপনি তার বেশি শেখাতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, খুব কড়াকড়ি নিয়মে রেখে জবরদস্তি শিশুকে চালাবার চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে রাগী ও খিটখিটে মেজাজের হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। প্রত্যেক বাপ-মাই চান তাঁদের সন্তান নিয়মিত স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ও মনুষ্যসমাজে বসবাসের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠুক। তেমনি প্রত্যেকটি শিশুও আবার উপযুক্ত সময়ে খাওয়া ও অন্যান্য দৈনন্দিন অভ্যাস নিজে থেকে আয়ত্ত করতে চায়। অর্থাৎ, খিদে পেলে আপনা থেকেই সে খেতে চায়, পায়খানার বেগ অনুভব করলে (অবশ্য তার পায়খানা যদি খুব কষা না হয়) আপনা থেকে পায়খানা করতে ও ঘুম পেলে ঘুমোতে চায়। এ-সমস্ত অভ্যাস শিশু আয়ত্ত করে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে, নিজের মনোমতো সময়ে। এ-সব বিষয়ে সে বাঁধাধরা নিয়ম বা তার মায়ের পছন্দমতো সময়-তালিকা মেনে চলতেও পারে, আবার নাও চলতে পারে। এ-ব্যাপারে গোড়া থেকেই জবরদস্তি করে লাভ নেই। বরং ক্রমশ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যেমন নিজের হাতে খাওয়াদাওয়া করতে ও পায়খানায় যেতে শিখবে, তেমনি তার নিজের পরিবারের আরো পাঁচটা নিয়মকানুন রপ্ত করতে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রচলিত সময়-তালিকা মেনে চলতেও অভ্যস্ত হবে। আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই; আপনার তরফ থেকে বিশেষ কোনো চেষ্টা ছাড়াই শিশু নিজেকে তার পরিবারের ধরনধারনের সঙ্গে ক্রমশ খাপ খাইয়ে নেবে।

ওই একই ভাবে শিশু তার বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা এবং ভদ্র ও নম্র আচরণও অভ্যাস করবে। এ-সমস্ত সদ্‌গুণ বাইরে থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে খুব কম শিশুরই চরিত্রে অর্শানো সম্ভব হয়। বরং যারা স্নেহশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাপ-মার তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়, তারা আপনা থেকেই সংসারের আরো পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিলে-মিশে খাপ খাইয়ে চলার সহজাত প্রবৃত্তির বশেই, ক্রমশ ওই সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে ওঠে।

এত কথা বলার অর্থ এই যে আপনার শিশুকে স্বাস্থ্যবান, সুশীল-সুবোধ বালক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে মরি-বাঁচি করে কোমর বাঁধার প্রয়োজন নেই। তাতে বিশেষ কোনো লাভও হবে না। বরং যে-সব বাপ-মা সহজ আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সরলতা ও স্নেহশীলতার সঙ্গে শিশুপালনে প্রবৃত্ত হবেন, সবচেয়ে স্বল্প চেষ্টায় সবচেয়ে ভালো ফল লাভ করবেন তাঁরাই।

শিশুর তত্ত্বাবধান—অধিকাংশ প্রথম প্রসূতি গোড়ার দিকে শিশুকে নাড়াচাড়া করতে ভয় পান। পাছে তাঁদের কোনো অসাবধানতার ফলে শিশু ব্যথা পায়, এই তাঁদের দুশ্চিন্তা। কিন্তু তাঁরা জেনে রাখুন, শিশুকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অস্বাভাবিক ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, তাঁদের শিশুরা রীতিমতো শক্তসমর্থ জীব। এখানে অবশ্য নিতান্ত অপুষ্ট ও অপরিণত শিশুদের কথা বাদ দিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। একটি স্বাভাবিক পরিণত শিশুকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এক-আধটুকু ভুলভ্রান্তি ঘটলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। শিশুকে তুলতে গিয়ে তার মাথাটি কয়েক মুহূর্ত নিচের দিকে ঝুলে পড়লে তাতে শিশুর ব্যথা লাগে না। তার মাথার চাঁদিতে যে নরম তুলতুলে জায়গাটি আছে সেটি নরম হলেও সেখানকার চামড়ার আবরণ এতটা ঘাতসহ যে সহজে তা ফেঁসে যায় না। শিশুর ওজন বেড়ে ৭ পাউণ্ডের মতো হলেই এবং প্রাকৃতিক শীতাতপ থেকে তাকে রক্ষার উপযোগী সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ

করলে, তারই শরীরের অভ্যন্তরে তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি রীতিমতো ঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করে। তাছাড়া শিশুর রোগ-জীবাণু প্রতিরোধের শক্তিও রীতিমতো থাকে। হয়তো দেখবেন সারা পরিবারের লোক যখন প্রবল সর্দিকাশিতে ভুগছেন তখন শিশুর সর্দিকাশি সবচেয়ে কম। পরিশেষে, শিশুর আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির কথা তো সকলেই জানেন? প্রসূতিরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে শিশুর মাথা কাঁথা বা অন্য কোনো কাপড়ে জড়িয়ে গেলে মাথা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সে প্রাণপণে লড়াই করে ও চেঁচায়। যদি সে যথেষ্ট পবিমাণে খেতে না পায় তাহলে আরো খাওয়ার জন্যে কাঁদে। ঘরের আলো যদি তার চোখের পক্ষে বেশি কড়া হয় তো সে চোখ-পিটপিট করে ও ছটফট করতে থাকে। শিশু জানে তার পক্ষে ঠিক কতক্ষণ ঘুম দরকার আর ঠিক ততক্ষণ সে ঘুমোয়। মনে রাখবেন, আপনার শিশু দুনিয়াব হালচাল কিছুই বোঝে না কিংবা একটিও কথা বলতে পারে না বটে, কিন্তু সে-তুলনায় খুবই ভালোভাবে সে আত্মরক্ষা করতে ও নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে জানে।

শিশুর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপত্যস্নেহ—আপনার শিশু দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে যেমন তাকে অবিকল তেমনিভাবে মেনে নিন ও ভালোবাসুন। তাহলেই তার পক্ষে যতদূর সম্ভব ভালোভাবে বেড়ে ওঠা সম্ভব হবে। আপনাব হাতের পাঁচটি আঙুল যেমন একটি অপরটির থেকে আলাদা, পৃথিবীতে তেমনি প্রত্যেক শিশু অপর শিশুর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রত্যেক দুটি শিশুর মুখ চোখ ও দেহের গঠন যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি তাদের ক্রমবিকাশের পদ্ধতিও পরস্পরের থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। প্রত্যেকটি শিশুর এই ক্রমবিকাশের ধরন যে কত বিচিত্র, আলোচনা করলে আশ্চর্য হতে হয়। যেমন, ধরুন, একটি শিশু হয়তো শারীরিক শক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সামঞ্জস্য-বিধানের বিচারে খুবই উন্নতশ্রেণীর, খুব অল্প সময়ের মধ্যে

সে উঠে বসতে, দাঁড়াতে ও হাঁটতে শিখেছে—অর্থাৎ, এক কথায়, তাকে একটি ক্ষুদে পালোয়ান বলা যেতে পারে। অথচ ওই একই শিশু হয়তো হাত দিয়ে কোনো জিনিস ঠিকমতো ও সাবধানে চেপে ধরতে পারছে না, কিংবা তার মুখে কথা ফুটতে একটু বেশি দেরি হচ্ছে। আবার এও দেখা যায়, কোনো বাচ্চা বিছানায় গড়াতে, হামাগুড়ি দিতে কিংবা দাঁড়াতে রীতিমতো পটু, অথচ তার হাঁটা শিখতে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটছে। এইরকম যে-শিশু শারীরিক সামর্থ্যের বিচারে রীতিমতো বলিষ্ঠ তার হয়তো দাঁত উঠতে দেরি হয় ও দাঁত ওঠার সময় ভোগায়। আবার এর উল্টোটাও (অর্থাৎ নিতান্ত ক্ষীণজীবী শিশুর যথাসময়ে ও প্রায় বিনা কষ্টেই দাঁত ওঠা) হামেশা দেখা যায়। এমনি, যে-শিশু পববর্তী জীবনে স্কুলের ভালো ছাত্র হিসেবে নাম কিনবে, প্রথম জীবনে তার মুখে কথা ফুটতেই হয়তো এত দেরি হল যে তাব বাপ-মা ভয় পেয়ে গেলেন শিশু পাছে বোবা বা জড়বুদ্ধি হয় ভেবে। উল্টোদিকে, অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধির শিশুও কখনো-কখনো সময়েব আগেই কথা বলতে শেখে।

এখানে বিশেষ কবে যে-সমস্ত শিশুব বাড় বা ক্রমবিকাশ মিশ্র ও জটিল ধরনের, তাদেব নিয়েই আলোচনা করা হল। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কত বিচিত্ররকম গুণাগুণের সমাবেশ ঘটে থাকে এবং তার বিকাশের ধরন কত জটিল হয় শিশুব বাপ-মায়েরা এ-থেকেই তা আন্দাজ করতে পারবেন আশা করি।

তাছাড়া প্রত্যেক তুটি শিশুর মধ্যেও কতই-না পার্থক্য। একজন হয়তো জন্মই নেয় লম্বা-চওড়া মোটাসোটা গড়ন নিয়ে, আব অন্যজন আসে চিরকালেব মতো ছোটখাট ছিপছিপে বা নেহাতই ক্ষীণজীবী চেহারার অধিকারী হয়ে। একেকটি সদ্যোজাত শিশুর যেন মোটা হবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। অসুখে ভুগে যতই কাহিল হয়ে পড়ুক না কেন, এ-ধরনের শিশু সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফের গোলগাল হয়ে ওঠে। আবার এর উল্টো ধরনেব শিশুও কিছু তুর্লভ নয় যারা সব সময়েই রোগা, এমন কি তোফা আরামে থেকে ও

সেরা পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে সারা জীবন রোগা থেকে যায় এমন লোকও সংসারে যথেষ্ট মেলে।

অতএব সেই আগের কথায় ফিরে গিয়ে বলতে হয়, সদ্যোজাত সন্তান আকৃতি ও প্রকৃতিতে ঠিক যেমনটি হবে নতুন বাপ-মা তাকে যেন তেমনিভাবেই মেনে নেন ও ভালোবাসেন।—'বাচ্চার অমুক-অমুক গুণ নেই কেন' কিংবা 'অমুকের বাচ্চার মতো দেখতে হলে কত ভালো হত' এমনি ধরনের অবাস্তব চিন্তা তাঁরা যেন মন থেকে মুছে ফেলেন। মনে রাখবেন, এ-উপদেশ শুধুমাত্র বাপ-মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে নয়, নিছক স্নেহমমতার কথাও এ নয়। এ-পরামর্শের পেছনে একটি অতি গুরুতর বাস্তব কারণও বর্তমান। শিশু ঠিক যেমন তাকে সেইভাবে মেনে নিলে ও তার সদ্‌গুণের যেটুকু রেশ দেখতে পাওয়া যায় উপযুক্ত মুহূর্তে তার তারিফ করলে সে-শিশুব আনন্দময় হয়ে ও প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা। এবং নিছক এই আত্মশক্তির জোরে এ-ধরনের শিশু তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে কিংবা সে-ক্ষমতার এবং জীবনে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। এমন কি যদি কোনো শিশু নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে—যদি সে একটু বেশিরকম ঘরকুনো, কাজকর্মে অপটু ও মন্থরগতি হয়—বাপ-মায়ের স্নেহমমতা ও প্রশংসার ভাগ পেলে সেও তার জড়তা ও ত্রুটি অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পারে। উল্টোদিকে যে-শিশুকে তার বাপ-মা কোনোদিনই পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি, যার ত্রুটিবিচ্যুতি বাপ-মায়ের চোখে বরাবর বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, নিরন্তর সমালোচনা ও ধমকের মধ্যে থেকে যে-শিশু বড়ো হয়ে উঠল, তার মনে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিতে বাধ্য। এ-ধরনের শিশু কখনই তার বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা কর্মক্ষমতার পুরো সদ্ব্যবহার করে উঠতে পারবে না। বরং শারীরিক কিংবা মানসিক যে-ধরনের ত্রুটি নিয়ে সে জীবন আরম্ভ করবে পূর্ণ পরিণত হয়ে ওঠার সময়ে-সময়ে তা নির্ঘাত দশগুণ বৃদ্ধি পাবে।

তবে এ-হল সাধারণ নিয়মের কথা। কচিৎ-কখনো অবশ্য এমন শিশুরও সাক্ষাৎ মেলে যার বাড় বা বিকাশ স্বভাবতই মন্থরগতি। যে-বয়সে অন্যান্য শিশুরা ঘাড় শক্ত করে মাথা তোলে, কিংবা অন্য কারো ডাকে সাড়া দেয়, কিংবা নিজেদের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, ওই প্রথমোক্ত ধরনের শিশুরা সে-বয়সে হয়তো এ-সবের কিছুই প্রায় করতে পারে না। তা সত্ত্বেও এ-ধরনের শিশুর বাপ-মা কি পরম দার্শনিকের মতো নির্বিকারচিত্তে সন্তানকে মেনে নিতে ও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? তাঁদের কাছে এতটা আশা করা অবশ্য একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এই ধরনের শিশুদের মধ্যে কারো কারো বিকাশ অনেক সময় অপুষ্টি কিংবা অন্য কোনো শিশু-রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুনও বিলম্বিত হয়ে থাকে। সময় থাকতে রোগের সূচনাতে চিকিৎসা শুরু করলে এ-সব ক্ষেত্রে সুফল ফলতে পারে। এই কারণেই সদ্যোজাত শিশুকে নিয়মিতভাবে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানোর ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া, যে-সমস্ত শিশুর বিকাশ বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া আপনা থেকেই মন্থর, তাদেব বাপ মায়েদের অবশ্য শেষপর্যন্ত ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া বোধহয় উপায়ান্তর থাকে না। মনে রাখবেন, রাতারাতি এই সব শিশুর শারীরিক-মানসিক উন্নতি ঘটানোর কোনো আলাদীনের প্রদীপ কারো হাতে নেই।

দুই | প্রস্তুতিপর্ব

শিশুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও পোশাকপরিচ্ছদ

এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা সন্তান-প্রসবের পরই প্রসূতির আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব এবং হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা প্রসূতিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে, বাড়িতে হাতে-কলমে ব্যবস্থা করে দিয়ে, কেনাকাটায় কিংবা সেলাই-ফোঁড়াই ও বোনায় সাহায্য করে এবং পরিশেষে অল্পবিস্তর উপহার দিয়ে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। এখানে তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু-চারটি ব্যাপার নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে।

শিশুর খাট-বিছানা—যাঁদের সঙ্গতি আছে তাঁরা শিশুর জন্যে আলাদা ছোট খাট কিনে বা করিয়ে নিতে পারেন। প্রয়োজন-মতো এই খাটকে দোলানোর ব্যবস্থাও করিয়ে নেওয়া যায়। এতে একই সঙ্গে খাট ও দোলনা উভয়ের অভাব মিটবে। তবে এই খাটটি লম্বায়-চওড়ায় একেবারে নবজাত শিশুর মাপে-মাপে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এছাড়া খাটের চার দিকের কানা বা রেলিঙও উঁচু হওয়া চাই। কেননা, শিশু সাধারণত একাধিক বছর এই খাট ব্যবহার করবে এবং জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই শিশু প্রথম এপাশ থেকে ওপাশে গড়াতে, উবুড় হতে ও পরে হামা দিতে ও তারও পরে কোনো কিছু ধরে দাঁড়াতে শিখবে। কাজেই শিশুর যখন উপরোক্ত খাটের রেলিঙ ধরে দাঁড়াবার বয়স হবে তখন যাতে টপকে সে নিচে না পড়ে যায় সেজন্যে খাটের চারিধারের রেলিঙ অন্তত এক হাত উঁচু হলে ভালো হয়। এছাড়া খাটটি মেঝে থেকেও উঁচু হওয়াও দরকার। এতে মায়ের পক্ষে মেঝের ওপর সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে শিশুর কাঁথা বদলে দেওয়া বা অন্য নানারকম সেবা-যত্ন করারও সুবিধা হবে।

শিশুর জন্যে আলাদা খাট কেনা বা করিয়ে নেওয়ার মতো অতটা সঙ্গতি যাঁদের নেই, তাঁরা অন্ততপক্ষে বেতের তৈরি দোলনার ব্যবস্থা কবতে পারেন। এতে শিশুকে প্রয়োজনমতো দোলা দিয়ে শান্ত করার বিশেষ সুবিধাও পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, দোলনারও চার পাশের কানা উঁচু থাকে, তবে বাজারে যে-সমস্ত কমদামী বেতের দোলনা সাধাবণত কিনতে পাওয়া যায় শিশুব বয়স চার কিংবা পাঁচ মাস হয়ে গেলে সেগুলি আর ব্যবহার করা যায় না। এই দোলনা খাটের ওপর কিংবা মেঝেয় রেখে শিশুর বিশেষ খাট হিসেবেও ব্যবহার করা চলে।

কিন্তু যাদেব কাছে শিশুব জন্যে দোলনা কেনাটাও ব্যয়বাহুল্য বলে মনে হবে, তাঁবা চওড়া ও নিচু খাট বা তক্তপোশের মাঝখানে কিংবা ঘরেব মেঝে পরিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন হলে ও স্যাঁতসেতে ভাব না থাকলে সবাসবি মেঝেতেই বিছানা কবে শিশুকে শোয়াতে পারেন। তবে শিশুব গড়াবাব বয়স হলে এবং খাট বা তক্তপোশের চারিধারে বেলিঙ বা ঐ ধবনেব কিছু না থাকলে তাকে মেঝের ওপর বিছানা কবে শোয়ানোব ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুকে নিয়ে বাড়ির বাইবে বেড়ানোর জন্যে যাবা পেবাম্বুলেটর বা ঠেলাগাড়ি কিনবেন, তাঁদেব বেশ দেখেশুনে গাড়িটি কেনা দরকাব। তাঁদেব দেখা প্রয়োজন, গাড়িটি যেন সহজে সোজা সামনেব দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়। এ-ধবনেব গাড়ির চাকাগুলি খুব ছোট হলে মোড় ফেরানোব অসুবিধা হয়, আবাব খুব বড়ো হলেও গাড়িটি চট কবে উল্টে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

এরপর শিশুর বিছানা সম্পর্কে। শিশুর বিছানার নিচে যদি গদি দেওয়া হয়, তাহলে সে-গদি যেমন খুব বেশি শক্ত হবে না, তেমনি তা খুব বেশি নরম হলেও চলবে না। কেননা এর ফলে শিশুর শরীরের গঠন খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গদির অভাবে পুরনো কম্বল

ভাঁজ করে মেঝেয় পেতে তার ওপর তুলোর-তৈরি ছোট তোষক বিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে শিশুকে কখনো নরম বালিশের ওপর (অর্থাৎ বালিশটাকেই গদি হিসেবে ব্যবহার করে) শোয়ানো উচিত নয়। তাতে শিশুর পিঠ বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

শিশুর গদি বা তোষকেব ওপর সারা বিছানা-জোড়া বেশ বড়ো একখণ্ড ওয়াটাবপ্রুফ চাদর বা অয়েলক্লথ ব্যবহাব কবা কর্তব্য। বাড়িতে অন্তত দু-খানা অয়েলক্লথ মজুত থাকা ভালো। এর ফলে একখানা অয়েলক্লথ কেচে শুকোতে দিলে মাঝে মাঝে দ্বিতীয়খানা ব্যবহার করা চলবে।

অয়েলক্লথেব ওপব, বিশেষ কবে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গবমের সময় তো বটেই, সুতী কাপড়ের কাঁথা ব্যবহাব কবা উচিত। এই কাঁথাগুলিও বিছানা-জোড়া হলে ভালো হয়। একসঙ্গে অন্তত পক্ষে তিন থেকে ছ-খানা কাঁথা মজুত থাকা দবকাব। অবশ্য শিশু কত ঘনঘন প্রস্রাব কববে ও দুধ তুলবে তাব ওপর এই কাঁথা মজুত রাখার সংখ্যা নির্ভর করে।

নবজাত শিশুব মাথায় বালিশ দেবাব দবকাব কবে না। কাজেই অপ্রয়োজনে বালিশ না দেওয়াই ভালো। তবে শিশুব দু-পাশে দুটি ছোট পাশবালিশ ব্যবহাব কবা মন্দ নয়।

শীতকালে শিশুর গায়ে গরম কাপড় ঢাকা দেওয়া যেতে পাবে। যদি কম্বল দিয়ে ঢাকতে চান, তাহলে খুব হালকা কম্বল ব্যবহাব কবা বিধেয়। সবচেয়ে ভালো হয় যদি পশমী পাতলা আলোয়ান কিংবা বড়ো এক টুকরো ফ্লানেল-কাপড় ব্যবহাব কবেন। সাধাবণত ওপরের এই ঢাকাটি দিয়ে শিশুকে ভালো করে মুড়ে বাখতে হয়, তা না হলে লাথি দিয়ে শিশু গায়ের ঢাকা ফেলে দেয়।

পরিশেষে শিশুর বিছানার উপযোগী ছোট একটি মশাবীও প্রয়োজন।

শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ—শিশুব গায়েব জামা যথাসম্ভব ঢিলে বা লম্বায়-চওড়ায় বড়ো হওয়া দরকার। শীতকাল ছাড়া অন্যান্য সময়ের

জামা শুধু সুতী কাপড়ের হলেই চলবে। এমন কি, শীতকালেও গরম জামার নিচে সুতী জামা ব্যবহার করা কর্তব্য। জামার কাপড় খুব পাতলা ও মোলায়েম হলে ভালো হয়। তা না হলে গরমের দিনে অনবরত ঘষা লেগে ঘামাচি ও ঘামাচি থেকে ঘা হবার সম্ভাবনা থাকে।

শিশুর পরনের কাপড় বলতে কিছু নেই। তা ছাড়া এত ছোট অবস্থায় শিশুকে ইজের বা ওই ধরনের কোনো কিছু পরানোরও মানে হয় না। কেননা তাহলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইজের বদলানোর দরকার হবে। তবে কোনো প্রসূতি যদি শিশুকে শুধু জামা পরা অবস্থায় রাখতে না চান কিংবা শিশুকে নিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে চান তাহলে গজ-কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো ঘরে মজুত রাখতে পারেন। ঐ টুকরোগুলি আড়াআড়িভাবে লেঙটের মতো করে শিশুর কোমরে আলগাভাবে বেঁধে দেওয়া চলে। তবে এ-জিনিস নিয়মিত ব্যবহার করতে হলে একসঙ্গে একাধিক ডজন কাপড় কিনে রাখতে হবে এবং রোজ এগুলি কেচে শুকিয়ে নিতে হবে।

শীতকালে শিশুর সুতী জামার ওপর পশমের কোট ব্যবহার করতে বাধা নেই। তবে এ-রকম গরম জামা খুব ঢিলেঢালা, বড়সড় হওয়া আবশ্যক। শিশুর জামা, তা সে সুতীরই হোক কিংবা পশমেরই হোক, দেহের মাপের চাইতে ছোট কিংবা আঁটসাট হওয়ার চেয়ে বেশ খানিকটা বড়ো হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে এত ছোট শিশুকে মাথা-গলানো জামা, যথা সোয়েটার, না পরালেই ভালো হয়। সোয়েটার পরাতে হলে শিশুর মাথা যাতে তার গলার ফাঁদের মধ্যে দিয়ে সহজেই গলে যায় তা দেখে কেনা বা তৈরি করানো দরকার। এছাড়া, শীতের দিনে শিশুকে নিয়ে বাইরে বেরোতে হলে তার মাথায় নরম পশমের টুপি ও পায়ে মোজা পরাতে পারেন। তবে আমাদের এই গরম দেশে, এমন কি শীতকালেও, ঘরের মধ্যে থাকলে শিশুর মাথায় টুপি ও পায়ে মোজা পরাবার দরকার হয় না। এদেশে এগুলি যত না প্রয়োজনীয়, তার চেয়ে অনেক বেশি শোভাবর্ধক।

পরিশেষে, শিশু ঘনঘন মুখ দিয়ে দুধ তোলে বা বমি করে বলে তার গলায় মোটা কাপড়ের বা গজ-কাপড়ের টুকরো কিংবা দোকান থেকে কিনে বিব্ বেঁধে রাখতে পারেন। এতে বারে বারে শিশুর জামা ভিজে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এ ধরনের কাপড়েব টুকবো বা বিব্ ঘবে অন্তত আধ ডজন মজুত রাখতে পারলে ভালো হয়।

ফিডিং বট্ল ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিস—প্রসূতিব পক্ষে কোনো কাবণে যদি শিশুকে স্তন্যদান কবা সম্ভব না হয তাহলে অন্য উপায়ে শিশুকে খাওয়ানোব জন্যে এই সমযেই দুধ-খাওয়ানোর বোতল বা ফিডিং বট্ল কিনতে হবে। ইওবোপ ও আমেবিকায় প্রসূতিবা এ-উদ্দেশ্যে একসঙ্গে অন্ততপক্ষে আধ ডজন বোতল কিনে থাকেন। একসঙ্গে এতগুলি বোতল কেনাব উদ্দেশ্য, সাবাদিন বাবে বাবে একটি বোতল ধুযে মুছে সাফ কবে ব্যবহাব কবাব ঝামেলা ও খাটুনি এডানো। ওদেশে বাবে বাবে বোতল বিশোধন কবে জীবাণু মুক্ত কবে নেওয়াবও ব্যবস্থা আছে এবং এ-কাজটা বিশোধক পাত্রের মধ্যে বোতল পুবে দিযে কবতে হয। আমাদেব গবিব দেশে অবশ্য খুব কম প্রসূতিব পক্ষে শিশুব জন্যে এমন এলাহি ব্যবস্থা কবা সম্ভব হয়। কাজেই অধিকাংশ প্রসূতিই একটি কি বডো জোব দুটি বোতলে কাজ চালান। ফিডিং বট্ল নানা ধবনেব হয়ে থাকে। আমাদের গৃহস্থবাড়িতে বহুকাল ধবে যে-বোতল ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার আকার অনেকটা পেটমোটা নৌকোর মতো ও তাব দুই মুখ খোলা। এছাড়া বাজাবে এক মুখ-খোলা সাধারণ বোতলেব মতোই গোল কিংবা আট-কোনা বোতলও মেলে। নানা কাবণে এই শেষোক্ত ধরনের বোতলই অপেক্ষাকৃত ভালো বলে গণ্য হয়। এই সব বোতল চার আউন্স কিংবা আট আউন্স নানা মাপেব আছে। প্রসূতিকে তাঁর ডাক্তাববাবুর পরামর্শমতো ও পছন্দসই ফিডিং বট্ল কিনতে হবে। একসঙ্গে দুটি বোতল কিনে ব্যবহার করলেই ভালো হয়।

অতঃপর প্রসূতিকে ওই ফিডিং বট্‌ল দুটির মুখের রবারের চুষি কিনতে হবে। মোটের ওপর মাঝারি সাইজের রবারের চুষি কিনলেই চলবে। গোটা দুই-চার বাড়তি চুষি কিনে রাখাও মন্দ নয়। সেই সঙ্গে ফিডিং বট্‌ল ও রবারের চুষি পরিষ্কার করার বুরুশও কেনা দরকার। পরিশেষে ফিডিং বট্‌লে দুধের মাপ-নির্ণয়সূচক দাগ না থাকলে দুধের পরিমাণ মাপার জন্যে একটি মেজার গ্লাসের দরকার হবে।

এছাড়া শিশুর নিত্যব্যবহার্য আরো কিছু কিছু টুকিটাকি জিনিস কেনা প্রয়োজন। যেমন, দুধ তৈরি ইত্যাদির জন্যে অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি বা ডেকচি, স্যসপ্যান, ছাঁকনি, কাচের ফানেল বা চোঙা ইত্যাদি; স্নানের জন্যে এনামেল-করা কিংবা অভাব-পক্ষে একটি টিনের গামলা বা টব এবং মগ; শিশুর গায়ে চুলকানি বেরোলে চামড়ায় লাগানোর জন্যে জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট বা মলম; এছাড়া শিশুর ব্যবহারের উপযোগী পাউডার, ক্রীম, সাবান, তুলো, কডলিভার অয়েল বা ভিটামিন ডি-যুক্ত অন্য কোনো তেল, ইত্যাদি।

সাহায্যকারী ও চিকিৎসক নির্বাচন

সাহায্যকারী—নবজাত শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহের জন্যে সংসারের কাজে ও শিশুকে দেখাশোনার উদ্দেশ্যে প্রসূতি যদি কোনো আত্মীয়াকে পান কিংবা কোনো লোক রাখতে পারেন তো খুব ভালো হয়। কেননা নিজে একা সব কিছু করার চেষ্টা করলে এ-সময়ে ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ার খুবই সম্ভাবনা। আর অসুস্থ হয়ে পড়লে বাধ্য হয়েই তখন সাহায্যকারী রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্ভবত দীর্ঘদিন সে-ব্যবস্থা বহালও রাখতে হবে। অর্থাৎ, পয়সা খরচ ও ঝামেলার মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া এ-সময়ে অসুস্থ হয়ে প্রসূতির শরীর ভেঙে পড়লে মা ও শিশু উভয়কেই রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

সাহায্যকারী হিসেবে প্রসূতি তাঁর নিজের মা কিংবা শাশুড়ীকে

পেলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ এ-সময়ে শিশুপালনে অভিজ্ঞ এই ধরনের মহিলার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি অনুভব করা যায়। অভাব-পক্ষে, শিশুপালনে অভিজ্ঞ ধাই বা ঝি হলেও মোটামুটি কাজ চলতে পারে। এছাড়া যে-প্রসূতি শিশুপালনের দায়িত্ব পুরোপুরি নিজের হাতে রাখতে চান তাঁর পক্ষে সংসারের কাজ দেখাশোনার জন্যে লোক রাখাই প্রশস্ত। এতে তিনি পুরো সময় শিশুর তদারকির পেছনে ব্যয় করতে পারেন। আবার সংসারের ভার পুরোপুরি মাইনে-করা লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব না হলে তিনি দেখে-শুনে এমন স্ত্রীলোক সাহায্যকারী জোগাড় করে নিতে পারেন যার সঙ্গে সংসারের কাজ ও শিশুপালন দুইই ভাগাভাগি করে নেওয়া সম্ভব।

প্রসূতির পক্ষে ঠিক কতদিনের জন্যে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন তা এক কথায় বলা শক্ত। ক্ষেত্রবিশেষে, অর্থাৎ প্রসূতির আর্থিক অবস্থা, তাঁর কাজকর্মের প্রবৃত্তি ও শারীরিক সামর্থ্যভেদে, এর তারতম্য ঘটে থাকে। সাধারণত, প্রসবের পর দিনে দিনে যেমন প্রসূতির শারীরিক সামর্থ্য বাড়তে থাকে, তেমনি বেশি-বেশি তিনি কাজের ভার নিতে থাকেন। এইভাবে চলতে গিয়ে সপ্তাহ তিনেক পরেও যদি তিনি দেখেন যে কাজ করতে গিয়ে তখনও সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, তাহলে তাঁর পক্ষে আরো কিছুদিন সাহায্য-কারী বহাল রাখাই উচিত হবে। আর্থিক অনটন থাকলেও এরকম ক্ষেত্রে শরীরের বিশ্রামের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা অন্যায় হবে। মনে রাখবেন, এ-সময়ে সাহায্যকারী নিয়োগ করা বিলাসিতা নয়, একান্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার। শরীর যথেষ্ট সুস্থ ও শক্তসমর্থ হয়ে ওঠার আগেই সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম শুরু করলে শেষপর্যন্ত সেজন্যে আর্থিক ও শারীরিক-মানসিক এই উভয় দিক থেকেই যে-মূল্য দিতে হতে পারে তার পরিমাণ সাহায্যকারী নিয়োগের খরচের চেয়ে অনেক বেশি হবার সম্ভাবনা।

অধিকাংশ সদ্য-প্রসূতিই প্রথম মা হবার পর নবজাত শিশুর

পুরো দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে ভয় পান। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম মাকে শিশুপালনে অভিজ্ঞ আত্মীয়া বা মাইনে-করা ধাত্রীর সাহায্য নিতে হবে এবং তাঁর নিজের সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করলে শিশুপালনে বিঘ্ন ঘটবেই। তবে প্রথম মা-র এই আত্মবিশ্বাসের অভাব যদি সত্যিই গুরুতর কিছু হয় তাহলে উপরোক্ত কোনো-না-কোনো ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করাই ভালো। এমন কি দীর্ঘদিনের জন্যে সর্বক্ষণের সাহায্যকারী না পেলেও অন্তত প্রথম দিকে কয়েক সপ্তাহের জন্যে একজন অভিজ্ঞ আংশিক সময়ের সাহায্যকারী নিয়োগ করে তার কাছ থেকে শিশুকে স্নান করানো, স্তন্যপান করানো, কিংবা বোতলের দুধ খাওয়ানো ইত্যাদির প্রক্রিয়া শিখে দেওয়া ভালো।

চিকিৎসক-নির্বাচন—নবজাত শিশু যে ভালো আছে এবং ঠিকমতো বেড়ে উঠছে তা বোঝার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হল তাকে নিয়মিত ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো পন্থা হল, জন্মের পর গোড়ার কয়েক মাস মাসে একবার করে এবং তার পর থেকে শিশুর বছর দুই বয়স পর্যন্ত প্রতি তিন মাসে একবার করে তাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো। এই সব পরীক্ষার সময় ডাক্তারবাবু প্রতিবার শিশুর ওজন নিয়ে দেখেন সে নিয়মমাফিক বাড়ছে কিনা; তাছাড়া তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিকমতো বিকশিত হচ্ছে কিনা, শরীরে রিকেট্স বা অন্য কোনো পুষ্টির অভাবজনিত ব্যাধি দেখা দিচ্ছে কিনা, ইত্যাদি সব কিছুই তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। এছাড়া, শিশুকে খাওয়ানো—বিশেষ করে বোতলের দুধ খাওয়ানো, খাওয়ার সময় পরিবর্তন, পায়খানা পরিষ্কার হওয়া, আঙুল-চোষা ও অন্য নানাবিধ বদভ্যাস দূর করা ইত্যাদি হাজারো সমস্যার সমাধানের জন্যে শিশুর ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এইভাবে কয়েক মাস তাকে পরীক্ষা করার পর এবং সময় উপস্থিত হলে ডাক্তারবাবু তাকে প্রথমে

বসন্তের ও তারও কিছুকাল পরে অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক টিকা দিয়ে দেন। এই সব পরীক্ষার সময়ে প্রসূতিও নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে শিশুপালন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য নানাবিষয় জেনে নিতে পারেন।

অতএব শিশুকে নিয়মিত ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অবশ্য নিয়মিত ডাক্তার না-দেখালে যে প্রতিটি শিশুকে নিয়েই বিপদে পড়তে হয় তা নয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে-সমস্ত শিশু মাঝে-মাঝে কিংবা প্রায়ই অসুখে ভুগে থাকে তাদের ক্ষেত্রে স্বভাবতই এটি একটি অবশ্য-করণীয় কর্তব্য। এছাড়া অন্যদের বেলা এটি সাধারণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তবে আমাদের দেশে অধিকাংশ সদ্য-প্রসূতি তাঁদের শিশুসহ ডাক্তার ও হাসপাতালের সংস্পর্শ থেকে এত দূরে বাস করেন যে তাঁদের অনেকের পক্ষেই নিয়মিত কেন ছ-মাসে একবারও ডাক্তার দিয়ে শিশুকে পরীক্ষা করানো সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ।

শিশুকে কোন্ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো প্রশস্ত ?—এ-সম্পর্কে ধরা-বাঁধা কোনো নিয়ম বলে দেওয়া সম্ভব নয়। শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ, এবং বিশেষজ্ঞ না হলেও অভিজ্ঞ গৃহ-চিকিৎসক—এই দুই ধরনের ডাক্তারের সাহায্যে এবং প্রসূতিসদন, নার্সিং হোম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন শিশু-চিকিৎসাবিভাগে শিশুকে নিয়মিত পরীক্ষা করানোই সবচেয়ে ভালো। অবস্থাপন্ন ঘরের প্রসূতি হয়তো নামজাদা শিশু-বিশেষজ্ঞ দিয়ে নিজের শিশুকে নিয়মিত পরীক্ষা করানো পছন্দ করবেন। এতে অবশ্য আপত্তি করার কথাই ওঠে না, বরং এটি সর্বদাই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু মুশকিল এই যে আমাদের এই গরিব দেশে অধিকাংশ পরিবার সর্বদা এত মোটা টাকা ভিজিট দিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকতে পারেন না, নিয়মিত মাসের পর মাস বিশেষজ্ঞ ডাকতে পারেন তো মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র। ফলে অধিকাংশ প্রসূতিকেই নির্ভর করতে হয় এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন এমন সাধারণ ডাক্তারের ওপর। এমনিতে অবশ্য অস্বাভাবিক বা

গুরুতর কোনো সমস্যা কিংবা শিশু-রোগ দেখা না দিয়ে থাকলে অভিজ্ঞ সাধারণ চিকিৎসককে দিয়ে শিশুকে নিয়মিত পরীক্ষা করানোয় কিছুমাত্র বাধা নেই। বিশেষ করে যে-সব পরিবারে এমন বাঁধা বা নির্দিষ্ট চিকিৎসক আছেন যিনি নিয়মিত ওই পরিবারের সকলের চিকিৎসা করে আসছেন, সেখানে তাঁর ওপর নবজাত শিশুকে পরীক্ষার ভার দেওয়াই সমীচীন। এছাড়া যে-সমস্ত প্রস্থতি সন্তানপ্রসবেব জন্যে হাসপাতাল, প্রস্থতি-সদন বা নার্সিং হোমে ভর্তি হন, সাধাবণত তাঁদেব শিশুদেব নিয়মিত (জন্মের পর অন্তত ছ-মাস তো বটেই) পবীক্ষা কবাব ভাব ওই সব প্রতিষ্ঠানই নিয়ে থাকে। ফলে অপেক্ষাকৃত কম অবস্থাপন্ন ঘরের অনেক প্রস্থতিও এইভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেব দ্বারা শিশুকে পরীক্ষা করানোব স্থযোগ পান। তবে এমনিতে অভিজ্ঞ সাধারণ চিকিৎসক দিয়ে শিশুকে পবীক্ষা কবানোয় আপত্তি না থাকলেও, শিশুর কোনো জটিল রোগ দেখা দিলে কিংবা শিশুপালন-ব্যাপারে কোনো অস্বাভাবিক সমস্যাব উদ্ভব হলে অবিলম্বে অভিজ্ঞ শিশু-বিশেষজ্ঞের শবণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তিন | শিশুর খাওয়াদাওয়া

শিশু ও খাওয়াদাওয়ার গুরুত্ব

আপরুচি খানা—সন্থ-প্রসূতি সম্ভবত হাসপাতাল থেকেই শিখে আসবেন কিংবা তাঁর ডাক্তারবাবুর কাছে শুনবেন যে নবজাত সন্তানকে ঘড়ি ধরে তিন কিংবা চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর খাওয়ার দৈনিক সময়-নির্ঘণ্ট তিনি তৈরি করেন এইভাবে : যথা, ভোব ৬টা, সকাল ৯টা, দুপুর ১২টা, দুপুর ৩টে, বিকেল ৬টা, রাত্রি ১০টা ও বাত্রি ২টো (দিনের বেলা তিন ঘণ্টার ব্যবধান অনুযায়ী) ; কিংবা, ভোব ৬টা, সকাল ১০টা, দুপুর ২টো, 'বিকেল ৬টা, বাত্রি ১০টা ও রাত্রি ২টো (চার ঘণ্টার ব্যবধান অনুযায়ী)। স্তন্যদান সম্ভব না হলে এবং শিশুকে বোতলের দুধে লালন করতে হলে প্রসূতি আবো শিখে আসবেন কিভাবে বোতলের নানারকম দুধ শিশুব খাওয়াব উপযোগী কবে তৈরি কবে নিতে হয় তার পদ্ধতি। অর্থাৎ, কত আউন্স দুধে কত পরিমাণ জল মেশাতে হয়, কিভাবে মেশাতে হয়, কিভাবে ও কতক্ষণ ফোটাতে হয়, একেকবার ফিডিং বট্‌লে ঠিক কতখানি দুধ ভবে খাওয়াতে হয় (আমাদের দেশে নবজাত শিশুকে একেকবাবে সাধাবণত ২ থেকে ২॥০ আউন্স দুধ খেতে দেওয়া হয়) ইত্যাদি। হাসপাতাল বা ডাক্তারবাবুর এই সমস্ত নির্দেশ নানাবকম খুঁটিনাটি হিসেবের ভারে ভারাক্রান্ত। কিন্তু যে-কথাটা নতুন মাকে জানাতে এঁরা প্রায়শই ভুলে যান, এক্ষেত্রে সেইটিই হল সবচেয়ে গুরুতব প্রসঙ্গ। সেটি আর কিছুই নয় শুধু এই ঘটনাটুকু মনে রাখা যে এত সব খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা একটি তরতাজা জীবন্ত মানুষেব জন্যেই এবং সেই ছোট্ট মানুষটির খাওয়ার পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে ইচ্ছা-অনিচ্ছার জোরটা বড়োই প্রবল।

একথা অবশ্য সত্যি যে অতি সতর্কভাবে শিশুর খাদ্য প্রস্তুতের গুরু দায়িত্ব প্রসূতিরই। এও সত্যি যে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রসূতির ডাক্তারবাবু বিশেষ বিশেষ শিশুর বয়স, শরীরের ওজন ও যতদূর সম্ভব তার খাদ্যরুচির ওপর ভিত্তি করেই সেই শিশুর খাওয়ার পরিমাণ ও সময়-নির্ঘণ্ট নির্দিষ্ট করে দেন। কাজেই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য নির্দিষ্ট উপায়ে প্রস্তুত করে ঘড়িধরা সময়ে খাওয়ানোয় অন্যায় কিছু নেই, বরং এভাবে প্রসূতি তাঁর কর্তব্যই পালন করেন মাত্র। তবু কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এ-কথাও ভুললে চলবে না যে একমাত্র শিশুই সঠিকভাবে অনুভব করতে পারে তার শরীর কোন্ সময়ে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্যবস্তু চায়, ঠিক কতখানি তার পরিপাক-যন্ত্র আত্মস্থ করতে পারে। তার যতখানি খাদ্যের প্রয়োজন যদি সে নিয়মিতভাবে তার চেয়ে কম পেতে থাকে তাহলে সে যে আরো বেশি খাবারেব জন্যে কাঁদবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক অনুভূতির ওপর নির্ভর করাই বিধেয় এবং এ-নিয়ে ডাক্তারবাবুব সঙ্গে প্রসূতির ফিরেফিরতি পরামর্শ করাও দরকার। আবাব, উল্টোপক্ষে, শিশু যদি এক বারে ডাক্তারবাবু কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য খেতে না চায় ও বোতলে দুধ পড়ে থাকে, তাহলেও সবটুকু খাওয়ার জন্যে তার ওপর জবরদস্তি করা ঠিক নয়।

শিশুর জন্মের প্রথম বছরে এ-ব্যাপারে নতুন মাকে নিচের কটি কথা স্মরণ রাখতে বলি: এ-বয়সে যখনই শিশুর ঘুম ভাঙবে, জানবেন সে ক্ষুধার্ত। শিশু কাঁদলেও বুঝতে হবে সে খেতে চাইছে। এ-সময়ে খাওয়ার জন্যে সে এতই উদ্গ্রীব হয়ে থাকে যে স্তনাগ্র কিংবা বোতলের চুষি মুখে দিলে শিশু যেন রোমাঞ্চে শিউরে ওঠে। স্তন্যপানের সময় তার তীব্র উত্তেজনা মা পর্যন্ত অনুভব করতে পারেন। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-সময়ে শিশুর গায়ে ঘাম পর্যন্ত দেখা দেয়। স্তন্যপানের বা বোতলের দুধ খাওয়ার সময় মাঝপথে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে দিলে শিশু যে সাংঘাতিক চটে যায়

তিন | শিশুর খাওয়াদাওয়া

শিশু ও খাওয়াদাওয়ার গুরুত্ব

আপরুচি খানা—সগু-প্রসূতি সম্ভবত হাসপাতাল থেকেই শিখে আসবেন কিংবা তাঁর ডাক্তারবাবুর কাছে শুনবেন যে নবজাত সন্তানকে ঘড়ি ধরে তিন কিংবা চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী শিশুব খাওয়ার দৈনিক সময়-নির্ঘণ্ট তিনি তৈরি করেন এইভাবে : যথা, ভোর ৬টা, সকাল ৯টা, দুপুর ১২টা, দুপুর ৩টে, বিকেল ৬টা, রাত্রি ১০টা ও রাত্রি ২টো (দিনের বেলা তিন ঘণ্টার ব্যবধান অনুযায়ী) ; কিংবা, ভোর ৬টা, সকাল ১০টা, দুপুর ২টো, 'বিকেল ৬টা, বাত্রি ১০টা ও রাত্রি ২টো (চার ঘণ্টার ব্যবধান অনুযায়ী)। স্তন্যদান সম্ভব না হলে এবং শিশুকে বোতলের দুধে লালন কবতে হলে প্রসূতি আবো শিখে আসবেন কিভাবে বোতলের নানারকম দুধ শিশুব খাওয়াব উপযোগী কবে তৈবি করে নিতে হয় তার পদ্ধতি। অর্থাৎ, কত আউন্স দুধে কত পরিমাণ জল মেশাতে হয়, কিভাবে মেশাতে হয়, কিভাবে ও কতক্ষণ ফোটাতে হয়, একেকবার ফিডিং বট্‌লে ঠিক কতখানি দুধ ভবে খাওয়াতে হয় (আমাদের দেশে নবজাত শিশুকে একেকবাবে সাধাবণত ২ থেকে ২॥০ আউন্স দুধ খেতে দেওয়া হয়) ইত্যাদি। হাসপাতাল বা ডাক্তারবাবুর এই সমস্ত নির্দেশ নানাবকম খুঁটিনাটি হিসেবের ভাবে ভাবাক্রান্ত। কিন্তু যে-কথাটা নতুন মাকে জানাতে এঁরা প্রায়শই ভুলে যান, এক্ষেত্রে সেইটিই হল সবচেয়ে গুরুতব প্রসঙ্গ। সেটি আর কিছুই নয় শুধু এই ঘটনাটুকু মনে রাখা যে এত সব খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা একটি তরতাজা জীবন্ত মানুষের জন্যেই এবং সেই ছোট্ট মানুষটির খাওয়ার পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে ইচ্ছা-অনিচ্ছার জোরটা বড়োই প্রবল।

একথা অবশ্য সত্যি যে অতি সতর্কভাবে শিশুর খাদ্য প্রস্তুতের গুরু দায়িত্ব প্রসূতিরই। এও সত্যি যে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রসূতির ডাক্তারবাবু বিশেষ বিশেষ শিশুর বয়স, শরীরের ওজন ও যতদূর সম্ভব তার খাদ্যরুচির ওপর ভিত্তি করেই সেই শিশুর খাওয়ার পরিমাণ ও সময়-নির্ঘণ্ট নির্দিষ্ট করে দেন। কাজেই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য নির্দিষ্ট উপায়ে প্রস্তুত করে ঘড়িধরা সময়ে খাওয়ানোয় অন্যায় কিছু নেই, বরং এভাবে প্রসূতি তাঁর কর্তব্যই পালন করেন মাত্র। তবু কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এ-কথাও ভুললে চলবে না যে একমাত্র শিশুই সঠিকভাবে অনুভব করতে পারে তার শরীর কোন্ সময়ে ঠিক কী পরিমাণ খাদ্যবস্তু চায়, ঠিক কতখানি তার পরিপাক-যন্ত্র আত্মস্থ করতে পারে। তার যতখানি খাদ্যের প্রয়োজন যদি সে নিয়মিতভাবে তার চেয়ে কম পেতে থাকে তাহলে সে যে আরো বেশি খাবারের জন্যে কাঁদবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরকম ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক অনুভূতির ওপর নির্ভর করাই বিধেয় এবং এ-নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে প্রসূতির ফিরেফিরতি পরামর্শ করাও দরকার। আবার, উল্টোপক্ষে, শিশু যদি এক বারে ডাক্তারবাবু কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য খেতে না চায় ও বোতলে দুধ পড়ে থাকে, তাহলেও সবটুকু খাওয়ার জন্যে তার ওপর জবরদস্তি করা ঠিক নয়।

শিশুর জন্মের প্রথম বছরে এ-ব্যাপারে নতুন মাকে নিচের কটি কথা স্মরণ রাখতে বলি : এ-বয়সে যখনই শিশুর ঘুম ভাঙবে, জানবেন সে ক্ষুধার্ত। শিশু কাঁদলেও বুঝতে হবে সে খেতে চাইছে। এ-সময়ে খাওয়ার জন্যে সে এতই উদ্গ্রীব হয়ে থাকে যে স্তনাগ্র কিংবা বোতলের চুষি মুখে দিলে শিশু যেন রোমাঞ্চে শিউরে ওঠে। স্তন্যপানের সময় তার তীব্র উত্তেজনা মা পর্যন্ত অনুভব করতে পারেন। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-সময়ে শিশুর গায়ে ঘাম পর্যন্ত দেখা দেয়। স্তন্যপানের বা বোতলের দুধ খাওয়ার সময় মাঝপথে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে দিলে শিশু যে সাংঘাতিক চটে যায়

ও কাঁদে এ-অভিজ্ঞতা তো সব মায়েরই আছে। আবার এও দেখা যায় যে পেট ভরে ইচ্ছামতো খেতে পেলে সে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও গভীর তৃপ্তিতে নিদ্রা যায়। ঘুমের মধ্যেও অনেক সময় শিশুকে স্তন্যপান করার ভঙ্গি করতে দেখা যায় এবং সে-সময়ে তার মুখেচোখে এক পরম পরিতৃপ্তিব ভাব ফুটে ওঠে। অর্থাৎ ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শিশু স্তন্যপানের স্বপ্ন দেখে। এ সব কিছু থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে খাওয়াব ব্যাপারটা শিশুর কাছে অদ্ভুত আনন্দদায়ক একটা ঘটনা। জীবনেব এই প্রত্যূষায় তাব খাওয়াদাওয়া যেভাবে চলে সে-অনুযায়ীই জীবন সম্পর্কে তার ধারণা গড়ে ওঠে। শৈশবে যিনি তাকে খাওয়ান তাঁকে দেখেই পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে তার প্রথম ধারণার সূত্রপাত হয়।

মা যেখানে শিশুকে জোর কবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়াতে চেষ্টা কবেন, দেখা যায় সে সব ক্ষেত্রে শিশু ক্রমশই খাওয়ার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়ে, খাদ্যে তার অরুচি দেখা দেয়। প্রায়ই দেখা যায় এবকম ক্ষেত্রে শিশু হয় তার খাওয়া শেষ করার আগে মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ে খাওয়াব হাত থেকে অব্যাহতি খোঁজে আব নয়তো বীতিমতো বিদ্রোহ করে। এই শেষোক্ত ধরনের শিশুরা প্রায়ই ঘ্যান্‌ঘেনে ও বাগী হয়ে ওঠে। জীবন সম্পর্কে তাদের অনুভূতিটাই যেন বিষিয়ে ওঠে। হাবভাব দেখে মনে হয় তারা যেন ভাবছে, “বেচে থাকাটা নিছক লড়াই ছাড়া কিছু নয়। সারা দুনিয়ার লোক পেছনে লাগবাব জন্যে যেন মুখিয়ে আছে। অতএব নিজেব প্রাণ বাঁচাতে গেলে বীতিমতো লড়ে বাঁচতে হবে।”

সুতরাং শিশু স্বেচ্ছায় যতটুকু খেতে চায় তাকে জোর করে তার বেশি খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। নতুন মায়ের কাছে অনুরোধ, খাওয়াব ব্যাপারটা শিশুকে উপভোগ করতে দিন, আপনি যে ওর সবচেয়ে বড়ো সুহৃদ সেটা বুঝতে দিন ওকে। মনে রাখবেন জন্মের পর প্রথম বছবে শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস, বেঁচে থাকার আনন্দ এবং আত্মীয়-পরিজনের প্রতি ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত করে তোলার

পক্ষে সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে খাওয়ার সুখ উপভোগ করতে দেওয়া।

চোষার প্রবৃত্তি—শিশুর উৎসুকভাবে স্তন্যপান করার কিংবা ফিডিং বট্‌লের চুষি চোষার কারণ দুটি। প্রথমত, নিশ্চয়ই তার ক্ষুধা পায় বলে। কিন্তু, দ্বিতীয়ত, সে কোনো কিছু চুষতে ভালোবাসে বলে। মা শিশুকে যতই পেট ভরে খেতে দিন, যদি তিনি তাকে স্তনাগ্র কিংবা বোতলের চুষি চোষবার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় না দেন তাহলে তার চোষার প্রবৃত্তি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং ওই শিশু তখন নিজের হাতের মুঠি, বুড়ো আঙুল কিংবা জামাকাপড় যা-হোক কিছু চুষে তার সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাকে মেটাতে চেষ্টা করে। এ-কারণে প্রত্যেক শিশুকে প্রতিবার খাওয়ানোর সময় সাধ মিটিয়ে স্তনাগ্র কিংবা চুষি চুষতে দেওয়া ও দিনের মধ্যে বারে বারে খেতে দেওয়া বিশেষ দরকার। নবজাত শিশু একেবারে গোড়াতেই অবশ্য বুড়ো আঙুল ইত্যাদি চুষতে পারে না, তবে তার ধরনধারন দেখে আঙুল চোষার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বলে মনে করলে সময় থাকতে উপরোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

খাওয়াদাওয়া ও শিশুর ওজন—জন্মের পর প্রথম সপ্তাহে নবজাত শিশুর শরীরের ওজন প্রায় আধ পাউণ্ড কমে যায়। তারপর প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪ আউন্স করে ওজন বাড়তে থাকে। এ নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন, কোনো শিশু যদি পূর্ণ পরিণত হয় এবং একেবারে গোড়া থেকে বোতলের দুধের ওপর নির্ভর করে বেড়ে ওঠে, তাহলে দেখা যায় সাধারণত দুই কিংবা তিন দিনের মধ্যেই তার ওজন ফের বাড়তে শুরু করেছে। এ-ধরনের দুধ সহজেই শিশু খেতে পারে ও খেয়ে হজম করতে পারে বলে এমনটি হয়। মাতৃ-স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশুর ওজন কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বাড়ে না। প্রসবের পর অন্তত পক্ষে দিন চার-পাঁচ সদ্য-প্রসূতির স্তনে দুধের সরবরাহ যথেষ্ট

পরিমাণে হয় না এবং তার পরেও সে-সরবরাহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বলে স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশুর ওজন বাড়তে কিছুটা বেশি সময় লাগে।

অন্যদিকে, অপুষ্ট ও অপরিণত শিশুদের ওজন উপরোক্ত দু-ধরনের শিশুদের চেয়ে কিছু বেশি দিন ধরে কমতে থাকে এবং পরে ওজন বেড়ে স্বাভাবিক হতে সময়ও লাগে বেশি। এর কারণ, অপুষ্ট শিশুরা প্রথম প্রথম খুব অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। কোনো কোনো সময় নিছক জন্মের সময়কার শরীরের ওজন ফিরে পেতেই এ-ধরনের শিশুর পক্ষে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এতে শিশুর বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেননা পরে তার শরীরের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এই অপুষ্টি পুষিয়ে নেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর ওজন হ্রাসেব ব্যাপারটি নিয়ে কোনো কোনো বাপ-মা অকারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এভাবে বিচলিত হয়ে পড়াটা একেবারেই নিরর্থক ও ক্ষতিকারক বলে জানবেন। ওজন 'অতিরিক্ত' কমে গেলে শিশুর শরীরেব জলীয় অংশ কমে যায় এবং শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে লোকের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত আছে তার প্রায় কোনো ভিত্তি নেই বললেই চলে। অথচ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক প্রসূতি ভালো করে পরীক্ষা করে না দেখেই শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ করে দেন। ফলে প্রয়োজন না থাকলেও এর ফলে শিশুকে বোতলের দুধে অভ্যস্ত হতে হয়। মোট কথা, নতুন মায়ের মনে রাখা দরকার যে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর ওজন-হ্রাস একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা এবং নিজে থেকে কোনো কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন না করে এই বিষয়টি অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুর হাতে ছেড়ে দেওয়াই তাঁর পক্ষে কর্তব্য।

খাওয়ার সময়-নির্ঘণ্ট

আগেই বলা হয়েছে প্রসূতি-সদনের কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রসূতির ডাক্তারবাবু নবজাত শিশুর প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে তার

খাওয়াদাওয়ার দৈনিক সময়-নির্ঘণ্ট তৈরি করে দেবেন। এই নির্ঘণ্টে কোনো পরিবর্তন ঘটানো আবশ্যক মনে করলে প্রসূতিকে ওই উপরোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। প্রসূতিদের জ্ঞাতার্থে এখানে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হল।

সময়-নির্ঘণ্টের তাৎপর্য—শিশুদের খাওয়াদাওয়ার সময় বেঁধে দেওয়ার এই পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের আবিষ্কার। এমন কি আজকের দিনেও পৃথিবীর পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে বোধহয় শতকরা ৮০জন কি তারও বেশি প্রসূতি এই আবিষ্কারের নামগন্ধও শোনেননি। তাঁরা শুধু এইমাত্র জানেন যে শিশু ক্ষুধার্ত হলে এবং কান্নাকাটি শুরু করলে তাকে খাওয়াতে হয়। আর শুধু এঁদের কথাই বা বলি কেন, আজ থেকে পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে ইওরোপ-আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশের অতি যত্নশীল সাবধানী মায়েরাও শিশুদের ঘড়ি ধরে খাওয়ানোর এই পদ্ধতিটির কথা কিছুই জানতেন না।

কিন্তু তাহলে এই সময়-নির্ঘণ্ট আবিষ্কৃত হল কেন? এর কারণ, গত শতাব্দীর শেষ দিকে ইওরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা শিশুদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে স্থির করলেন যে এই অরাজকতার মধ্যে যদি খানিকটা নিয়মশৃঙ্খলা বেঁধে দেওয়া যায় তো তাতে উপকার ছাড়া অপকার নেই। তাঁবা দেখলেন যে অনেক সময় শিশুরা হয়তো নিছক গরহজমের দরুন পেটের যন্ত্রণায় কাঁদে, অথচ তাদের মায়েরা শিশুদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে মনে করে জবরদস্তি তাদের খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এর ফলে শিশুদের গরহজম যেমন বেড়ে যায় তেমনি তারা রাগী ও কাঁদুনে হয়ে পড়ে। এই কারণে বিভিন্ন ওজন ও বিভিন্ন বয়সের শিশুদের দৈনিক গড়ে কতটা করে দুধের প্রয়োজন হয় তা তাঁরা হিসেব করে বের করলেন। তাঁরা আরো আবিষ্কার করলেন যে একজন সাধারণ সুস্থ ইওরোপীয় শিশুর (প্রতিবার পেট ভরে খেতে পেলে) জন্মের পর প্রথম কয়েক

মাস দৈনিক প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে শিশুর ওজন সাত পাউণ্ডের কম হলে তাকে দৈনিক চার ঘণ্টার পরিবর্তে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়ানোর দরকার হতে পারে।

শিশুদের খাওয়াদাওয়া করানোর বাঁধাধরা সময়-সূচী নির্দিষ্ট করে দেওয়ার এই হল ইতিহাস। সেই থেকে ইওরোপ-আমেরিকায় ও পরে আংশিকভাবে আমাদের দেশেও চিকিৎসক, প্রসূতি-সদন ও প্রসূতিদের মধ্যে এই রীতি চালু হয়ে গেছে। এদেশে প্রসূতি-সদনের সংখ্যা এবং প্রসূতিদের মধ্যে সেখানে প্রসব হওয়ার রেওয়াজ দিন দিন যতই বাড়ছে ততই শিশুকে খাওয়ানোর এই নির্দিষ্ট সময়-সূচী মেনে চলার দিকে একটা ঝোঁকও বেড়ে চলেছে। এটা অবশ্য খারাপ কিছু নয়। নানা ওজন ও নানা বয়সের শিশুর খাদ্য কিভাবে প্রস্তুত করতে হয়, কি উপায়ে তার মাত্রা বা পরিমাণ ঠিক করতে হয় এবং কতক্ষণ অন্তর খাওয়াতে হয় এ-সম্পর্কে নতুন মায়েদের অন্তত একটা কাজ-চলার মতো ধারণা থাকা বিশেষ দরকার বৈকি।

তবে এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে দুটি কথা মনে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। —প্রথমত, শিশুর খাওয়াব সময়-নির্ঘণ্ট মূলত নির্ভর কবে শিশুর নিজস্ব পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের ওপব, অন্য কোনো কিছুর ওপর নয়। অর্থাৎ, এক বিশেষ বয়সের বিশেষ ওজন-বিশিষ্ট শিশু তার একেকবারের খাদ্য পুরোপুরি পরিপাক করতে যতটা সময় নেয় তার ওপর। এই কথাটি প্রথম থেকে স্মরণ রাখা দরকার। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসকরা বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ওজনের সাধারণ সুস্থ শিশুদের জন্যে তিন বা চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়ানোর যে সাধারণ সময়-সূচী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেটি কিন্তু প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে পুরোপুরি ও সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। অর্থাৎ, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি শিশুর বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্য ও বিশিষ্ট রুচি অনুযায়ী উপরোক্ত সময়-নির্ঘণ্টের কিছু কিছু অদলবদল ঘটা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

অতএব নতুন মায়ের কাছে আমাদের নিবেদন: হাসপাতাল বা

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী শিশুকে প্রতি দিন ঘড়িধরা সময়-মতো তিনি খাওয়াবেন নিশ্চয়ই, কেবল খেয়াল রাখবেন এই খাওয়া-নোর সঙ্গে যেন তাঁর শিশুর খিদে পাওয়ার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। শিশুর খাওয়ার সময়-সূচী একেবারে যন্ত্রের মতো মেনে চলার দরকার নেই; লক্ষ্য করুন, শিশুর খিদে পেয়েছে কিনা। খিদে পাক আর না পাক ঘড়িতে ঠিক ভোর ৬টা কি সকাল ৯টা বা ১০টা বাজলেই শিশুর মুখে স্তন কিংবা ফিডিং বট্‌লের চুষি গুঁজে দিতে হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। আবার, খিদের জ্বালায় শিশু কেঁদে-ককিয়ে অস্থির হয়ে উঠলেও ঘড়িতে ঠিক সময়ের ঘণ্টাটি না বাজা পর্যন্ত তাকে খেতে দেওয়া চলবে না এরকম ধারণাও সমান অর্থহীন ও হাস্যকর। নিয়মশৃঙ্খলাব অন্ধ ভক্ত এমন দুটি-চারটি বাপ-মা আমাদের দেশেও আছেন যাঁবা মনে কবেন জন্মের পর থেকেই শিশুকে এইভাবে ঘড়ি ধবে চলতে না শেখালে সে প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠবে ও পববর্তী জীবনে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এ ধাবণা যে শুধু ভুল তাই নয়, এর ফলে উল্টো উৎপত্তি হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। খাওয়াব সময় ঘনিয়ে এলে শিশু কাঁদে কেন? সে কি তাব মাকে জব্দ করার জন্যে? মোটেই নয়। শিশু কাঁদে তার খিদে পায় বলে। কেঁদে কেঁদে সে দুধ খেতে চায়। খাওয়া চুকলে পর শিশু তিন কি চার ঘণ্টা ঘুমোয় কেন? তাব বাপ-মা বড়ো কড়া লোক কাজেই তাঁদেব বিরক্ত না করাব জন্যে ভয়ে ভয়ে ঘুমোয় নাকি? ব্যাপার একেবাবেই তা নয়। খাওয়ার পর শিশুর শরীর-মন ওই ঘণ্টা তিন-চারের মতো পরিতৃপ্ত থাকে বলেই সে অতক্ষণ ঘুমোয়। তাছাড়া শিশুব স্বাভাবিক তাগিদ ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী না চলে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করলে ক্রমাগত নিয়মিতভাবে খিদের যন্ত্রণা ভোগ করতে কবতে শিশু ক্রমশ কাঁদুনে ও বদ্‌রাগী হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠ বাপ-মা বরং শিশুর ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খলতার পথই পরিষ্কার করে দিতে পারেন। মোট কথা, শিশুর খাওয়ার বাঁধাধরা সময়-সূচী বাস্তব অবস্থার সঙ্গে

খাপ খাইয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব মেনে চললেই ভালো হয়। এ ব্যাপারে যান্ত্রিকভাবে ঘড়ি ধরে চলবার দরকার নেই। তবে এ থেকে কেউ যেন না মনে করেন যে আমরা যুক্তিসঙ্গত নিয়মানুবর্তিতার বিবোধিতা করতে চাই। আমরা এ-কথা মোটেই বলতে চাই না যে প্রসূতি ও শিশু তাঁদের দৈনন্দিন খাওয়া-শোওয়া-বসা ইত্যাদি নিয়মমাফিক করবেন না কিংবা তা করলে তার ফল খারাপ হবে। জীবনে আমাদের প্রত্যেককে মোটামুটি নিয়ম মেনেই চলতে হয়; পরিবারের শিশুদেরও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ওই নিয়মের চাকায় নিজেদের বাঁধতে হয়। সংসাবের গৃহিণী হিসেবে প্রসূতিকেও তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম সময়মতোই করতে হয়। কাজেই তাঁর সন্তান যদি ওই সময়-সূচীর সঙ্গে নিজের খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি খাপ খাইয়ে নিতে পাবে তাহলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় এই যে সব শিশু কি সমানভাবে এই সময়-সূচীর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পাবে? কেউ কেউ হয়তো জন্মক্ষণ থেকেই ওই তিন কি চার ঘণ্টাব সময়-নির্ঘণ্টে দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এদের নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় না। সমস্যা দেখা দেয় হয়তো তাদেব নিয়ে যাবা অনিয়মিত সময়েব ব্যবধানে (যেমন কখনো ৩ ঘণ্টা আবাব কখনো ২ ঘণ্টা কিংবা ৪ ঘণ্টা অন্তর) ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। মাস দুই-তিন বয়স হবাব পর এদের এই অভ্যাস আবার হয়তো পালটেও যায়। এছাড়া এমন শিশুও দেখা যায়, শরীরের ওজন অনুযায়ী যার খিদে পাওয়া উচিত ৩ ঘণ্টা অন্তব, অথচ জন্মেব পব প্রথম কয়েক সপ্তাহ সে দুই কি আড়াই ঘণ্টা অন্তর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ছে। আবার এমনও ঘটে যে শিশুব শরীরের ওজন ও তার আচরণ দেখে হাসপাতালে ডাক্তার বা নার্স হয়তো স্থির করলেন যে তাকে ৩ কিংবা ৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে, অথচ সেই শিশু হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসার সময় থেকে অন্য রকম আচরণ করতে শুরু করল। এই রকম কিছু কিছু শিশুর বয়স দু-সপ্তাহ পেরোবার পর দেখা যায় যে তারা আগের চেয়ে কম সময়

ধরে ঘুমোচ্ছে ও বেশি কাঁদছে—অর্থাৎ তাদের খিদে আগের চেয়ে বেশি ঘনঘন চাগিয়ে উঠছে। ফলে আগে তাদের খাওয়ার সময়ের ব্যবধান তিন ঘণ্টা হলে এখন তা কমিয়ে দু-ঘণ্টা করতে হয়।

মাঝরাত্রে খাওয়ানো—অনেকের ধারণা যে শিশুকে যদি ধরাবাঁধা সময়-সূচী অনুযায়ী কিছুদিন খাওয়ানো হয় তাহলে সেই সময়-সূচীতে শিশুটি এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে পরে তার আর নড়চড় করা সহজে সম্ভব হয় না। এটা কিন্তু সত্যি নয়। আসলে প্রত্যেকটি শিশু ক্রমশ যেমন বড়ো হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যেক দুটি খাওয়ার মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানও বেড়ে চলে।

শিশুদের মাঝরাত্রের বা রাত্রি ২টোর খাওয়া সম্বন্ধেও ওই একই কথা। নতুন মা যদি দেখেন তাঁর শিশু রোজই রাত দুটো নাগাদ জেগে উঠে খেতে চাইছে, তাহলে শিশুর এই 'বদভ্যাস' দূর করার জন্যে তিনি যেন খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে না ওঠেন। ভয় নেই, শিশু ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও তার অন্যান্য বারের খাওয়ার সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধের জোগান দিতে পাবলে আপনা থেকে সে একদিন এই রাত্রের খাওয়া বন্ধ করে দেবে। ঠিক কত বড়ো হলে শিশু এ অভ্যাস ত্যাগ করবে এক কথায় তা বলা সম্ভব নয়। কেউ একেবারে গোড়া থেকেই, কেউ বা দু-সপ্তাহ পর, কেউ আবার এক মাস কি দেড় মাস পর রাত্রেব খাওয়াব অভ্যাস ত্যাগ করে। ছোট-খাট ক্ষীণজীবী শিশুরা অবশ্য আরো দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাসটি বজায় রাখতে বাধ্য হয়।

শিশুর মাঝরাত্রের খাওয়ার অভ্যাস জবরদস্তি ছাড়াবার চেষ্টা করে বিশেষ কিছু ফল হয় না। খিদে পেলে ঠিক সময়ে শিশু কাঁদবেই। খাওয়ার ব্যবস্থা না করে তখন তাকে কাঁদতে দিলে মাঝে হতে প্রসূতির নিজের ও পরিবারের সকলের রাত্রের ঘুম নষ্ট হবে। আবার দুধের বদলে বোতলে জল পুরে খেতে দিলেও খুব বেশি লাভ হবে না। এতে হয়তো মিনিট ১০।১৫ শিশু চুপ করে থাকবে

তারপর ফের ক্ষুধার উদ্রেক হলে আবার চিৎকার করে পাড়া মাথায় করবে। অতএব এই ধরনের কোনো অভিনব পদ্ধতিতে শিশুর 'বদভ্যাস' ত্যাগ করানোর চেষ্টা না করাই ভালো।

শিশুকে মাঝরাত্রে খাওয়ানোর প্রশস্ত পদ্ধতি হচ্ছে, সময় উপস্থিত হলে শিশুকে ডেকে না তুলে তার ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করা। যে-শিশুর ওই সময়ে খাওয়া আবশ্যক যথাসময়ে তার ঘুম ভাঙবেই। তারপর, সম্ভবত যখন তার বয়স হবে দুই থেকে ছ-সপ্তাহের মধ্যে তখন একদিন রাত্রে দেখা যাবে শিশুটি রাত ২টোয় না উঠে ঘুম থেকে উঠছে রাত ৩টে কিংবা ৩॥টেয়। সেদিন রাত্রে তাকে তখনই খাওয়াতে হবে। এবং এই খাওয়াকে শিশুর রাত ২টোর খাওয়া বলে ধরতে হবে। এতে তার পরদিনের ভোর ৬টা কিংবা ৭টার খাওয়ার কোনো ব্যাঘাত না ঘটাই সম্ভব। অতঃপর, পরদিন রাত্রে ওই শিশুটিই হয়তো ঘুম থেকে উঠে খেতে চাইবে একেবারে শেষ রাত্রে—রাত ৪॥টে কিংবা ৫টায়। সেদিনও তাকে তখনই খেতে দিতে হবে। তবে সেদিন এই শেষরাত্রের খাওয়াকে শিশুর মাঝরাত্রের খাওয়া হিসেবে না ধরে একে ভোর ৬টার খাওয়া বলে ধরতে হবে। তারপর দেখতে হবে পরের বারের খাওয়ার জন্যে সে বেলা ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে কিনা। শিশু যখন তার মাঝরাত্রের খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়, তখন যেন তার আর দেরি সয় না, একেবারে দু-তিন রাত্রের মধ্যেই সে রাত্রে খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

নিয়মিত সময়-সূচী অনুসরণের উপায়—আগেই বলেছি, তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ক্রমে ক্রমে শিশুর খাওয়ার সময়-সূচীকে নিয়মিত করে তোলাই যুক্তিসঙ্গত। দিনের বেলা খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে যদি দেখা যায় যে শিশু ঘুমোচ্ছে তো তখন তাকে ডেকে তুললে ক্ষতি নেই। একবার খাওয়ার পর যদি ততক্ষণে ঘণ্টা তিনেক সময় পার হয়ে গিয়ে থাকে

তো শিশুকে খাওয়ার জন্যে মোটেই সাধ্য-সাধনা করতে হবে না। মুখে স্তনবৃন্ত কিংবা বোতলের চুষি গুঁজে দিলে আপনা থেকে তার ক্ষুধার উদ্রেক হবে। কিন্তু কোনো শিশু যদি খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগেই জেগে ওঠে ও কাঁদতে থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে খেতে দেবার দরকার নেই। কান্নার অর্থ সব সময়েই কিন্তু খিদে-পাওয়া নয়। তবে যদি দেখা যায় যে দশ কিংবা পনেরো মিনিটের মধ্যেও তার কান্না থামছে না বরং বেড়েই চলেছে তখন সে-কান্নাকে খিদের জ্বালা বলে মনে করাই সঙ্গত। কিন্তু এর ফলে খাওয়ার ওই নিয়মিত সময়-সূচীর গতি কী হবে ?—না, সময়-নির্ঘণ্ট এতে ভেস্তে যাবে না। হয়তো দেখা যাবে, শিশু এবার কিছু বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে সময়-সূচীর এই ফাঁকটা ভরে দিচ্ছে এবং পরের বার ঠিক সময়মতোই খাচ্ছে। এমন কি সারা দিনের মধ্যে ফাঁকটা ভরতে না পারলে হয়তো দেখা যাবে রাত্রের মধ্যে শিশু ফের ওই নিয়মিত সময়-সূচী অনুসবণ করছে। তবে যদি দেখা যায় যে সে নিয়মিত-ভাবেই খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা আগে জেগে উঠছে, তাহলে ধবে নিতে হবে সম্ভবত শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পাচ্ছে না বলে ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারছে না। এরকম ক্ষেত্রে, শিশু স্তন্যপানে অভ্যস্ত হলে প্রসূতির উচিত হবে তাকে আরো ঘন ঘন স্তন দেওয়া। এর ফলে, স্তন ঘন ঘন খালি হওয়ায় কয়েক দিনের মধ্যে বুকে দুধের জোগান বাড়বে। এবং এইভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পেলে শিশু তার খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়-সূচী মেনে চলতে সমর্থ হবে। অন্যপক্ষে শিশুটি যদি ফিডিং বট্‌লের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং দেখা যায় যে প্রত্যেকবারই সে বরাদ্দ দুধটুকু খেয়ে বোতল খালি করে ফেলছে, তাহলে তার বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানোর জন্যে ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। কিন্তু শিশু যদি তার বরাদ্দ খাবার পুরোপুরি না খায় অথচ প্রতিবার খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে সম্ভবত শিশুটির খাওয়ার মধ্যেকার ৩ ঘণ্টার ব্যবধান কমিয়ে দিয়ে ২৷৷ ঘণ্টা কিংবা ২ ঘণ্টা

কান্না খুব সম্ভবত তার খিদের জ্বালার জন্যে নয়, পেটের বেদনার দরুন। আপনার শিশুর বেলায় এ রকম ব্যাপার ঘটতে দেখলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে বিলম্ব করবেন না।

তাগিদ অনুযায়ী খাওয়ানো—আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রসূতি অবশ্য এখনো পর্যন্ত শিশুকে খাওয়ানোর ঘড়িধরা সময়-সূচীর ব্যাপারটি জানেন না কিংবা মানেন না। খিদেব তাড়নায় কাঁদলে শিশুকে খাওয়াতে হয়, তাঁরা শুধুমাত্র এই সহজ সত্যটিই জানেন। সাধারণ সুস্থ শিশুদের বেলায় এতে অবশ্য অসুবিধা হয় না। একটি সাধারণ শিশু জন্মের পর প্রথম তিন-চার দিন প্রায় সারাদিনই ঘুমোয় ও বেশ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে জাগে। অতঃপব মায়ের বুকে দুধ দেখা দেওয়ার সময়ে-সময়ে তার ঘুম যেমন ঘন ঘন ভাঙতে থাকে তেমনি তার খিদেও পায় বেশি। এ-সময়ে ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে তাকে ৬ থেকে ১০ বার খেতে দিতে হয়। শিশুকে এইভাবে ঘন ঘন খেতে দেওয়াব ফলে এই সময়ে মায়েব বুকে দুধের সববরাহও যায় বেড়ে। স্তন্যপানে শিশুর পেট ভবলে ও সে তৃপ্ত হলে এবপর ফের তার ঘুমের বহর ক্রমে বাড়তে থাকে। জন্মের সপ্তাহ দুই পরে শিশু সারা দিনেরাত্রে ৬ বাব কি ৭ বাব খেতে চায় ; পরে তা আরো কমে ৫বার-৬বারেও দাঁড়ায়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে শিশু ওই ৩ ঘণ্টার ব্যবধানই মেনে চলতে থাকে। তবে এছাড়া অনেকে আবার প্রতিবারের খাওয়াব মধ্যে কমপক্ষে ২ থেকে ২॥ ঘণ্টা ও বেশিপক্ষে ৪ ঘণ্টার ব্যবধানও মানে।

যে-সব প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যদান করে থাকেন তাঁদের বেলায়, বিশেষ করে সন্তানপ্রসবের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে, শিশুকে খাওয়ানোর এই প্রাকৃত বা 'স্বাভাবিক' পদ্ধতির ফলে বেশ সুফল ফলতে দেখা যায়। কেননা ওই সময়ে একেকবার স্তন্যপান করতে গিয়ে খুব অল্প পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় বলে শিশু ঘন ঘন ঘুম থেকে জেগে ওঠে ও স্তন্যপান করে এবং এর ফলে মায়ের বুকে দুধের

সরবরাহও খুব বেড়ে যায়।

তবে যে-সব শিশু-সন্তান বোতলের দুধে পালিত হয় তাদের এ ভাবে খাওয়াতে হলে মা বা ধাত্রীকে অপেক্ষাকৃত বেশি ঝামেলা পোয়াতে হয়। কেননা, এ-ক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার চেয়ে শিশুর প্রয়োজনেব দিকে নজর রাখতে হয় বেশি ও সদা-সর্বদা দুধ তৈরি করে প্রস্তুত থাকতে হয়।

তাগিদ অনুযায়ী শিশুকে খাওয়ানোব এই প্রাকৃত পদ্ধতির আরো দু-একটি অসুবিধা আছে। শিশুর মাকে যদি বাঁধা সময়ে সংসারের কাজকর্ম করতে হয়, স্বামীকে আপিসের ভাত দিতে হয় কিংবা নিজেকেই ঘড়িধবা সময়মতো আপিস করতে হয় এবং তদুপরি আরো দুটি-একটি সন্তানেব তত্ত্বাবধান করতে হয় তাহলে তাঁর পক্ষে এ পদ্ধতিতে শিশুকে খাওয়াতে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে। তাছাড়া শিশু যদি রীতিমতো সুস্থ ও স্বাভাবিক না হয়, অনবরত যদি সে গরহজম ও পেটেব অসুখে ভোগে তাহলেও এ-পদ্ধতিতে খাওয়ানোর অসুবিধা। কেননা সেক্ষেত্রে তাব পেটের বেদনাজনিত কান্নাকে প্রায়ই খিদের জ্বালা বলে ভুল কবা সম্ভব এবং এব ফলে মায়ের অকাবণ খাটুনির মাত্রাও বেড়ে যেতে পারে।

স্তনদুগ্ধের অপ্রতুলতা

ইতিপূর্বে এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২১৫-২২০। পরিচ্ছেদ: পাঁচ। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রর্ত্যাবর্তন) শিশুকে স্তন্যদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু মায়ের বুকে দুধের অপ্রতুলতার দরুন স্তন্যদানে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় সে-সম্পর্কে দুটি-চারটি কথা বলা হচ্ছে।

বুকে দুধের অপ্রতুলতা ঘটলে মায়ের ইচ্ছাসত্ত্বেও শিশুকে স্তন্যদানে বাধার সৃষ্টি হয়, একথা সত্যি। অনেকে বলেন বর্তমান সভ্যতার নানাবিধ জটিলতার দরুন প্রসূতিদের স্নায়ু (বা নার্ভ)-তন্ত্র বিপর্যস্ত

হয়ে থাকে বলে এহেন দুর্বিপাক ঘটে। প্রসূতির স্নায়ু দুর্বল বা বিপর্যস্ত হলে যে বুকে দুধের সরবরাহ কমে যায় সে কথা ঠিকই। কিন্তু স্তন্যদান ব্যর্থ হওয়ার পেছনে এ-ছাড়া আরো একটি গুরুতর কারণ থাকতে পারে। সেটি হল স্তন্যদান সফল করার জন্যে যথোপযুক্ত বা ভালো রকম চেষ্টা না করা। মনে রাখতে হবে, স্তন্যদান সফল করে তুলতে হলে নিম্নোক্ত তিনটি চেষ্টা প্রথম থেকেই বজায় রাখা দরকার: যথা, (১) যতটা সম্ভব শিশুকে বোতলের দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে, (২) প্রথম প্রথম স্তন্যদানে সফল না হলে অল্পেতেই এ-চেষ্টা ছাড়লে চলবে না, এবং (৩) বুকে দুধ আসতে শুরু করার পর দুধের সরবরাহ ক্রমশ বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিশুকে প্রতিদিন ঘন ঘন স্তন্যপান করিয়ে ও বাড়তি দুধ ব্রেস্টপাম্প কিংবা হাতের সাহায্যে গেলে ফেলে দিয়ে স্তনদ্বয়কে উত্তেজিত করে তুলতে হবে। এছাড়াও এই উদ্দেশ্যে প্রসূতির পক্ষে বেশি পরিমাণে জলীয় পদার্থ, দুধসাগু ইত্যাদি খাওয়া, যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়া, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা, দুই স্তনেই দিনে অন্তত দু-বার করে মালিশ করা, স্তনে উপর্যুপরি ঠাণ্ডা ও গরম সেঁক নেওয়া ইত্যাদি চেষ্টা নিয়মিত বজায় রাখতে পারলে ভালো হয়।

জন্মের পর প্রথম তিন-চার দিন নবজাত শিশুকে বোতলের দুধ খেতে দিলে কিন্তু পরে স্তন্যদান সফল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। যে-শিশু প্রথম থেকেই অনায়াসে-পাওয়া প্রচুর বোতলের দুধে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, পরে সে আর স্তন্যপানের কষ্টস্বীকারে তেমন রাজী হয় না। মোট কথা, গোড়ার দিকে দু-তিন দিন শিশুকে বোতলের দুধ দেওয়া হলেও, মায়ের বুকে দুধ আসতে শুরু করার পর বোতল দেওয়া বন্ধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য শিশু যদি মায়ের বুক থেকে পেট ভরার মতো দুধ না পায় ও তার ওজন ক্রমশই কমতে থাকে তাহলে অন্য কথা। সে রকম ক্ষেত্রে হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ বা ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো চলাই বিধেয়।

অনেক সময় বুকে দুধ আসতে শুরু করার দু-একদিনের মধ্যে দুধের

সরবরাহ যথেষ্ট বাড়ছে না দেখে প্রসূতি নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু এ-মুহূর্তে স্তন্যদান বন্ধ করা মোটেই উচিত নয়। প্রসূতি যেন মনে রাখেন, স্তন্যদানেব পরীক্ষায় পাস-ফেল অত দ্রুত নির্ধারিত হয় না। এমন কি, বুকে দুধ আসতে শুরু করার পর পাঁচ দিনের দিন একেকবাব স্তন্যদানের সময় যদি মাত্র এক আউন্স বা আধ ছটাক করে দুধ বেবোয় তাহলেও হাল ছাড়া চলবে না। এরকম ক্ষেত্রে প্রচলিত ৩ ঘণ্টা ব্যবধানের সময়-সূচী না মেনে আরো ঘন ঘন শিশুকে স্তন্যদান কবে স্তনদ্বয়কে উত্তেজিত কবে তোলার চেষ্টা করাই কর্তব্য। স্তনাগ্র না ফাটলে এবং বুকে দুধ সরববাহের সম্ভাবনা থাকলে এ-চেষ্টায় সফলতা লাভেব আশা যথেষ্ট থাকে।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা। স্তন্যদান সফল কবে তোলাব এই চেষ্টাটি যতদূর সম্ভব হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ কিংবা ডাক্তাববাবুব তত্ত্বাবধানে সাধিত হলেই ভালো হয। কেননা চেষ্টা হিসেবে এটি প্রশংসনীয় হলেও এব বাড়াবাড়ি ঘটা কোনো দিক থেকে বাঞ্ছনীয নয। ঘন ঘন স্তন্যদান কবতে গিযে তাব এতটা বাড়াবাড়ি ঘটা উচিত নয় যাব ফলে প্রসূতির স্তনাগ্র ফেটে যায কিংবা অতিবিক্ত পরিশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হযে পডেন। কোনো কোনো সময় দেখা যায, সন্তান প্রসবেব কালেই নবজাত শিশুব আকাব ও স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে কিংবা প্রসূতিব বুকে দুধেব অপ্রতুলতাব পূর্ব-ইতিহাস (আগেকাব এক বা একাধিক সন্তানপ্রসবেব ইতিহাস) জেনে হাসপাতালেব ডাক্তাববাবু শিশুকে বোতলের দুধ খাওযানোব পবামর্শ দিচ্ছেন। তাছাড়া, যদি দেখা যায যে নবজাত শিশু সাবাক্ষণই ভীষণ ক্ষুধার্ত হযে থাকছে কিংবা তাব ওজন ক্রমশ কমেই চলেছে, কিংবা পর্যাপ্ত পবিমাণে জলীয পদার্থ না পাওযায শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ছে তাহলেও শিশুকে প্রযোজনমতো পুবোপুবি কিংবা আংশিক ভাবে বোতলের দুধ খাওয়ানোব দবকার হবে।

একই সঙ্গে স্তন্যপান ও বোতলের দুধের ব্যবস্থা—যদি কোনো

প্রসূতির বুকে পুরোপুরি শিশুর পেট ভরানোর মতো যথেষ্ট দুধ তৈরি না হয়, তাহলে তিনি স্বচ্ছন্দে একই সঙ্গে তাকে স্তন্যদান ও বোতলের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে এতে আপত্তি করার কিছু নেই। তবে, অনেক সময় দেখা যায়, শিশুকে একসঙ্গে দুই উপায়ে খাওয়ানোর ফলে প্রসূতির বুকের দুধ ক্রমে ক্রমে কমে আসছে। তাছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুও স্তন্যপানের চেয়ে বোতলের দুধ খাওয়া বেশি পছন্দ করে ও স্তন্যপানের অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দেয়।

বেশির ভাগ মা-ই অবশ্য একসঙ্গে এই স্তন্যদান ও বোতলের দুধ খাওয়ানোর পক্ষপাতী নন। কেননা, একই সঙ্গে বোতলের দুধ তৈরি ও থেকে থেকে সন্তানকে স্তন্যদানের ডবল ঝামেলা পোয়ানো বড়ো সহজ নয়। এত হাঙ্গামা পোয়ানো সম্ভব নয় বলে মনে করলে এবং প্রসূতির বুকে দুধের পরিমাণ নিতান্ত কম (অর্থাৎ শিশুর দৈনিক প্রয়োজনের অর্ধেকেরও কম) না হলে, তিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারেন যে বোতলের দুধ বাদ দিয়ে পুরোপুরি স্তনদুগ্ধের ওপর নির্ভর করা সম্ভব কিনা। তবে যদি চেষ্টা করেও বুকে দুধের সরবরাহ বাড়ানো না যায়, তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে শিশুকে ক্রমে ক্রমে স্তন ছাড়িয়ে পুরোপুরি বোতলের দুধের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারেন।

প্রসূতি যদি শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ না করতে চান ও একই সঙ্গে দু-ভাবে খাওয়ানোর এই পদ্ধতি চালিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে তিনি ওই দু-ধরনের খাওয়ানোর মধ্যে নিম্নরূপ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতে পারেন। এই সামঞ্জস্য বিধানের মূল উদ্দেশ্য হল, প্রসূতির বুকে দুধের যতটুকু সরবরাহ আছে তা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা ও সেই সঙ্গে স্তন্যদান ছাড়াও বোতলের দুধের সাহায্য শিশুর পুরোপুরি পেট ভরানোর ব্যবস্থা করা। প্রসূতির স্তনদুগ্ধের পরিমাণ কতখানি তার ওপরই এই সামঞ্জস্য বিধানের ধরনটা নির্ভর করে। সামঞ্জস্য বিধান বস্তুটি মোটামুটি তিন ধরনের—যথা, প্রসূতির বুকে

দুধের পরিমাণ অনুযায়ী (১) দৈনিক প্রতিবার স্তন্যদানের ঠিক পরে-পরেই একবার করে বোতলের দুধ খাওয়ানো, কিংবা (২) দিনে-রাত্রে মোট পাঁচ-ছ বার স্তন্যদানের মধ্যে মাত্র একবার, দু-বার কিংবা তিনবার স্তন্যদানের পরেই বোতলের দুধ খাওয়ানো, কিংবা (৩) সারা দিনরাত্রির মধ্যে একবার কিংবা বড়জোর দু-বার স্তন্যদান বন্ধ রেখে পুরোপুরি বোতলের দুধ খাওয়ানো। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, প্রথম দুই ধরনের চেয়ে তৃতীয় ধরনটি কাজে লাগানো অপেক্ষাকৃত সহজ। এতে ঝামেলাও অপেক্ষাকৃত কম। তেমনি, উল্টোদিকে, প্রথম দুটি ধরন অভ্যাস করলে তার ফলে প্রসূতির বুকে দুধের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকার সম্ভাবনাও তৃতীয় ধরনটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। যাই হোক, এক সঙ্গে দু-ভাবে খাওয়ানোর এই তিনটি ধরনের মধ্যে প্রসূতি নিজের সুবিধামতো যে-কোনো একটি ধরন অভ্যাস করতে পারেন।

শিশুকে বোতলের দুধ খাওয়াতে হলে একেকবারে কতটা করে দুধ তৈরি করে বোতলে ভরতে হবে? এ-সম্পর্কে এক কথায় কোনো জবাব হয় না। কেননা, প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, ওই বোতল কি স্তন্যপানের পরিবর্তে একবারের পুরো খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হবে, নাকি তা দিয়ে স্তন্যপানের পর বাড়তি দুধের দাবি মেটানো হবে? দ্বিতীয়ত, এও জানা দরকার হবে, যে-শিশুকে বোতলের দুধ খাওয়ানো হচ্ছে তার শরীরের ওজন কত ও তার বয়স কী। মোটামুটি এখানে বলা চলে: শিশুর দেহের ওজন পাউণ্ড হিসেবে যত, তাকে আড়াই দিয়ে গুণ করলে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে সারাদিনে সে আনুমানিক তত আউন্স দুধ খাবে। কোনো শিশুর ওজন ৬ পাউণ্ড হলে দৈনিক তার প্রয়োজন হবে (৬ × ২৷৷০ =) ১৫ আউন্স দুধ। শিশুটি যদি তিন ঘণ্টা অন্তর দিনে ৬ বার খায়, তাহলে প্রতিবার পুরোপুরি বোতলের দুধ খেতে হলে তার দরকার পড়বে ২৷৷০ আউন্সের মতো। আর স্তন্যপানের পর বোতলের দুধে ওই শিশুর বাড়তি দুধের দাবি মেটাতে হলে সম্ভবত একেকবারে আধ আউন্স

থেকে ১ আউন্স দুধের প্রয়োজন হবে। শিশুর ওজন ও বয়স এর চেয়ে কম বা বেশি হলে এই দুধের মাত্রাও পরিমাণমতো কমবে কিংবা বাড়বে। যাই হোক শিশুব পক্ষে প্রয়োজনীয় দুধের পরিমাণ নির্ধাবণ এবং বোতলে দুধ তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরে বিস্তাবিত-ভাবে আলোচনা কবা হচ্ছে।

সাময়িকভাবে স্তনদুগ্ধ হ্রাস—প্রসূতি ক্লান্ত, অতিরিক্ত চিন্তিত কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়লে বুকে দুধেব সববরাহ সাময়িকভাবে কমে যেতে পাবে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফেরার পব প্রথম দু-একদিন অনেকের ক্ষেত্রেই এবকম ঘটতে দেখা যায়।

যদি দেখা যায় স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশু হঠাৎ এমন ভাব দেখাতে শুরু করেছে যাতে বোঝা যায যে তার পেট ঠিকমতো ভবছে না—অর্থাৎ ঘন ঘন তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে ও সে খাওযাব জন্যে কাঁদছে এবং মুখ ঘুবিয়ে চোষাব মতো কিছু একটা খুঁজছে—তাহলে মা যেন সাত তাড়াতাড়ি তাকে বোতলেব দুধ খাওযানোব জন্যে ব্যস্ত না হন। কেননা, বোতলের দুধে শিশুব খিদেব সমস্যা সহজে মিটবে বটে, কিন্তু বোতল পেলে হয়তো শিশু আব মাতৃস্তন পছন্দ কববে না। ফলে সম্ভবত মায়ের বুকে দুধেব সববরাহও যাবে কমে। কাজেই যে-প্রসূতি স্তন্যদান বজায বাখতে চান, স্তন্যপানে সাময়িকভাবে তাঁর শিশুব পেট না-ভবলে তিনি যেন প্রথমেই বোতলের দুধেব কথা চিন্তা না কবেন। ববং আগেব চেয়ে ঘন ঘন স্তন্যদান কবে এবং প্রতিবাব পবপব দুটি স্তনই শিশুকে টানতে দিয়ে বুকে দুধেব সরববাহ ফের বাড়ানোব দিকে নজব দেওয়াই তাঁব কর্তব্য। এবকম ক্ষেত্রে প্রায়ই দু-তিন দিনেব মধ্যে দুধেব সববরাহ বাড়তেও দেখা যায়। তবে এর অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে বুকে দুধেব সববরাহ নিতান্তই কম পড়লে দিনেব মধ্যে এক-আধবারও শিশুকে বোতলের দুধ দেওয়া চলবে না। কেবল এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যেন স্তন্যদানের পরিবর্তে পুবোপুরি বোতলের দুধ নিয়মিতভাবে দিনে দু-তিনবার

করে দেওয়া না হয়।

তবে একটা কথা। দিন চার-পাঁচ ধরে দিনে ঘন ঘন স্তন্যদান করার পরও বুকে দুধের সরবরাহ না বাড়লে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ পাকাপাকি-ভাবেই (সাময়িকভাবে নয়) হ্রাস পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া ভালো। অতঃপর শুধুমাত্র স্তন্যদানের ওপর নির্ভর না করে শিশুকে পুরোপুরি বোতলের দুধ কিংবা সুবিধামতো একসঙ্গে স্তন্যদান ও বোতলের দুধ খাওয়ানোর মিশ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সমীচীন।

শিশুকে স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরানো

যে-প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যদান কবে থাকেন, কখনো-সখনো তাঁকে যদি বেড়ানো কিংবা কাজ উপলক্ষে শিশুকে বাড়িতে রেখে বাইরে যেতে হয়, তাহলে তিনি স্বচ্ছন্দে দিনের মধ্যে একবারের মতো স্তন্যদানেব পরিবর্তে শিশুকে বোতলের দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। বুকে দুধের সরববাহ পাকাপাকি দাঁড়িয়ে যাবার পর এতে কোনো ক্ষতি হয় না। প্রয়োজনমতো বোতলের দুধ এইভাবে প্রতিদিন একবার করে কিংবা মাঝে মাঝে একেক দিন একবার করে দেওয়া যেতে পারে। শিশুর খাওয়ার দৈনিক সময়-সূচীর মধ্যে সকাল ৯টা, দুপুব ১২টা, দুপুর ৩টে ও সন্ধ্যা ৬টা এই চাববারের মধ্যে যে-কোনো একবাব স্তন্যদানের পরিবর্তে বোতলের দুধের ব্যবস্থা কবা চলে। এছাড়া অন্যান্য সময়ে বোতলের দুধ দেওয়ার অসুবিধা এই যে শিশু যদি তাব মাঝরাত্রের (রাত্রি ২টোর) খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে থাকে তাহলে তার মায়ের পক্ষে রাত্রি ১০টা কিংবা ভোর ৬টার স্তন্যদান বন্ধ রাখা রীতিমতো অস্বস্তিকর হতে পারে। কেননা এর ফলে মায়ের বুকে একটানা ১২ ঘণ্টা ধরে দুধ জমে থাকে বলে যেমন তাঁর স্তন টাটাতে পারে তেমনি স্তনে ক্রমশ দুধের সরবরাহও কমে যেতে পারে।

মায়ের স্তনদুগ্ধ রোগবীজাণুমুক্ত, বিশুদ্ধ ও সহজপাচ্য হয় বলে সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে তার উপকারিতা অপরিসীম। তবে যদি

প্রসূতি কোনো কারণে শিশুকে স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরাতে মনস্থই করেন, তাহলে শিশুর দুই থেকে আট মাস বয়সের মধ্যে, বিশেষ করে তার তিন মাস বয়স নাগাদ, কোনো এক সময়ে এই পরিবর্তন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ঘটানো সবচেয়ে ভালো। এক্ষেত্রে প্রথম প্রথম সপ্তাহে অন্তত দু-দিন দিনের মধ্যে একবার করে স্তন্যদানের পরিবর্তে বোতলের দুধ দিতে হবে। বিশেষ করে যে-সব শিশু মাতৃস্তন্যপানে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে কিছুতেই স্তন ছেড়ে বোতল ধরতে চায় না তাদের জন্যেই এই ব্যবস্থা। প্রসূতি স্তন্যদানে পুরোপুরি সমর্থ হলেও শিশুকে স্তন ছাড়াতে হলে এ-ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এমন কি প্রসূতি শিশুকে স্তন ছাড়াতে না চাইলেও ভবিষ্যতে আকস্মিক কোনো কারণে তাকে স্তন ছাড়াতে বাধ্য হতে পারেন এই সম্ভাবনায় আগে থাকতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেও অনেক ডাক্তার স্তন্যপানে অভ্যস্ত সব শিশুর জন্যে সপ্তাহে দু-দিন একবার করে স্তন্যপানের বদলে বোতলের দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। তবে সাধারণত শিশুর বয়স দু-মাস হবার আগে কিংবা আট মাস পার হয়ে যাবার পর যথাক্রমে স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরাতে কিংবা বোতল ছাড়িয়ে ঝিনুক-বাটি ধরাতে এ-ধরনের সমস্যা বিশেষ দেখা দেয় না।

প্রসূতির স্তন একেবারে শুকনো হলে বা স্তনে দুধের রীতিমতো ঘাটতি থাকলে শিশুকে স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরানো অনেক সহজ হয়ে পড়ে। কেননা মায়ের বুকে দুধ না পেলে নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই শিশু এক্ষেত্রে আপনা থেকে বোতল ধরবে। স্তন্যদান না করার জন্যে প্রসূতিকেও এ-সব ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়তে হয় না। যথা, সাধারণত তাঁকে বুক শক্ত করে বেঁধে রাখতে হয় না, দুধ, জল ইত্যাদি খাওয়াও কমাতে হয় না। স্তন্যদান বন্ধ করার জন্যে যদি বুকে অল্পস্বল্প দুধ কখনো-সখনো জমেও যায়, প্রয়োজনমতো মাঝে মাঝে শিশুকে দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে স্তন দিলেই সে অস্বস্তির লাঘব হয়। তবে প্রসূতির বুকে যদি অপেক্ষাকৃত বেশি দুধের যোগান থেকে

থাকে তাহলে তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি সময় নিয়ে শিশুকে স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরাতে পারেন। এরকম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে পালটে পালটে একবার করে স্তন ও তার পরের বার বোতল এইভাবে সারা দিন দেওয়া যেতে পারে। অতঃপর দিন দুই-তিন এইভাবে চলার পর প্রসূতি যদি দেখেন যে এ-ব্যবস্থায় বুকে ঘন ঘন দুধ জমে অস্বস্তির সৃষ্টি করছে না, তাহলে তিনি এরপর আরো দ্রুত শিশুকে স্তন ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

অনেক সময় প্রসূতির বুকে যথোপযুক্ত দুধের জোগান থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো কারণে—যেমন, তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা অন্য কোনো কারণে—শিশুকে হঠাৎ স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরাতে হয়। প্রসূতির অসুখ অবশ্য অল্প-স্বল্প ধরনের হলে এভাবে স্তন ছাড়ানোর প্রয়োজন সাধাবণত দেখা দেয় না। তবে এ-ব্যাপারে নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনামতো না চলে, অসুখ হলেই (তা সে যে-কোনো অসুখই হোক না কেন) প্রসূতির উচিত ইতিকর্তব্য সম্পর্কে ডাক্তারবাবুব সঙ্গে পরামর্শ করা। যাই হোক, হঠাৎ এইভাবে স্তন্যদান বন্ধ কবে দেওয়ার ফলে বুকে অতিবিক্ত দুধ জমে যাওয়ার দরুন প্রসূতির পক্ষে রীতিমতো অসুবিধা ভোগ করা স্বাভাবিক। এই অসুবিধা দূব করাব নানাবিধ উপায় আছে— যেমন, দুধ, জল ইত্যাদি খাওয়া কমিয়ে দেওয়া, শক্ত করে বুক বেঁধে রাখা, বুকে আইস-ব্যাগ প্রয়োগ ইত্যাদি। তবে এই অস্বস্তি দূর করার অপেক্ষাকৃত ভালো উপায় (আগেই আলোচনা করা হয়েছে) হচ্ছে ব্রেস্ট-পাম্পের সাহায্যে কিংবা হাত দিয়ে গেলে স্তন থেকে অতিরিক্ত দুধ বের করে দেওয়া। এভাবে নিয়মিত দুধ বের করে ফেলেও পুরো উপকার না পেলে অবশ্য প্রসূতি ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো ও তাঁর সাহায্যে কয়েকদিন ধরে কয়েকটা ইঞ্জেকশন নিতে পারেন। এতে তাঁর বুকে দুধের সরবরাহ নিশ্চয়ই কমে যাবে।

এছাড়া শিশুকে আচমকা স্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরানোর সমস্যাও নানাবিধ। একদিকে শিশু যেমন তার খাওয়াব বীতি পরিবর্তনে

আপত্তি করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি প্রসূতি কিংবা শিশুর অন্য কোনো তত্ত্বাবধায়িকার পক্ষে বোতলের জন্যে দুধ তৈরির নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। বোতলের দুধ দু-ধরনের হতে পারে : এক খাঁটি গোরুর দুধ, আর নয়তো কৌটোর গুঁড়ো দুধ। তবে বোতলে করে এ-ধরনের দুধ শিশুকে খাওয়াতে হলে যিনি শিশুর দেখাশোনা করবেন তাঁকে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুসারে ঠিকমতো চলতে হবে। কেননা, প্রথমত, শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খাওয়ানোর নিয়ম ও তার খাবারের পরিমাণও বদলে যায়। দ্বিতীয়ত, সব শিশুই বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে সমানভাবে বেড়ে ওঠে না। তৃতীয়ত, বোতলের দুধ-খাওয়া শিশু স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশুর চেয়ে নানাকারণে বেশি অসুখে ভুগে থাকে, ইত্যাদি।

শিশুকে হঠাৎ মাতৃস্তন ছাড়িয়ে বোতল ধরাতে হলে তার জন্যে খাঁটি গোরুর দুধের ব্যবস্থা করাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। শিশুর ওজন, বয়স, পেটের অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে পরিমাণমতো খাঁটি গোরুর দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে ও তার সঙ্গে চিনি যোগ করে ওই মেশাল জিনিসটা ভালো করে আগুনে ফুটিয়ে নিতে হবে তারপর ওই তৈরি দুধের সমস্তটা মেপে দেখতে হবে। দুধের পরিমাণ মোট যতটা দাঁড়াবে তা থেকে এক চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ) বাদ দিতে হবে এবং সমপরিমাণ পরিষ্কার জল ফুটিয়ে নিয়ে সেটুকু ওই দুধের সঙ্গে যোগ করতে হবে। এখন কয়েক মিনিট দুধটা ঠাণ্ডা করে বোতলে ভরে শিশুকে খেতে দিতে হবে। এইভাবে, হঠাৎ পুরোপুরি বোতল-ধরানো শিশুকে, অন্ততপক্ষে প্রথম তিন-চার দিন, অতিরিক্ত জল-মেশানো পাতলা-করা গোরুর দুধ খেতে দিতে হবে। যদি দেখা যায় এটা সে সহজে হজম করতে পারছে, তাহলে কয়েক দিন পর দুধে আর ওই এক-চতুর্থাংশ গরম জল মেশানোর দরকার হবে না (বোতলের দুধ তৈরি সম্পর্কে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় বিস্তৃততর আলোচনা করা হচ্ছে)।

বোতলের দুধ

আগেই বলেছি, বোতলের দুধ দু-ধরনের হতে পারে। এক খাঁটি গোরুর দুধ, দুই, কৌটোজাত গুঁড়ো দুধ। এই দুই ধরনের দুধের সঙ্গে পরিমাণমতো জল ও চিনি মেশালে সেই মিশ্রিত জিনিসটা অনেকখানি স্তনদুগ্ধের কাছাকাছি দাঁড়ায়।

এই বাইরের দুধে রোগের বীজাণু সহজে বাড়তে পারে ও সেই বীজাণু দুধের সঙ্গে শিশুর দেহে প্রবেশ করে রোগবিস্তারও করতে পারে। এ-কারণে বোতলের দুধ তৈরি করার সময় দুধটা ভালো করে ফুটিয়ে জ্বাল দিয়ে নিতে হবে (গোরুর দুধের বেলায়), কিংবা তার সঙ্গে ফুটন্ত গরম জল মিশিয়ে গুলে নিতে হবে (কৌটোর দুধের বেলায়)। তাছাড়া শিশুর দুধ তৈরির ও খাওয়ানোর যাবতীয় বাসনপত্র, হাঁড়ি বা ডেকচি, স্যসপ্যান, বাটি বা কাপ, কাচের গ্লাস, চামচে, ফিডিং বট্‌ল, রবারের চুষি, দুধ মাপার মেজার গ্লাস, ফানেল বা চোঙা, ছাঁকনি ইত্যাদি প্রত্যেক বার দুধ তৈরির আগে সাবধানে ভালো ভাবে গরম জলে ফুটিয়ে কিংবা ধুয়ে নিতে হবে। প্রসূতি বা অন্য কেউ যিনি শিশুর দুধ তৈরি করবেন, তাঁকেও প্রতিবাব সাবান দিয়ে গরম জলে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

দুধ তৈরির প্রক্রিয়া—বোতলের দুধ তৈরি শুরু করার আগে স্বভাবতই বাসনপত্রের বিশোধন-পর্ব।

প্রথমেই ফিডিং বট্‌ল ও তার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম বিশোধন করার তোড়জোড় করতে হবে। ফিডিং বট্‌লের মধ্যে অল্প কিছুটা গরম সাবান-জল পুরে বোতল-ধোয়া বুরুশ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোতলের ভেতরটা ভালো করে পবিষ্কাব করা দরকার। অতঃপর ওই গরম জলই বোতলে পুরে ঝাকিয়ে ঝাকিয়ে বোতল ধুয়ে ফেলতে হবে। ওই একই ভাবে রবারের চুষিও বিশোধন করে নিতে হবে। সম্ভব হলে (অর্থাৎ খাদ্য-প্রস্তুতকারিণীর সময় ও ধৈর্যে কুলোলে এবং ফিডিং বট্‌লটি যথেষ্ট তাপসহনশীল হলে) এর পর একটি ঝকঝকে পরিষ্কার

অ্যালুমিনিয়মের ডেকচিতে জল ধরে, তার মধ্যে ওই চুষিটি ও ফিডিং বট্লটি ডুবিয়ে ঢাকা দিয়ে অন্তুতপক্ষে পাঁচ মিনিট ধরে বোতলসুদ্ধ ওই ডেকচির জল ফোটাতে হবে। অতঃপর ডেকচি নামিয়ে সবকিছু জলের মধ্যে রাখা অবস্থাতেই ঠাণ্ডা করতে হবে। কিংবা আরো ভালো হয় যদি ডেকচি নামিয়ে সবটুকু জল গড়িয়ে ফেলে দিয়ে ও ডেকচির ঢাকা খুলে রেখে বোতল ও চুষি ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়। একেবারে দুধ ভরবার সময় হলে বোতল ও চুষি ডেকচি থেকে তুলতে হবে।

ইতিমধ্যে, ফিডিং বট্ল ইত্যাদি বিশোধন ও তারপর ঠাণ্ডা করে নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, দুধ তৈরির কাজে লাগে এমন সমস্ত বাসনপত্র গরম জলে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অতঃপর অ্যালুমিনিয়মের একটি মাঝারি সাইজের ঝকঝকে পরিষ্কার স্সপ্যানে প্রয়োজন অনুযায়ী (অর্থাৎ শিশুর ওজন, বয়স, হজমশক্তি ইত্যাদি বিবেচনা করে ডাক্তারবাবু তাকে প্রতিবার যে-পরিমাণ দুধ কিংবা গুঁড়ো দুধ, জল ও চিনি সহযোগে খাওয়াতে বলবেন সেই পরিমাণে) দুধ ও জল ঢেলে মিশিয়ে নিতে হবে ও তারপর সেই অনুপাতে চিনি চামচে দিয়ে ওই তৈরি দুধেব মধ্যে গুলে নিতে হবে। অতঃপর আবো আউন্স দেড়-দুই জল ওব মধ্যে ঢেলে দিয়ে (তা না হলে ফোটানোর সময় খানিকটা দুধ ও জল উবে যাবে ও পরে মোট দুধের পবিমাণে কম পড়বে) সমস্ত জিনিসটা ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। এই দুধ অন্তুতপক্ষে তিন মিনিট ধরে জ্বাল দিতেই হবে। এর পর স্সপ্যানটি আগুন থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা জলে-ভর্তি কোনো একটা বড়ো গামলার মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে। দুধ খানিকটা ঠাণ্ডা হলে তারপর ফিডিং বট্লে ঢালা ভালো। শিশুকে গোরুর দুধের বদলে কৌটোর গুঁড়ো দুধ খাওয়াতে হলে দুধ তৈরির প্রক্রিয়ায় সামান্য অদলবদল করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথমে স্সপানে পরিমাণমতো (অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে দু-এক আউন্স বেশি) জল ও তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিনি মিশিয়ে

নিয়ে প্রথম ধরনের দুধ তৈরির মতোই মিনিট তিনেক ফোটাতে হবে। অতঃপর স্সপানটি নামিয়ে ওই ফুটন্ত জলের মধ্যেই প্রয়োজনমতো কয়েক চামচ গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে নিতে হবে। দুধ-সুদ্ধ স্সপ্যানটি এরপর ঠাণ্ডা জলের গামলায় বসানো যেতে পারে। এইভাবে বোতলের জন্যে টাটকা গোরুর দুধ কিংবা গুঁড়ো দুধ তৈরি করার সময় দুধ, জল ইত্যাদি ঠিক-ঠিক মাপার জন্যে কাচের মেজার গ্লাস (বা জলীয় পদার্থ মাপবার উপযোগী গ্লাস) ব্যবহার করা উচিত। আন্দাজে পরিমাণ ঠিক করা সব সময়ে নিরাপদ নয়। অতঃপর স্সপ্যান থেকে তৈরি গোরুর দুধ কিংবা গুঁড়ো দুধ ফিডিং বট্‌লে ঢালতে হবে। বোতলের মুখে একটি ছোট ফানেল বা চোঙা বসিয়ে এবং তার ওপর একটি ছাঁকনি ধরে স্সপ্যান থেকে বোতলে দুধ ঢালা আবশ্যক। বোতলে দুধ ঢালার পর (যদি তার গায়ে দুধ মাপার দাগ দেওয়া থাকে তাহলে) আরো একবার মোট দুধের পরিমাণ দেখে নেওয়া ভালো। অতঃপর বোতলের মুখে রবারের চুষি লাগাতে হবে। ফিডিং বট্‌লে দুধ ঢালা ও চুষি লাগানোর কাজটি খুব সন্তর্পণে করা আবশ্যক, যাতে বোতলের মুখে ও চুষির ওপর দিকটায় হাত না লাগে। মনে রাখা দরকার, শিশুকে অযথা পেটের অসুখ ও অন্যান্য রোগভোগের হাত থেকে বাঁচাতে হলে বোতলের এই দুধ তৈরির ব্যাপারে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

ফিডিং বট্‌লের মুখে রবারের চুষি লাগানোর পর এবার শিশুকে বোতল খেতে দেওয়ার পালা। কিভাবে শিশুকে বোতল দিতে হয়, সে-সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি। আপাতত এইটুকু জেনে রাখতে হবে যে বোতলের দুধের বা বোতলের উত্তাপ একেবারে প্রসূতির নিজের শরীরের উত্তাপের সমান না-হওয়া পর্যন্ত শিশুকে বোতল খেতে দেওয়া চলবে না। এজন্যে দরকার হলে ফিডিং বট্‌লের মধ্যেই দুধ উপযুক্তরকম ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।

শিশুকে খাওয়ানো শেষ হবার পর ফিডিং বট্‌ল আর রবারের চুষি

ফের ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে এবং তারপর ডেকচির গরম জলে ফোটাতে হবে। অতঃপর ছুটি জিনিসই ওই ডেকচির গরম জলে ডুবিয়ে রেখে দিতে হবে।
শিশুকে বোতলের দুধ খাওয়াতে হলে ও সে-কারণে কৌটোর গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করতে হলে প্রতিবার খাওয়ানোর সময় দুধ তৈরি করে নেওয়াই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তবে সে-দুধ গোরুর হলে দিনের মধ্যে একবার ভালো করে জ্বাল দিয়ে একটি পরিষ্কার হাঁড়ি কিংবা ডেকচিতে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। তারপর প্রতিবার ব্যবহারের সময় তা থেকে ঢেলে গরম করে নিলেই চলবে।

বোতলের দুধের পরিমাণ নির্ণয়—ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে শিশুকে যে-কোনো সময়ে বোতলেব দুধ খাওয়াতে হলে প্রসূতিকে অবশ্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিংবা তাঁর ডাক্তারবাবুর নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে। এ-ব্যাপারে কোনোরকম গাফিলতি করলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। শিশুর দেহের ওজন, বয়স, হজম-শক্তি, বিকাশের বিশেষ ধরন ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞরাই শিশুর দৈনন্দিন খাদ্যের মোট পরিমাণ ও দিনের মধ্যে প্রত্যেকবারের বিশেষ পবিমাণ, খাওয়ার দৈনিক সময়-সূচী ইত্যাদি সব কিছু যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করে দেবেন।
তবু, আমবা জানি, এমন অনেক প্রসূতি আছেন যাঁদের পক্ষে সব সময়ে ডাক্তারবাবু ইত্যাদির সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ-সুবিধা জোটে না। তাঁরা কি করবেন? এ-ব্যাপারে আন্দাজে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেওয়ার চেয়ে এঁদের সাধ্যমতো সাহায্য করা অপেক্ষাকৃত ভালো বলে আমরা মনে করি। এ-কারণে এবং সাধারণভাবে সমস্ত প্রসূতিরই জ্ঞাতার্থে পরবর্তী ২৮৩-২৮৫ পৃষ্ঠায় একটি পরিমাণ-তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে সাধারণভাবে শিশুর ওজন অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করার চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য এটি একটি সাধারণীকৃত ও মোটামুটি হিসেব; বিশেষ

বিশেষ শিশুর প্রয়োজনের সঙ্গে এ-তালিকা হুবহু না মিলতেও পারে। তবে সচেষ্ট হলে প্রসূতি এ-থেকে তাঁব শিশুর খাদ্যের বিশেষ পরিমাণটি নির্ণয় করে নিতে পাববেন। তাঁর শিশুর ওজনেব সঙ্গে তালিকায় নির্দিষ্ট খাদ্যেব পরিমাণেব অনুপাত না মিললে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী এক পাউণ্ড বেশি কিংবা কম ওজনের শিশুর খাদ্যেব পবিমাণ নিযে পরীক্ষা কবে দেখতে পাবেন।

পুবো তালিকাটি 'ক', 'খ' ও 'গ'-সংখ্যক তিনটি কলমে ভাগ কবে দেখানো হযেছে (পৃঃ ২৮৩-২৮৫ দেখুন)। 'ক'-সংখ্যক কলমে শিশুব ওজন অনুযাযী খাদ্যের বিভিন্ন পবিমাণকে ১, ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কলমে শিশুর ওজন অনুযাযী প্রয়োজনীয় খাদ্যেব আনুমানিক মোট দৈনিক পরিমাণ নির্দেশ কবা হয়েছে। এই পবিমাণটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনেব চেযে বেশি বই কম হবে না। তবে যদি কোনো শিশুব বেলায় এটি কম বলে প্রতীয়মান হয, তাহলে তাব জন্যে পববর্তী উচ্চতর সংখ্যক পবিমাণ পবীক্ষা কবে দেখা যেতে পাবে।

শিশুব খাদ্যের এই বিভিন্ন দৈনিক পবিমাণ কিভাবে তিন কিংবা চার ঘণ্টা অন্তব খাওযানোব সময-সূচী অনুসাবে ৬ কিংবা ৭ ভাগে ভাগ কবা যায পববর্তী 'খ'-সংখ্যক কলমে তাই নির্দেশ কবা হয়েছে। ধবা যাক, একটি ৬ পাউণ্ড ওজনেব শিশু দৈনিক মোট ১৫ আউন্স জল-মেশানো দুধ খাচ্ছে। খুব সম্ভব এ-শিশুটি দিনে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর ও বাত্রে ৪-ঘণ্টা অন্তব খেতে চাইবে। অর্থাৎ এব খাওয়ার সময়-সূচী দাঁড়াবে মোটামুটি এই বকম : ভোব ৬টা, সকাল ৯টা, দুপুব ১২টা, দুপুব ৩টে, সন্ধ্যা ৬টা, বাত্রি ১০টা ও সম্ভবত বাত্রি ২টো। তাহলে এ-শিশুব প্রতিবাবেব খাওয়াব জন্যে দবকাব হবে ওই ১৫ আউন্সকে সমান ৭ ভাগ কবলে যা দাঁডায় তাই, অর্থাৎ, ২ আউন্সের অল্প কিছু বেশি। এখন, যদি ওই শিশু রাত্রেও ৩ ঘণ্টা অন্তব খেতে চায় তাহলে অবশ্য ওই ১৫ আউন্সকে সমান ৮ ভাগ কবতে হবে, অর্থাৎ, তাহলে গডে প্রতিবাব দাঁড়াবে ১⅞

আউন্স করে। তেমনি শিশুটি যদি দিনে রাত্রে সব সময়েই ৪ ঘণ্টা অন্তর খেতে চায় (অবশ্য এর সম্ভাবনা খুবই কম), তাহলে ওই ১৫ আউন্স দুধকে কিন্তু ৭ কিংবা ৮ ভাগের জায়গায় সমান ৬ ভাগ করতে হবে এবং প্রতিবার শিশুকে ২½ আউন্স করে দুধ খেতে দিতে হবে। তবে এই সমান ভাগ করার কথাটা সাধারণভাবেই বলা হচ্ছে। যদি কোনো শিশু দিনের মধ্যে একবার কি দু-বার অন্যান্য বারের চেয়ে পরিমাণে বেশি খেতে চায়, তাহলে তাকে তাই দিতে হবে বৈকি।

যাই হোক, এইভাবে শিশুর প্রতিবারের খাওয়ার, অর্থাৎ জল-মেশানো দুধের, মোট পরিমাণটা নির্ধারণ করা যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রত্যেকবারেব খাবাবেব মধ্যে দুধ, জল ও চিনির আনুপাতিক পরিমাণ কী? অর্থাৎ প্রতিবাব কতটা দুধে ঠিক কতটা জল মেশাতে হবে এবং সেই মোট পরিমাণের সঙ্গে চিনিই বা মেশাতে হবে কতটা? এ-ব্যাপাবে প্রসূতির ডাক্তারবাবুই অবশ্য তাঁকে সবচেয়ে ভালো পরামর্শ দিতে পাবেন। তবু, সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিয়ম হল এই : প্রথমত, গোরুব দুধ ও কৌটোর গুঁড়ো দুধের বেলায় নিয়ম হল আলাদা আলাদা। দ্বিতীয়ত, গোরুর দুধের বেলায় শিশুর বয়স অনুসাবে মিশ্রণের নিয়মও হবে বিভিন্ন। কৌটোর দুধ খুব ঘন হয় বলে প্রতিবাব যতটা বা যত আউন্স গুঁড়ো দুধ নেওয়া হবে তার ডবল পরিমাণ জল সে-দুধের সঙ্গে মেশাতে হবে। অতএব, যদি ধরা যায় যে এককেবারে ৬ আউন্স দুধ তৈরি করতে হবে, তাহলে প্রতিবার ২ আউন্স গুঁড়ো দুধের সঙ্গে ৪ আউন্স জল মেশাতে হবে। এই রকম, ৪ আউন্স দুধ তৈরি করতে হলে ১⅓ আউন্স গুঁড়ো দুধের সঙ্গে ২⅔ আউন্স কি তার কিছু বেশি জল মেশাতে হবে। দুধের মোট পরিমাণ আরো কম হলে এই উপরোক্ত অনুপাত যতদূর সম্ভব নির্ণয় করে আন্দাজমতো দুধে-জলে মেশাতে হবে। অল্প পরিমাণ দুধের বেলায় দুধ আর জলের আনুপাতিক পরিমাণ হয়তো একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলবে না।

কিন্তু এত অল্প পরিমাণ ওজনের ভগ্নাংশ প্রভৃতির পক্ষে অঙ্ক কষে বের করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি তার প্রয়োজনও যৎসামান্য। কৌটোর গুঁড়ো দুধের বেলায় এই তো গেল ব্যবস্থা। এছাড়া গোরুর দুধের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স অনুসারে দুধ আর জলের আনুপাতিক পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন, শিশুর জন্মের পর থেকে প্রথম পনেবো দিন (বোতলের দুধ দিতে হলে) যতটা গোরুর দুধ দেওয়া হবে তার সঙ্গে সেই একই পরিমাণ জল মেশাতে হবে। অতঃপর পনেবো দিন থেকে শিশুব বয়স চার মাস হওয়া পর্যন্ত প্রতি দু-ভাগ দুধে এক ভাগ জল মেশাতে হবে। এই রকম, শিশুর চার থেকে ছ-মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি তিন ভাগ দুধে এক ভাগ জল মেশাতে হয় ও তারপর আব সাধারণত দুধে জল মেশানোর দরকার পড়ে না।

দুধে জল মেশানোর নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা কবা গেল। অতঃপর এই তৈরি দুধে চিনি মেশানোব রীতি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। এক্ষেত্রে শুধু এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে এক ভাগ দুধে সমপরিমাণ জল কিংবা দু-ভাগ দুধে এক ভাগ জল মেশানোর পর যে-ধরনের দুধ তৈবি হবে তাব প্রতি তিন আউন্স বা দেড় ছটাক দুধে চায়েব চামচেব এক চামচ চিনি মেশাবেন। এই বকম, প্রতি ছ-আউন্স বা তিন ছটাক দুধে ওই চামচের দু-চামচ চিনি মেশানো দরকার। তবে চিনি ঠিক চামচভর তুললেই চলবে, বেশি উঁচু উঁচু করে চিনি নেওয়াব দরকাব নেই। পবিশেষে, তৈবি দুধে দুধ আর জলের আনুপাতিক পরিমাণ উপরোক্ত-রকম না হলে, অর্থাৎ জলের অনুপাত এব চেয়ে কম হলে, প্রতি চাব আউন্স তৈরি দুধে এক চায়ের চামচ চিনি দিলেই চলবে।

অতঃপর পরবর্তী তালিকার 'গ'-সংখ্যক কলমে গুঁড়ো দুধের পরিমাণ ও ওই দুধ তৈরির পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।

'ক'-সংখ্যক কলমে ১ থেকে ৮ সংখ্যা দিয়ে পরপর পরিমাণ-নির্দেশক আটটি ঘর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই আটটি ঘরে তৈরি

দুধের মোট পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যাওয়া হলেও, দুধ আর জল মিশ্রণের আনুপাতিক পরিমাণ প্রতিক্ষেত্রেই এক রাখা হয়েছে। শিশুর ওজন জন্মের পর থেকে ক্রমে ক্রমে বেড়ে প্রায় দশ পাউণ্ড হওয়া পর্যন্ত তার খাদ্যের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে যেতে হয়। তবে তখনও পর্যন্ত দুধ আর জল মিশ্রণের আনুপাতিক পরিমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক রকম রাখলে চলে। অতঃপর, ওই দশ পাউণ্ড ওজনের শিশু দৈনিক মোট ২৭ থেকে ৩০ আউন্স পরিমাণ তৈরি-দুধ গ্রহণ করতে শুরু করার পর দুধের মোট পরিমাণ আর বাড়ানোর দরকার করে না। প্রয়োজন হলে, তারপর, দুধের মোট পরিমাণ না বাড়িয়ে প্রতিবারের খাবারে দুধের আনুপাতিক পরিমাণ বাড়িয়ে জলের আনুপাতিক পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের তালিকায় অবশ্য দুধ আর জলের আনুপাতিক পরিমাণের এই হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়নি। এরকম ক্ষেত্রে ডাক্তার-বাবুর পরামর্শ নেওয়াই সব থেকে যুক্তিযুক্ত। তিনিই শিশুর বিশেষ বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করে এ-সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশ দেবেন। শিশুদের ওজন দশ পাউণ্ড ছাড়িয়ে যাবার পরও তারা খুব সম্ভবত আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে খেতে চাইবে, কিন্তু প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই তাদের দৈনিক দুধেব মোট পরিমাণ ওই ২৭ থেকে ৩০ আউন্স (বা চোদ্দ-পনেরো ছটাক)-এর বেশি বাড়ানো উচিত হবে না। কেননা, দুধ এব চেয়ে বেশি খেতে দিলে শিশুর পেটে ভাত, সুজি ইত্যাদি শক্ত বা অতরল খাদ্য গ্রহণের জায়গা থাকবে না।

জন্মের পর প্রথম মাস দুই শিশুর তরফ থেকে খাদ্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানোর জন্যে বেশ ঘন ঘন ও নিয়মিতভাবেই তাগিদ আসার সম্ভাবনা। শিশুর ওজনও এই সময়টায় সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অতঃপর, ওই মাস দুয়েকের পর থেকে, শিশু ক্রমশ বেশি-বেশি সময় ধরে একই পরিমাণ খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকতে শুরু করে। শিশুর বয়স পাঁচ কিংবা ছ-মাস হবার পর অবস্থা অনুসারে তাকে

ক ক্রমিক পরিমাণ-নির্দেশক কলম	খ মোট পরিমাণকে ভগ্নাংশে ভাঙার পদ্ধতি	গুঁড়ো দুধ থেকে দুধ তৈরির আনুপাতিক পরিমাণ নির্দেশ
মোট ১২॥ আউন্স দুধ। ৫ পাউণ্ড ওজনের শিশুর পক্ষে সাধারণত পেটভরা খাবার। তবে এতে পেট না ভরলে ২-সংখ্যক পরিমাণ খাইয়ে দেখুন।	শিশু দিনেরাত্রে মোট ৭ বার (দিনে ৩ ঘণ্টা ও রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর) খেলে প্রতিবার বোতলে ১$\frac{৩}{৪}$ আউন্স করে, কিংবা দিনেরাত্রে মোট ৬ বার (দিনে-রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর) খেলে প্রতি বোতলে ২ আউন্স করে। এবং বাকিটুকু দুধ কোনো একবার বেশি দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া।	মোট ১২॥০ আউন্স দুধের জন্যে: গুঁড়ো দুধ ৪ আউন্স; জল ৮॥ আউন্স; চিনি { মাঝারি সাইজ চামচের এক চামচ }
মোট ১৫ আউন্স দুধ। ৬ পাউণ্ড ওজনের শিশুর পক্ষে সাধারণত পেটভরা খাবার। তবে এতে পেট না ভরলে ৩-সংখ্যক পরিমাণ খাইয়ে দেখুন।	শিশু ৭ বার খেলে প্রতি বোতলে ২ আউন্স করে (বাকিটুকু দু বার কি তিনবারে বেশি দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া), কিংবা ৬ বার খেলে প্রতি বোতলে ২॥০ আউন্স করে।	মোট ১৫ আউন্স দুধের জন্যে. গুঁড়ো দুধ ৫ আউন্স; জল ১০ আউন্স; চিনি { মাঝারি এক চামচ ও চায়ের এক চামচ }
মোট ১৭॥০ আউন্স দুধ। ৭ পাউণ্ড ওজনের শিশুর পক্ষে সাধারণত পেটভরা খাবার। তবে এতে পেট না ভরলে ৪-সংখ্যক পরিমাণ খাইয়ে দেখুন।	শিশু ৭ বার খেলে প্রতি বোতলে ২॥০ আউন্স করে, কিংবা ৬ বার খেলে প্রতি বোতলে ২$\frac{৩}{৪}$ আউন্স করে ও বাকিটুকু দু-তিন বারে বেশি খাইয়ে পুষিয়ে দেওয়া, কিংবা ৫ বার (দিনে রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর খেলেও রাত্রি ২টোর	মোট ১৭॥০ আউন্স দুধের জন্যে: গুঁড়ো দুধ ৬ আউন্স; জল ১২ আউন্স; চিনি { মাঝারি এক চামচ ও চায়ের দুই চামচ }

ক ক্রমিক পরিমাণ-নির্দেশক কলম	খ মোট পরিমাণকে ভগ্নাংশে ভাগার পদ্ধতি	গ গুঁড়ো দুধ থেকে দুধ তৈরির আনুপাতিক পরিমাণ নির্দেশ
	খাওয়া বাদ দিলে) খেলে প্রতি বোতলে ৩॥০ আউন্স করে।	প্রয়োজন না হলে বাড়তি আধ আউন্স দুধ ফেলে দিতে হবে।
৪ মোট ২০ আউন্স দুধ। ৮ পাউণ্ড ওজনের শিশুর পক্ষে সাধারণত পেটভরা খাবার। তবে এতে পেট না ভরলে ৫-সংখ্যক পরিমাণ খাইয়ে দেখুন।	শিশু ৬ বার খেলে প্রতি বোতলে ৩$\frac{১}{৪}$ আউন্স করে, কিংবা ৫ বার খেলে ৪ আউন্স করে।	মোট ২০ আউন্স দুধের জন্যে : গুঁড়ো দুধ ৭ আউন্স জল ১৪ আউন্স চিনি { মাঝারি চামচের দুই চামচ প্রয়োজন না হলে বাড়তি এক আউন্স দুধ ফেলে দিতে হবে।
৫ মোট ২২॥০ আউন্স দুধ। ৮ থেকে ৯ পাউণ্ড ওজনের শিশুর পক্ষে সাধারণত পেটভরা খাবার। তবে এতে পেট না ভরলে ৬-সংখ্যক পরিমাণ খাইয়ে দেখুন।	শিশু ৬ বার খেলে প্রতি বোতলে ৩$\frac{৩}{৪}$ আউন্স করে, কিংবা ৫ বার খেলে প্রতি বোতলে ৭॥০ আউন্স করে।	মোট ২২॥০ আউন্স দুধের জন্যে : গুঁড়ো দুধ ৭॥০ আউন্স জল ১৫ আউন্স চিনি { মাঝারি দুই চামচ ও আধ চায়ের চামচ
৬ মোট ২৪ আউন্স দুধ। ৯ থেকে ১০ পাউণ্ড ওজনের শিশুর পক্ষে সাধারণত পেটভরা খাবার। তবে এতে পেট না ভরলে ৭-সংখ্যক পরিমাণ খাইয়ে দেখুন।	শিশু ৬ বার খেলে প্রতি বোতলে ৪ আউন্স করে, কিংবা ৫ বার খেলে বোতল প্রতি ৪$\frac{৩}{৪}$ আউন্স করে কিংবা ৪ বার খেলে প্রতি বোতলে ৬ আউন্স করে।	মোট ২৪ আউন্স দুধের জন্যে : গুঁড়ো দুধ ৮ আউন্স জল ১৬ আউন্স চিনি { মাঝারি দুই চামচ ও চায়ের এক চামচ

ক ক্রমিক পবিমাণ-নির্দেশক কলম	খ মোট পবিমাণকে ভগ্নাংশে ভাঙার পদ্ধতি	গ গুঁড়ো দুধ থেকে দুধ তৈবির আনুপাতিক পরিমাণ নির্দেশ
৭ মোট ২৭ আউন্স দুধ। ১০ পাউণ্ড ওজনের শিশুর পক্ষে সাধারণত পেটভবা খাবাব। তবে এতে পেট না ভরলে ৮ সংখ্যক পবিমাণ খাইয়ে দেখুন।	শিশু ৬ বার খেলে প্রতি বোতলে ৪৷৷০ আউন্স করে, কিংবা ৫ বাব খেলে প্রতি বোতলে প্রায় ৫৷৷০ আউন্স করে, কিংবা ৪ বাব খেলে বোতলপ্রতি ৬ৡ আউন্স করে।	মোট ২৭ আউন্স দুধের জন্যে. গুঁড়ো দুধ ৯ আউন্স জল ১৮ আউন্স চিনি { মাঝারি দুই চামচ ও চায়ের দুই চামচ
৮ মোট ৩০ আউন্স দুধ। ১০ পাউণ্ড ওজনেব শিশুব পক্ষে বীতি-মতো পেটভবা খাবাব। এতে পেট না ভবলে শিশুকে আবো বেশি খেতে দেবেন কিনা কিংবা দুধেব মোট পবিমাণ আব না বাড়িয়ে জল-মেশানো তৈরি-দুধে দুধেব আনুপাতিক পবিমাণ বাড়িয়ে এবং ভাত, সুজি ইত্যাদি শক্ত খাবার দিয়ে শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন কিনা আপনার ডাক্তারবাবুকে সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন।	শিশু ৬ বার খেলে প্রতি বোতলে ৫ আউন্স কবে, কিংবা ৫ বার খেলে বোতল প্রতি ৬ আউন্স কবে, কিংবা ৪ বাব খেলে প্রতি বোতলে ৭৷৷০ আউন্স কবে।	মোট ৩০ আউন্স দুধের জন্যে গুঁড়ো দুধ ১০ আউন্স জল ২০ আউন্স চিনি { মাঝারি তিন চামচ

ভাত, সুজি ইত্যাদি অতরল খাদ্য ধরানো বাঞ্ছনীয়। বাড়ন্ত গড়নের শিশু হলে এমন কি চার কিংবা তিন মাস পূর্ণ হবার পরই বাজার থেকে কেনা কৌটোজাত 'ফ্যারেক্স' কিংবা ওই জাতীয় অন্য কোনো অতরল খাদ্য ধরানো যেতে পারে। অতরল খাদ্যে অভ্যস্ত হবার পর ওই খাদ্যে ক্রমশ বেশি-বেশি শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটবে। অতএব, একই সঙ্গে উপরোক্ত তালিকাভুক্ত ৭ কিংবা ৮-সংখ্যক পরিমাণ দুধ ও অতরল খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর শিশুর দুধের পরিমাণ আর বেশি বাড়ানো উচিত হবে না। তবে ওই জল-মেশানো তৈরি দুধে অতঃপর দুধের আনুপাতিক পরিমাণ বাড়ানো হবে কিনা কিংবা কতটা বাড়ানো হবে সে-সম্পর্কে প্রসূতি তাঁর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে পাবেন।

কিন্তু শিশু একটু বাড়ন্ত গড়নের হলে ও তার খাই-খাই ভাবটা একটু বেশি দেখা গেলে কী করা কর্তব্য? এ-হেন ক্ষেত্রেও শিশুর দুধের দৈনিক মোট বরাদ্দ ৩০ আউন্স বা পনেরো ছটাকের বেশি বাড়ানো উচিত হবে কিনা তা খুব ভালো করে ভেবে দেখা উচিত। এ-ধরনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যদি ডাক্তারবাবু দুধের পরিমাণ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তো ভিন্ন কথা। তা না হলে, অর্থাৎ ডাক্তারবাবু অমত করলে কিংবা তাঁর সঙ্গে পরামর্শের সুযোগ না ঘটলে চট করে দুধের পরিমাণ না-বাড়ানোই উচিত। প্রসূতির মনে রাখা দরকাব, যে-শিশু যত বেশি পরিমাণ দুধে অভ্যস্ত হয়, ভাত ইত্যাদি অতরল খাদ্যে তার অনিচ্ছা কিংবা আগ্রহের অভাব তত বেশি দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ন্ত গড়নের শিশুর বাড়তি খিদে মেটানোর উপায় অকারণে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা নয়, তার উপায় হল প্রধানত জল-মেশানো তৈরি দুধে দুধের আনুপাতিক পরিমাণ বাড়ানো ও তার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবস্থলে শিশুর চার কিংবা তিন মাস বয়স থেকেই তাকে অতরল খাদ্য ধরানো।

বোতলে দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি—বোতলে দুধ ভরা ও বোতলের

মুখে রবারের চুষি লাগানোর পর শিশুকে দুধ খাওয়ানোর পালা। খাওয়ানোর আগে প্রথমেই দেখে নিতে হবে দুধ কতটা গরম আছে। প্রায় সব শিশুই একেবারে কুসুম-কুসুম গরম (বা শরীরের উত্তাপের সমান গরম) দুধ পছন্দ করে। বোতলটিকে নিচের দিকে মুখ করে উল্টে প্রসূতি নিজেব হাতেব নবম চামড়াব (হাতের তেলোয় নয়) ওপর কয়েক ফোঁটা দুধ ফেলে উত্তাপ পবীক্ষা কবে দেখতে পারেন। হাতে গরম লাগলে বুঝতে হবে শিশুর পক্ষে দুধ তখনো অতিরিক্ত বেশি গরম আছে। আবাব একেবাবে কনকনে ঠাণ্ডা লাগলেও শিশু সে-দুধ পছন্দ না কবতে পাবে। অতএব বোতলে-ভরা দুধ অতঃপর প্রয়োজনমতো ঠাণ্ডা কিংবা গবম কবে নিতে হবে।

শিশুকে বোতলেব দুধ খাওয়াতে হলে ববাবেব চুষিব ছিদ্রের মাপ ঠিকমতো হওয়া দবকাব। চুষিব ছিদ্র যদি বেশি ছোট হয় তাহলে শিশু দুধ বেশি পাবে না, টানতে কষ্ট হবে এবং চুষি টানতে টানতে সহজেই হাঁপিয়ে পড়ায় শিশু হয়তো সবটুকু দুধ খাবে না বা খেতে পাববে না। এইভাবে বেশি দিন চললে পুষ্টিব অভাবে শিশু আস্তে আস্তে রোগা হয়ে যাবে। উল্টোদিকে, ছিদ্র বেশি বড়ো হলে শিশুর মুখে দুধেব ধাবা বেশি জোবে নামবে। ফলে তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে শিশুব বিষম লাগতে পাবে, কিংবা তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বেশি-বেশি হাওয়া গিলে ফেলাব দরুন শিশুব পেটে বেদনা ও গবহজম দেখা দিতে পারে। তাছাড়া অতিবিক্ত তাড়াতাড়ি খেতে অভ্যস্ত হলে শিশু খাবাব সময় আশ মিটিয়ে চোষাব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে, ফলে তাব আঙুল-চোষাব বাতিক দেখা দিতে পাবে। যাই হোক, চুষিব ছিদ্রেব মাপ ঠিকমতো হল কিনা বোঝাব উপায় হল, বোতলটিকে নিচুমুখো কবে উল্টে ধবা। এইভাবে বোতলটিকে ধরা ও অল্পস্বল্প ঝাঁকুনি দেওয়াব ফলে দুধ যদি ফোঁটায়-ফোঁটায় নামতে থাকে তাহলে ছিদ্রেব মুখ ঠিকই হয়েছে বলে মনে করতে হবে। তবে দুধ ফোঁটায়-ফোটায় না নেমে রীতিমতো ধারায় নামলে কিংবা অতিরিক্ত পবিশ্রম কবে বার বার জোরে জোরে

ঝাঁকুনি দিয়ে দুধ নামাতে হলে চুষির ছিদ্র যথাক্রমে অতিরিক্ত বড়ো কিংবা ছোট হয়েছে বলে ধরতে হবে।

শিশুকে খাওয়ানো শুরু করার আগে বোতলটি ভালোমতো ঝাঁকিয়ে নিন। অতঃপর শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে খানিকটা আধবসার ভাবে বসুন ও নিজের হাতে বোতল ধরে দুধ খাওয়ান। নিজে না খাইয়ে বালিশে বোতল ঠেকা দিয়ে শিশুর হাতে বোতল ধরিয়ে দেবার অভ্যাস একেবারেই উচিত কাজ নয়। খাওয়ানোর সময় বোতলটি এতখানি কাত করে ধবা উচিত যাতে রবারের চুষিটি আগাগোড়া দুধে ভর্তি থাকে। অধিকাংশ শিশুই প্রায় মিনিট কুড়ি সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে বোতলেব সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলে (অবশ্য দুধ যদি হিসেবমতো থাকে)। তবে কেউ কেউ আবার দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাওয়াও গিলে ফেলে। পেটে এই হাওয়ার পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলে ভাব বোধ হতে থাকে, ফলে এ-ধরনের শিশুবা অনেক সময় মাঝপথেই বোতল খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ-কারণে খাওয়া বন্ধ করলে শিশুব ঢেকুব তোলাব বন্দোবস্ত করতে হয় ও তাবপব ফেব খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হয়। কোনো কোনো শিশুকে এক বোতল দুধ খাওয়াতে হলে অনেক সময় দু-বার কি তিনবার এই রকম ঢেকুব তোলাতে হয়, আবাব অনেককে বোতল শেষ করার আগে একবারও ঢেকুব তোলাতে হয় না।

যাই হোক, শিশু খাওয়া বন্ধ করলে ও খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে বলে বোধ হলে অবিলম্বে তাকে বোতল দেওয়া বন্ধ করতে হবে। জোর করে শিশুকে বেশি খাওয়ানোর চেষ্টা সব সময়েই বর্জনীয়। মনে রাখা দরকার, তার ঠিক কতখানি খাদ্যের দরকার তা শিশুই অন্য যে-কোনো লোকের চেয়ে ভালো বোঝে।

ঢেকুর তোলানোর উপায়—দুধ খাওয়ার সময় সব শিশুই কিছু-না-কিছু হাওয়া গিলে থাকে। ওই হাওয়া শিশুর পাকস্থলীতে গিয়ে জমে। কেউ কেউ দুধ খেতে গিয়ে এত বেশি হাওয়া গিলে ফেলে

যে মাঝপথেই তার পেট ফুলে ওঠে ও তাকে খাওয়া বন্ধ করতে হয়। এ-হেন অবস্থা দেখা দিলে শিশুকে খাড়া করে তুলে প্রসূতির কাঁধে শোয়াতে হবে ও এক হাতে তার পিঠের মাঝবরাবর আস্তে আস্তে মালিশ করতে কিংবা চাপড়াতে হবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে শিশু ঢেকুর তুলে পাকস্থলী থেকে হাওয়া বের করে দেবে। অনেক সময় ঢেকুর তুলতে গিয়ে শিশু এক-আধটুকু দুধও তুলে ফেলে। কোনো কোনো শিশু সহজেই ঢেকুব তোলে, আবার কারো বা ঢেকুর তুলতে বেশ দেরি হয়। ঢেকুব তুলতে দেরি দেখলে শিশুকে মাঝখানে দু-এক সেকেণ্ডের জন্যে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফের কাঁধে নিয়ে চাপড়ালে সুফল ফলে।

অতিরিক্ত হাওয়া গেলার দরুন অল্প কিছু শিশুকে খাওয়ার মাঝখানে ঢেকুব তোলাতে হলেও, সাধাবণত শিশুদেব খাওয়ার পরেই এ-ভাবে ঢেকুব তোলানোব রীতি। তবে খাওয়ানোর পব ঢেকুব তোলানোর এই বীতিটি প্রসূতির আবশ্যিকভাবে মেনে চলাই কর্তব্য। কেননা, ঢেকুব না-তুলিয়ে পেটে হাওয়াসুদ্ধ শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দিলে সে অস্বস্তি বোধ কবতে পাবে। কোনো কোনো শিশুর এ-কারণে পেটের বেদনা পর্যন্ত দেখা দেয়।

জবরদস্তি বেশি খাওয়ানো—বোতলে খাওয়ানোব সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা এই যে শিশু কতটা খাচ্ছে না-খাচ্ছে মা তা আগাগোড়াই দেখতে পান। এখন, সব শিশুই যে প্রতিবাব খাওয়ার সময় হুবহু একই পবিমাণ দুধ খায় তা নয়। এমন যথেষ্ট শিশু আছে যারা প্রতিবার ওজন কবে সমান মাপের দুধ খায় না। কিন্তু মা এ-কথাটা না-জানলে কিংবা না-বুঝলে মুশকিল হয়। শিশুকে নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে কম দুধ খেতে দেখলে তিনি মনে করেন শিশু বুঝি খাওয়া কমিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য মা যদি বুঝতে পারতেন যে ইতিপূর্বে তাঁর নিজেরই সন্তান কিংবা অন্যান্য অনেক শিশু—যারা মাতৃস্তনে অভ্যস্ত —দিনের মধ্যে প্রতিবার একই পরিমাণ দুধ খায়নি কিংবা খায় না

(তাদের মধ্যে অনেকে ভোর ছ-টায় যদি ১০ আউন্সের মতো দুধ খায় তো সন্ধ্যা ৬টায় মাত্র ৪ আউন্সের মতো খেতে তাদের বাধে না), তাহলে হয়তো তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতেন। এবং স্তন্যপায়ী শিশুকে তার প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুযায়ী যদি দুধ খেতে দেওয়া চলে, তাহলে বোতলের দুধে অভ্যস্ত শিশুকেও স্বচ্ছন্দে তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে চলতে দেওয়া যায়।

এত কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন হচ্ছে এই কারণে যে বেশ কিছু শিশুর বেলাতেই এই খাওয়ার সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। অনেক সময়ই লক্ষ্য করা যায় যে জন্মের পর প্রথম প্রথম খাদ্যে শিশুর রুচি ও ক্ষুধা বেশ স্বাভাবিক থাকে, অথচ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষুধা ও খাওয়াব ব্যাপারে তার অনিচ্ছা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর কারণ কি ? ভালো করে খোঁজখবর নিলে এ-ধরনের শিশুদের মধ্যে শতকরা নব্বুইটি ক্ষেত্রেই জানা যাবে যে জন্মের পর থেকে মায়েরা ক্রমাগত জবরদস্তি শিশুদের বেশি খাওয়ানোর চেষ্টার ফলে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। মায়েরা হয়তো মনে কবেন শিশু স্বেচ্ছায় যতটা খেতে চায় জোর করে তার চেয়ে আরো খানিকটা বেশি খাইয়ে দিলে তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। এর ফলে শিশু পরের বার তার স্বাভাবিক খাওয়ার চেয়ে একটু কম খাবেই। কেননা, দিনে মোট কতটা খেতে হবে কিংবা তাব দেহ কোন্ ধরনের খাবার কতখানি করে চায় শিশু নির্ভুলভাবে তা বুঝতে পারে। এই কারণেই তাকে জবরদস্তি বেশি খাওয়ানোর দরকার করে না, তাছাড়া এতে লাভও হয় না কিছু। বরং আগেই বলেছি আখেরে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। কেননা এর ফলে খাদ্যে ক্রমশ শিশুর অরুচি দেখা দেয় ও এমন কি সত্যিকার প্রয়োজনের তুলনায়ও সে কম খেতে শুরু করে। আর দীর্ঘকাল ধরে অক্ষুধার ব্যাপার চলতে থাকলে শিশু শেষপর্যন্ত রোগা ও ক্ষীণজীবী হয়ে পড়ে। জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দই যেন তার নষ্ট হয়ে যায়।

অবশ্য এ-কথার অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে খেতে খেতে শিশু একবার দম নেবার জন্যে থামামাত্র তার মুখ থেকে বোতল ছিনিয়ে নিতে হবে। অনেক শিশু খাওয়ার মধ্যে বারকয়েক এইভাবে থামে বা থেমে থেমে খাওয়া পছন্দ করে। তবে একবার থামার পর ফের বোতল দিতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে শিশু আর চুষতে চাইছে না তাহলে বুঝতে হবে তার পেট ভরে গেছে। তখন তাকে আর খাওয়ার জন্যে বিরক্ত করা উচিত হবে না।

অনেক সময় কোনো কোনো শিশুর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিক হতে সময় লাগে, কারো-বা হজমশক্তি অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে। এই ধরনের শিশুরা, বিশেষ করে প্রথম প্রথম, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খায়; অনেকে হয়তো প্রতিবারই বরাদ্দ দুধের অর্ধেক খেতে-না-খেতে ঘুমিয়ে পড়ে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে প্রসূতি কি করবেন? তিনি কি তা সত্ত্বেও শিশুকে জোর করে বেশি খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না?—না। শিশু যদি প্রতিবার এক আউন্স কি ১॥০ আউন্স করেও খায় তবু যখনি সে খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে তখনই খাওয়ানো বন্ধ করা ভালো। এর ফলে সে যদি বারে বেশি খেতে চায় ও তাকে খাওয়াতে হয় তো ক্ষতি নেই। মোট কথা, শিশুকে এক্ষেত্রে আপনা থেকে খিদের তাগিদ অনুভব করতে দিতে হবে। আর খিদের তাগিদ অনুভব করতে শুরু করলে তার খাওয়ার ইচ্ছা ও পরিমাণ দুইই আপনা থেকে বাড়বে। ফলে তখন বারে বেশি খাওয়ানোর প্রয়োজনও কমে যাবে। শিশু যদি স্বাভাবিক পরিণত হয় তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই—সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে তো নিশ্চয়ই—এই পদ্ধতিতে সুফল ফলবে। অথচ এ-ধরনের শিশুকে জবরদস্তি বেশি খাওয়ানোর চেষ্টা করলে তার ফল আরও খারাপ হতে পারে, অর্থাৎ শিশুর অক্ষুধা আরো বেড়ে যেতে পারে।

তবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ওই পদ্ধতিতে শিশুর খিদে না বাড়লে ও খাওয়ার কিছুমাত্র উন্নতি দেখা না গেলে তাকে অবিলম্বে ডাক্তার

দেখানো দরকার। ডাক্তার দেখানোর অসুবিধা থাকলে প্রসূতি প্রয়োজনমতো তৈরি দুধের অর্ধেক কি এক তৃতীয়াংশ ফেলে দিয়ে বাকি অংশের সঙ্গে ওই পরিমাণ গরম জল মিশিয়ে পুরো দুধটুকু বেশি পাতলা করে নিতে পারেন ও সেই পাতলা দুধ খাইয়ে দেখতে পারেন এর ফলে শিশু সবটুকু দুধ খায় কিনা। এতে ফল হলে ও শিশু ক্রমশ ক্ষুধা অনুভব করলে দিন তিন-চার পরে প্রসূতি দুধে গরম জলের পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী কমাতে পারেন। যদি দেখা যায় যে শিশুর ক্ষুধার এতদূর উন্নতি হয়েছে যে এতেও তার খিদে মিটছে না তখন তিনি ফের আগের মতোই দুধ ও জলের নির্দিষ্ট আনুপাতিক পরিমাণে ফিরে যেতে পারবেন।

শিশুর খাদ্যে ভিটামিন, পানীয় জল

ভিটামিন-ডি—শিশুর বয়স এক মাস হবার আগেই তাকে ভিটামিন-ডি-উপাদানযুক্ত খাদ্য দেওয়া ভালো। তবে এ-ব্যাপারে প্রসূতিকে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে। কেননা, স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভিটামিন-ডির পরিমাণের তারতম্য হয়ে থাকে। সূর্যের আলোয় যে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি থাকে তা থেকেই শিশুর চামড়ার অভ্যন্তরে মেদের মধ্যে ভিটামিন-ডি জন্মায়। অতএব শীতপ্রধান দেশের চেয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের আলো অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে সারা বছর ধরে পাওয়া যায় বলে, এই শেষোক্ত অঞ্চলের শিশুর দেহে ভিটামিন-ডি বেশি পরিমাণে জন্মায়। তেমনি যে শিশু গ্রীষ্মকালে জন্মায় তার শরীরে ভিটামিন-ডির অভাব শীতকালে জাত শিশুর চেয়ে কম হয়। আবার, শহরের বাতাসে ধুলো আর ঝুলকালি থাকে বলে অনেকখানি আলট্রাভায়োলেট রশ্মি তার মধ্যে আটকা পড়ে যায়। তাই বিশুদ্ধ বাতাসে ও সূর্যের আলোয় মানুষ হয়ে গ্রাম্য শিশু শহুরে শিশুর মতো অতটা ভিটামিন-ডির অভাবে ভোগে না। তাছাড়া শহুরে শিশুরা কাচের শার্সিবন্ধ ঘরে ও সারাদিন জামাকাপড় গায়ে দিয়ে মানুষ হয় বলে তাদের শরীরে

গ্রামের শিশুদের চেয়ে ভিটামিন-ডির অভাব ঘটে বেশি। অতএব দেখা যাচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গ্রামাঞ্চলের শিশুদের দেহেই ভিটামিন-ডির অভাব ঘটে সবচেয়ে কম। তবে একটা কথা। সাধারণত যাদের গায়ের চামড়ার রঙ কালো তাদের শরীরে সাদা চামড়াওয়ালা শিশুদের চেয়ে ভিটামিন-ডির অভাব ঘটে বেশি। কাজেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বেশি পাওয়ার দরুন যেমন শীতের দেশের চেয়ে ভিটামিন-ডি বেশি মেলে, তেমনি শীতের দেশের মানুষের চামড়া সাদা হয় বলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো সূর্যরশ্মি না পেলেও যেটুকু মেলে তা থেকে তাদের শরীরে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়। অর্থাৎ, এক কথায়, উভয় অঞ্চলের শিশুদের দেহেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে ভিটামিন-ডির ঘাটতি দেখা যায়; আর তাই পৃথিবীর সমস্ত শিশুকেই ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্য অল্পবিস্তর পরিমাণে খেয়ে সেই ঘাটতি মেটাতে হয়। এছাড়া পৃথিবীর সব দেশেই অপরিণত অপুষ্ট শিশুদের জন্যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্যের দরকার হয়।

শিশু প্রতিদিন তার দুধের সঙ্গে ক্যাল্সিয়ম নামের যে খনিজ পদার্থটি উদরস্থ করে, সেই ক্যাল্সিয়ম যাতে শিশুর অন্ত্র নামের অঙ্গ থেকে শুষে বেরিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে তার দ্রুত গড়ে-ওঠা হাড়ের মধ্যে জমা হয় সে-কাজে সাহায্য করাই হল ভিটামিন-ডির কাজ। এই কাজটি ঠিকমতো করার জন্যে যে-পরিমাণ ভিটামিন-ডির প্রয়োজন তা যদি শিশুর দেহে না থাকে তাহলে তার নতুন গড়ে-ওঠা হাড়গুলি উপযুক্তরকম শক্ত হয় না, তলতলে নরম হয়ে থাকে। শিশুর এই রোগের নাম হল "রিকেট্স"। এ রোগ দেখা দিলে কোনো শিশুর মাথার খুলি নরম হয়ে যায়, কারো বুকের হাড়ের খাঁচা পায়রার বুকের মতো সংকীর্ণ ও উঁচু হয়ে ওঠে, কারো-বা দুটো পা ধনুকের মতো বেঁকে যায়, এমনি কত কি হয়। এমন কি এর ফলে কোনো কোনো শিশুর মাংসপেশী শিথিল হয়ে গিয়ে

পেটটা জালার মতো ঝুলে পড়তেও দেখা যায়।

ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হল কড্‌লিভার অয়েল। তবে নানা বিক্রেতা কোম্পানির ছাপমারা যে-সব হরেক রকম কড্‌লিভার অয়েল বাজারে বিক্রি হয় তার সবগুলিই কিন্তু সমান ভালো বা সমান উপকারী নয়। প্রসূতি কোন্ বিশেষ কোম্পানির বিশেষ ট্রেডমার্কযুক্ত কড্‌লিভার অয়েল কিনবেন তা ডাক্তারবাবুই তাঁকে বলে দেবেন। শিশুকে দৈনিক ক-বারে কতটা করে মোট কী পরিমাণ কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াতে হবে তাও ডাক্তারবাবু বাত্‌লে দেবেন। এখানে শুধু এইটুকু বলা চলে যে আমাদের দেশের একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশুকে দৈনিক এক (গ্রামাঞ্চলের শিশু) থেকে দেড় কি দু-চামচ (শহরাঞ্চলের শিশু) কড্‌লিভার অয়েল খাওয়ানোই যথেষ্ট হবে।

তবে একেবারে প্রথম থেকেই শিশুকে এক-দেড় কি দু-চামচ কড্‌লিভার অয়েল খাওয়ানো উচিত হবে না। খুব অল্প থেকে শুরু করে শিশুর পরিপাক-যন্ত্রকে সইয়ে সইয়ে ক্রমে ক্রমে কড্-লিভারের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে। খাওয়ার পর কড্‌লিভার খাওয়ানোই প্রশস্ত। প্রথম দিন তিনবার খাওয়ার শেষে এক ফোঁটা করে সারাদিনে মোট তিন ফোঁটা; দ্বিতীয় দিন ওইরকম প্রতিবার দু-ফোঁটা করে মোট ছ-ফোঁটা; তৃতীয় দিন প্রতিবার তিন ফোঁটা করে সারাদিনে মোট ন-ফোঁটা—এইভাবে দিনে দিনে মাত্রা চড়িয়ে শেষপর্যন্ত প্রয়োজনমতো এক-দেড় কি দু-চামচ দৈনিকে দাঁড় করানো শিশুকে কড্‌লিভার অভ্যাস করানোর দিক থেকে সবচেয়ে নিরাপদ ও প্রকৃষ্ট পন্থা। শিশু খেতে আপত্তি না করলে মুখের মধ্যে ফোঁটা ফেলে কিংবা চামচের সাহায্যে শুধু-মুখে খাওয়ানো যেতে পারে; আপত্তি করলে কড্‌লিভার অয়েল স্বল্প গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কড্‌লিভার খাওয়ানোর সবচেয়ে ভালো সময় সকাল ৯টা, দুপুর ১২টা ও দুপুর ৩টের খাবারের সঙ্গে কিংবা ঠিক পরে-পরেই।

সব শিশুকে কড্‌লিভার খাওয়ানো সমান সহজ হয় না। এমন অনেক শিশু আছে যারা প্রথম প্রথম মোটেই এ-জিনিস খেতে চায় না, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থু-থু করে কিংবা পরে বমি তুলে বের করে দেয়। শিশু একেবারেই খেতে না চাইলে কড্‌লিভার অয়েলের বদলে ভিটামিন-ডি-যুক্ত অন্য কোনো মাছের তেল ইত্যাদি দেওয়া চলে কিনা সে-সম্পর্কে ডাক্তারবাবুব সঙ্গে পরামর্শ করা বিধেয়।

গ্রীষ্মকালে শিশুব (বিশেষ করে যে শিশু রৌদ্রের মধ্যে খালি গায়ে থাকতে অভ্যস্ত) কড্‌লিভার অয়েলেব মাত্রা কমানোব কিংবা কড্‌লিভার খাওয়ানো সাময়িকভাবে বন্ধ করারও প্রয়োজন হতে পাবে। কড্‌লিভাব অয়েল খুব বেশি ভারী কিংবা গুরুপাক বলে এ-ব্যবস্থা নয়, গরমেব দিনে শিশুব চামড়ার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন-ডি তৈরি হওয়াব সম্ভাবনা থাকে বলেই এই ব্যবস্থা।

শিশু বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রিকেট্‌স রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ও ক্রমশ কমতে থাকে। তবু তা সত্ত্বেও, শিশু কৈশোবে পদার্পণ করার সময় অবধি ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। অন্ততপক্ষে জন্মের পব প্রথম দু-বছর কড্‌-লিভার অয়েল কিংবা অন্য কোনো ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্য নিয়মিত ভাবে শিশুকে খাইয়ে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। এ-ব্যাপারে অবহেলা করলে কিংবা খাওয়ানো অনিয়মিত হলে শিশুর শরীরের হাড় ও দাঁত গড়ে ওঠায় বীতিমতো বিঘ্ন ঘটতে পারে।

ভিটামিন-সি—মাতৃস্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশু স্তনদুগ্ধ থেকেই ভিটামিন-সি-র ভালোরকম সরবরাহ পেয়ে থাকে। অবশ্য মা যদি তাঁর খাদ্যের সঙ্গে টাটকা ফল, তরিতরকারি ইত্যাদি খেতে অভ্যস্ত হন তবেই এটা সম্ভব। গোরুর দুধ যতই খাঁটি হোক, এমন কি কাঁচা দুধেও ভিটামিন-সি খুব অল্প থাকে। আর দুধ ফোটানো হলে তো আগুনের আঁচে এই অল্প ভিটামিনটুকুও নিঃশেষে উবে যায়। এ-কারণে যে-সব শিশু শুধুমাত্র বোতলের দুধের ওপর নির্ভর করে

তাদের শরীরে বাড়তি ভিটামিন-সি সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এই বাড়তি ভিটামিনটুকু না পেলে এই শেষোক্ত শিশুদের একরকম রোগ হয়, তাকে বলে "স্কার্ভি"। দাঁতের মাড়ি ফোলা ও রক্ত পড়া, শরীরের অভ্যন্তরে হাড়ের চারপাশে রক্তক্ষরণ, প্রভৃতি এই স্কার্ভি রোগের লক্ষণ।

কমলালেবুতে ভিটামিন-সি প্রচুর পরিমাণে থাকে। কাজেই কমলালেবু রস করে তাই শিশুকে খাওয়ালে সবচেয়ে স্বাভাবিক-ভাবে ও সহজে তার দেহে ভিটামিন-সি সরবরাহ করা যায়। শিশুর বয়স মাসখানেক হবার আগে থেকেই তাকে কমলালেবুর রস দিতে শুরু করলে ভালো হয়। তবে ডাক্তারবাবু যদি কোনো কারণে এত তাড়াতাড়ি এটি খাওয়াতে নিষেধ করেন তো অন্য কথা। এ-ব্যাপারে একটি জিনিস মনে রাখা দরকার। প্রসূতি যেন কড্‌লিভার অয়েল (ভিটামিন-ডি) ও কমলালেবুর রস (ভিটামিন-সি) শিশুকে একই সঙ্গে খাওয়াতে শুরু করবেন না। কেননা এ দুটি বস্তু এক সঙ্গে শুরু করলে ও শিশুর হজমের গণ্ডগোল হলে, ঠিক কোনটির জন্যে এমন হচ্ছে তা বোঝবার উপায় থাকবে না।

সাধারণত, প্রথম কয়েক সপ্তাহে শিশুকে সমপরিমাণ ফোটানো জলের সঙ্গে কমলালেবুর রস মিশিয়ে খাওয়ানোই নিয়ম। খাওয়ানো এইভাবে শুরু করা যেতে পারে: প্রথম দিন সিকি চামচ কমলা-লেবুর রসের সঙ্গে সমপরিমাণ জল – মোট আধ চামচ; দ্বিতীয় দিন আধ চামচ লেবুর রসে সমপরিমাণ জল--মোট এক চামচ; তৃতীয় দিন এক চামচ লেবুর রসে সমপরিমাণ জল—মোট ২ চামচ, ইত্যাদি। এইভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দৈনিক দেড় থেকে ২ আউন্স জলমেশানো কমলালেবুর রসে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা। অতঃপর ওই জলমেশানো রসে রসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে ও জলের অনুপাত ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে শেষ পর্যন্ত দৈনিক ওই দেড় থেকে ২ আউন্স খাঁটি কমলালেবুর রসে দাঁড় করানো দরকার। প্রতিবার খাওয়ানোর আগে রসটা ভালো করে ছেঁকে নেওয়া

দরকার, যাতে লেবুর চিলতে ইত্যাদি শিশুর পেটে না যায়। অতঃপর ফিডিং বট্‌লে ভরে শিশুকে রস খাওয়াতে হয়। সাধারণত প্রতিদিন স্নানের আগে শিশুকে রস খাওয়ানো নিয়ম, কেননা দিনের মধ্যে এ-সময়টাতেই শিশুকে বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকতে দেখা যায়। কমলালেবুর রস তৈরি কবাব পর প্রসূতি যেন বেশিক্ষণ তা ফেলে না রাখেন, কেননা খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ পড়ে থাকলে রসে ভিটামিন-সি খানিক পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। নিতান্ত দরকার বোধ করলে কমলালেবুর রস সামান্য একটু গরম কবে নিতে পারেন, তবে গরম না-করা লেবুব রসই সবচেয়ে উপকারী। কিন্তু প্রসূতি যেন এ-জিনিস কখনো অতিরিক্ত গরম করবেন না বা ফোটাবেন না। মনে রাখবেন, আগুনের আঁচে ভিটামিন-সি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রায় সব শিশুই কমলালেবুব বস খেতে পছন্দ কবে এবং তা হজমও করে অতি সহজে। তবে এক-আধটা ক্ষেত্রে এর দরুন শিশুকে বমি করতে বা অস্বস্তি বোধ করতে দেখা যায়। কোনো কোনো শিশুর চামড়ায় লেবুব রস খাওয়াব ফলে ঘামাচির মতো ফুস্কুড়িও বেরোতে দেখা যায়। শিশু কমলালেবুব রস সহ্য করতে না পারলে অবশ্য জোর করে তাকে এ-জিনিস খাওয়ানো চলে না। এ-হেন ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর পবামর্শ নিয়ে কমলালেবুব বদলে মুসাম্বী কিংবা টোম্যাটোর রস কিংবা ভিটামিন-সি-যুক্ত কোনো ওষুধ খাইয়ে ভিটামিনের অভাব পুবণের চেষ্টা করা কর্তব্য। টোম্যাটোয় অবশ্য কমলালেবুব মতো অত বেশি ভিটামিন নেই। কাজেই শিশুকে টোম্যাটোর রস খাওয়াতে হলে রসেব পরিমাণ কমলালেবুব রসের দ্বিগুণ হওয়া দরকার। অর্থাৎ, প্রথম দিন আধ চামচ টোম্যাটোর রসের সঙ্গে সমপরিমাণ জল—মোট এক চামচ, ইত্যাদি এবং পরিশেষে মোট পরিমাণ ৪ আউন্স খাঁটি টোম্যাটোর রস। শিশু একসঙ্গে অতটা রস খেতে না পারলে প্রতিবার ২ আউন্স করে দিনে দু-বারে সবটুকু রস খাওয়ানো দরকার। তবে একটা কথা।

সাধারণত দেখা যায় যে-শিশু কমলালেবুর রস সহ্য করতে পারে না কিংবা পছন্দ করে না তার পক্ষে টোম্যাটোর রস হজম করা কিংবা পছন্দ করাও শক্ত হয়ে পড়ে। এ-ধরনের সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে শিশুকে ভিটামিন-সি-যুক্ত ওষুধের (অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড) বড়ি কিংবা তরল ওষুধ ফোঁটায় ফোঁটায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

পানীয় জল—ডাক্তাররা সাধারণত দিনের মধ্যে একবার কি দু-বার দুধ খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শিশুকে অল্প এক-আধ আউন্স করে জল খাওয়াতে বলেন। তবে নবজাত শিশুকে জল খাওয়ানো যে একান্ত আবশ্যক, তা নয়। কেননা নবজাত শিশু এমনিতে তার খাদ্যের সঙ্গে দৈনিক যে-পরিমাণ জলীয় পদার্থ খায় তাতেই মোটামুটি তার জল পানের প্রয়োজন মেটার কথা। তবে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরমের দিনে কিংবা যে-কোনো সময়ে শিশুর জ্বর হলে তাকে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে জল খাওয়ানোর দরকার হয়। এমনিতে যে-সব শিশু জল খেতে না চায়, দেখা যায় তারাও ওই সমস্ত সময়ে বেশ কিছুটা জল খেতে আপত্তি করে না।

এক কিংবা দুই সপ্তাহ থেকে বছরখানেক বয়সের মধ্যে অনেক শিশুই শুধু-জল খেতে চায় না। দুধে জল দিলে তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু কেন যেন সাদা জল তারা একেবারেই পছন্দ করে না। তবে ওই বয়সের কোনো শিশু যদি শুধু-জল পছন্দ করে, তাহলে মা যেন তাকে দিনের মধ্যে একবার দু-বার কিংবা বারকয়েকই জল খাওয়াতে দ্বিধা না করেন। শিশুর দুধ খাওয়ার সময়-সূচীর ফাঁকে ফাঁকে অল্পে অল্পে এই জল খাওয়ানো দরকার, তবে কোনো একবারের দুধ খাওয়ার ঠিক আগেই যেন জল দেওয়া না হয়। শিশু সারাদিনে যতটা জল খেতে চাইবে প্রসূতি তাকে ততটাই দেবেন, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তবে সম্ভবত সারাদিনে ২ আউন্সের বেশি জল শিশুর আবশ্যক হবে না। আবার খেতে না চাইলে শিশুকে

জোর করে জল খাওয়ানোরও দরকার করে না। অনর্থক তাকে এভাবে খেপিয়ে তোলার কোনো মানে নেই। আবারও বলছি, প্রসূতি যেন মনে রাখেন, খাদ্য হিসেবে শিশুর কী চাই না-চাই তা সে নিজে যতটা ভালো বোঝে এমন আব কেউ বোঝে না।

শিশু যদি জল খেতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার সারাদিনের খাবার জলটুকু ভালো করে (অন্তত ৩ মিনিট ধরে) ফুটিয়ে একটি পরিষ্কার মুখ-আঁটা বোতলে ভরে রাখুন। অতঃপর যখন যেমন দরকার হবে ততটা অন্য একটা পাত্রে ঢেলে অল্প গবম করে ফিডিং বট্‌লে ফের ঢেলে নিন ও শিশুকে খেতে দিন। প্রথম একটা বছর শিশুকে সব সময়ে জল ফুটিয়ে খেতে দেবেন। যদি আপনাব অঞ্চলে পরিশ্রুত পানীয় জল না পাওয়া যায় তাহলে এবপর আরো একটা বছর শিশুকে ফুটনো জল খাওয়াতে পাবলে ভালো হয়।

বিশোধনের প্রয়োজনীয়তা—শিশুব বোতলের দুধ ও পানীয় জল সর্বদাই ভালো কবে ফুটিয়ে বিশোধিত বা বীজাণুমুক্ত করে নিয়ে খেতে দেওয়া কর্তব্য। তা ছাড়া বোতলের দুধ তৈবির সময় কাজে লাগে এমন সমস্ত বাসনপত্র গবম জলে ফুটিয়ে কিংবা অভাবপক্ষে ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিয়ে ব্যবহাব কবা দবকাব। এর কারণ কি? এর কাবণ, দুধেব মধ্যে বোগেব বীজাণু সহজেই বাসা বাঁধতে ও বংশবৃদ্ধি কবতে পাবে। পানীয় জলও সহজে দূষিত হয়ে পড়ে। পুকুর, কুয়ো ইত্যাদির বদ্ধ জল তো বটেই, এমন কি পরিশ্রুত কলের জলও নানা কাবণে আশানুরূপ ভালো হয় না।

তবে একটা কথা। দুধ, পানীয় জল ইত্যাদি বিশোধন করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে প্রসূতি যেন না মনে করেন যা-কিছু শিশুর মুখেব মধ্যে যাবে বা মুখে ঠেকাতে হবে তাই বিশোধন করে—অর্থাৎ ফুটিয়ে—নিতে হবে! বিশোধন-ক্রিয়াকে মোটেই এতটা ভয়ের চোখে দেখবাব বা বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ার দরকার নেই। মনে রাখা দরকার, সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস

ভালো, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ততা ভালো নয়।' এই শেষোক্ত অবস্থা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা বা মানসিক বিকারের ফল মাত্র। অনেক সময় অনেক মেয়েকে সন্তান পালন করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা-বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় বলেই এখানে বিষয়টি উল্লেখ করা গেল।

দুধ, পানীয় জল ইত্যাদি দু-একটি জিনিস ছাড়া শিশুর অন্যান্য খাদ্য, পানীয় ও ব্যবহারের জিনিসপত্র মোটেই বিশোধন করে নেওয়ার দরকার করে না। এ-কথাটি প্রসূতির বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। শিশুর ব্যবহারের থালা, বাটি, কাপ, চামচে ইত্যাদি গরম জলে ফোটাবেন না। কেননা পরিষ্কার ও খটখটে শুকনো বাসনপত্রে রোগের বীজাণু একেবারেই বাসা বাঁধতে পারে না। বাজারে-কেনা কমলালেবু আস্তো অবস্থাতেই জলে ধুয়ে নিতে পারেন, এতে বুদ্ধির কাজই করা হবে। কেননা, লেবুর গায়ে সুস্থ-অসুস্থ হাজারো মানুষের ছোঁওয়া লেগে থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে যে-ছুরিতে লেবুটি কাটবেন সেটিকে গরম জলে ফোটানোর দরকার নেই। লেবুর রস বানানোর পর মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হলে শিশুর পেটে রোগের বীজাণু চলে যাবে ভেবেও উতলা হবেন না; মিনিট দশেক পড়ে থাকলে লেবুর রসে নিশ্চয়ই বীজাণু কিলবিলিয়ে উঠবে না।

চার | দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান

স্নান

জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস সকাল ৯টা কিংবা ১০টার খাওয়ার ঠিক আগে শিশুকে স্নান করানোই সবচেয়ে সুবিধাজনক। তবে প্রসূতির সুবিধামতো স্নানের সময় শিশুর ১২টা কি ১টার খাওয়ার আগেও নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। শিশুর স্নান সব সময়ে তার খাওয়ার আগে সারা দরকার, খাওয়ার পরে নয়। কেননা, খাওয়ার পরই শিশুরা সাধারণত ঘুমোতে চায়, সে-সময়ে তাকে বিরক্ত করা উচিত নয়।

স্নানের আগে শিশুকে তেল মাখাতে পারলে ভালো হয়। খাঁটি সরষের তেল, অলিভ অয়েল ইত্যাদি যে-কোনো তেলেই কাজ চলতে পারে। পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় নিয়ে ধীরে ধীরে শিশুর সারা শরীরে তেল মালিশ করতে হয়। শীতের দিনে সকাল বেলা শিশুকে রৌদ্রে শুইয়ে তেল মাখানো খুব ভালো। তবে রৌদ্রে রাখার সময় শিশুর মাথা যাতে ছায়ায় থাকে তা দেখা কর্তব্য।

তেল মাখিয়ে শিশুকে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখার পর স্নান করানোর পালা। স্নানের ঠিক আগেই শিশুকে কমলালেবুর রস খাওয়ানো ভালো। এতে সাময়িকভাবে শিশুর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে।

যতদিন শিশুর নাড়ি বা নাভিমূলের ঘা সম্পূর্ণ না শুকোয় ততদিন তাকে পুরোপুরি জলে ডুবিয়ে স্নান করানো উচিত হবে না। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে স্নান করানোর পদ্ধতি হল, শিশুকে কোলে নিয়ে প্রথমে তার মাথাটি ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দেওয়া ও তারপর ভিজে গামছা বা তোয়ালে দিয়ে ধীরে ধীরে সারা শরীর মুছে দেওয়া। ইংরেজিতে একে বলে "স্পঞ্জবাথ" দেওয়া। এভাবে স্নান করানোর সময় শিশুর নাড়ির

ঘায়ে যাতে জল না লাগে সে-ব্যাপারে সাবধান হওয়া কর্তব্য। অসাবধানতার দরুন ঘায়ে জল লাগলে এক টুকরো বোরিক তুলো দিয়ে ঘা-টি খটখটে শুকনো করে ফেলা দরকার হবে।

নাড়ির ঘা শুকিয়ে যাবার পর শিশুকে প্রতিদিন অবগাহন স্নান করানো যেতে পারে। প্রথম প্রথম ঘরের মধ্যেই স্নান করানো বিধেয়। যে-ঘরে-স্নান করানো হবে সেটি যাতে শুকনো ও আলো-হাওয়াযুক্ত হয় এবং ভিজে স্যাঁতসেতে কিংবা কনকনে ঠাণ্ডা না হয় তা দেখা কর্তব্য। স্নানের সময় ওই ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে নিতে হবে। অতঃপর শিশু স্নানে কিছুটা অভ্যস্ত হবার পব এবং সময়টা শীতকাল না হলে তাকে বাড়ির রোদ-পোয়ানো খোলা বারান্দায়ও স্নান কবানো যেতে পারে। তবে শীতকালে, বিশেষ করে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া দিলে, শিশুকে ঘরের মধ্যে স্নান করানোই ভালো। স্নানের জন্যে একটি এনামেল-করা কিংবা অ্যালুমিনিয়মের গামলা বা ডিশপ্যান ব্যবহার করা যেতে পাবে, অভাবপক্ষে ছোট স্নানের টবেও কাজ চলে যায়।

প্রথম প্রথম শিশুর স্নানেব জল অল্প গরম, অর্থাৎ শিশুর শবীরের উত্তাপের সমান গরম, হওয়া আবশ্যক। এই ফবমায়েস শুনে প্রসূতি যেন ভয় না পান। এজন্যে তাঁর থার্মোমিটার ব্যবহার করারও দরকার নেই। জলের মধ্যে হাতের তেলোর উল্টোপিঠ কিংবা কনুই ডুবিয়ে যদি তাঁর মনে হয় জলের তাপ বীতিমতো গা-সহা ও আরামদায়ক তাহলেই তিনি জলটি শিশুর স্নানের উপযোগী বলে ধরে নিতে পারেন। শিশু স্নানে অভ্যস্ত হবার পর অবশ্য গরমের দিনে গরম জল ঠাণ্ডা করে নিয়ে, কিংবা শিশু সহ্য করতে পারলে পুরোপুরি ঠাণ্ডা জলেই, তাকে স্নান করানো যেতে পারে। তবে শীতকালে সামান্য গরম জলে শিশুকে স্নান করানোই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

শিশুর ব্যবহারের উপযোগী সাবান বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে প্রসূতি শিশুকে ওই ধরনের কোনো

সাবান মাখাতে পারেন। প্রথম প্রথম অল্প জল নিয়ে শিশুকে স্নান করাবেন। যতদিন না প্রসূতি স্নান করানোর কাজে অভ্যস্ত হচ্ছেন ততদিন এই ব্যবস্থা বহাল রাখা ভালো।

স্নান করানোর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রসূতিকে দু-একটি কথা : শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আপনার বাঁ-হাতের কব্জিটি বালিশের মতো করে তার মাথার নিচে রাখুন ও সেই হাতেরই আঙুলগুলি তার বগলের তলা দিয়ে গলিয়ে শিশুকে শক্ত করে ধরে রাখুন। অতঃপর ডান হাতে একটি কাপ কিংবা ছোট মগে করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তার মাথাটি আস্তে আস্তে ভালো করে ধুইয়ে দিন। মাথা ধোয়ানোর পর ভিজে ন্যাকড়া কিংবা গামছা দিয়ে শিশুর মুখটিও মুছিয়ে দিন। মুখের ওপর জল ঢালবেন না ও মুখে সাবানও মাখাবেন না। মাথায় সপ্তাহে একবার কি দু-বার সাবান দেওয়াই যথেষ্ট হবে। এর পর অল্প জল দিয়ে শিশুর সারা গা ভিজিয়ে দিন ও সাবান মাখান। প্রথম প্রথম শিশুকে স্নানের টবে নামিয়ে সাবান মাখাতে ভরসা না পেলে প্রসূতি কোলের ওপর একখণ্ড বড় অয়েলক্লথ পেতে শিশুকে তার ওপর রেখেই এ-কাজটি সারতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে কাজটি খুব দ্রুত করা দরকার, কেননা তা না হলে শিশুর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। সাবান মাখানো শেষ হলে দু-হাতে শিশুর দুই বগলের তলা শক্ত করে ধরে তাকে টবের জলে নামান এবং বাঁ-হাত ও টবের কানায় ঠেকা দিয়ে তাকে ধরে রাখুন এবং ডান হাতে জল ঢেলে তার সারা গা ধুইয়ে দিন। টবের জলে নামানোর সময় শিশুর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত যাতে জলের ওপরে থাকে ও তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা না লাগে সে-বিষয়ে নজর রাখা দরকার। অতঃপর শিশুকে ফের কোলে তুলে নিয়ে একটি নরম তোয়ালে কিংবা গামছা দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিন। ঘষে ঘষে গা না মুছিয়ে শিশুর গায়ে তোয়ালে বা গামছা চেপে চেপে জলটা শুষে নিন। চোখ, কান, নাক, বগল, কুঁচকি ও পাছার ভাঁজের ভেতর জল থাকলে খুব সাবধানে তা মুছে নিন।

স্নানের পর ইচ্ছা কবলে শিশুর গায়ে খুব হালকা করে পাউডার মাখিয়ে দিতে পাবেন। অবশ্য পাউডার মাখানো সব শিশুর পক্ষেই যে একান্ত প্রয়োজনীয় তা নয়। তবে যে-সমস্ত শিশুর গায়ের চামডা সহজে ফাটে কিংবা শবীবের ভাঁজগুলি সহজেই হেজে যায় তাদেব বেলায পাউডাব ব্যবহাব কবা মন্দ নয়। বাজাবে শিশুব ব্যবহারেব উপযোগী বিশেষ পাউডাব কিনতে পাওয়া যায।

স্নানে অভ্যস্ত হবাব পব অধিকাংশ শিশুই স্নান ভীষণ পছন্দ কবে। অতএব প্রসূতি যেন তাডাহুডো কবে দাযসাবাভাবে শিশুকে স্নান না কবান। শিশুকে স্নান উপভোগ কবতে দিন, শিশুব আনন্দেব ভাগ নিন আপনিও।

কোনো কোনো সমযে অবশ্য এক থেকে দু-বছব বযসেব মধ্যে শিশু স্নানেব নামে ভয পায। কাবো টবেব জলে নামাব ভয, কাবো-বা চোখে সাবানেব ফেনা লাগাব ভয। এমনি হবেক বকম ভযে বিকল হয শিশু। চোখে সাবান লাগা এডানো যায, যদি প্রসূতি শিশুব মাথায সাবান মাখানোব সময খুব অল্প জল ব্যবহাব কবেন (এতে মাথা থেকে সাবান মেশানো জল গডিয়ে চোখে ঢুকবে না) ও মাথা ধোযানোব সময মাথাটি একটু বেশি হেঁট কবিযে নেন। মাথা হেঁট কবে ধুতে শিশু যদি আপত্তি কবে তো তাব কপালেব নিচে আডা-আডি একটি হাত বেখে প্রসূতি তাব মাথা হেঁট কবাতে ও ভয ভাঙানোব চেষ্টা কবতে পাবেন। শিশু স্নানেব টবে জুজুব ভয দেখলে তাকে জোব কবে টবে নামানোব চেষ্টা কবা উচিত নয। এক্ষেত্রে টবেব পবিবর্তে ডিশপ্যান ব্যবহাব কবা যেতে পাবে। শিশু এতেও নামতে বাজী না হলে কিছু দিন স্নানেব পবিবর্তে তাকে 'স্পঞ্জবাথ' দিতে পাবেন ও অতঃপব সাহস ফিবে এলে স্নানেব টবে অল্পে অল্পে জল বাডিয়ে তাকে স্নানে অভ্যস্ত কবে তুলতে পাবেন।

চোখ, কান, নাক, মুখ ও নখের যত্ন

চোখেব কোনো অসুখ না হলে সাধাবণ ক্ষেত্রে চোখের বিশেষ যত্ন

নেওয়ার দরকার করে না। কান্না ছাড়াও এমনিতে চোখের জলে চোখ সর্বদা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র চোখের কোনো বিশেষ অসুখ দেখা দিলে ফোঁটায় ফোঁটায় ওষুধ দেওয়ার দরকার হয়।

কানের একমাত্র বাইরের অংশটিই প্রতিদিন ভিজে ন্যাকড়া ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। কানের ছিদ্র দুটি পরিষ্কার করার দরকার করে না। এই ফুটো দুটির মধ্যে যে খোল জমে তা-ই কানের ভেতরের অংশকে আঘাতের হাত থেকে বাঁচায় ও পরিষ্কার রাখে। স্নানের সময় শিশুর কানের ফুটোয় যাতে জল বা সাবানের ফেনা না ঢোকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

শিশুর নাকও আশ্চর্যভাবে নিজেকে পরিষ্কার রাখে। নাকের ছিদ্রের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোঁয়া ভেতরকার কফ ও ধুলোবালি ইত্যাদিকে অনবরত নিচের দিকে ঠেলতে থাকে। অতঃপর ওই সব বস্তু ছিদ্র দুটির মুখের কাছে অপেক্ষাকৃত বড় বড় রোঁয়ায় জড়িয়ে গিয়ে আটকে থাকে। এর ফলে নাকে সুড়সুড়ি লাগে এবং শিশু হেঁচে কিংবা হাত দিয়ে রগড়ে ওই কফ ইত্যাদি বের করে দিতে চায়। শিশুর নাকে ময়লা আটকে থাকলে স্নানের পর কাপড়ের খুঁট দিয়ে কিংবা কাঠির মাথায় তুলো জড়িয়ে সেই তুলি দিয়ে তা পরিষ্কার করতে পারেন। তবে এতে শিশু অস্বস্তি বোধ করলে ও চটে উঠলে এ-চেষ্টা তখনকার মতো ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

সাধারণত শিশুর মুখের ভেতরটা পরিষ্কার করার দরকার করে না। নখ বড় হলে ঘুমন্ত অবস্থায় ক্লিপ দিয়ে শিশুর নখ কাটা যেতে পারে।

নাভিমূলের তত্ত্বাবধান

মাতৃগর্ভে থাকাকালে শিশু তার নাড়ি (বা umbilical cord)-র সাহায্যে প্রসূতির দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং প্লাসেণ্টা বা গর্ভফুল মারফত ওই নাড়ির মধ্যেকার রক্তবহা ধমনীর সাহায্যে মায়ের দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এ-সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। জন্মের পর ডাক্তারবাবু শিশুর নাভিমূলের কাছাকাছি

একটা জায়গায় এই নাড়ির গায়ে বাঁধন দিয়ে তার একটু ওপরে নাড়ি কেটে দেন। অতঃপর নাভিমূলের ওপর নাড়ির এই বাড়তি অংশটি ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে আসে ও এক সময় ঝরে পড়ে। সাধারণত হাসপাতালে থাকতে থাকতেই শিশুর নাড়ি শুকিয়ে ঝরে যায়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ঘটতে আরো কিছুটা দেরি হওয়া বিচিত্র নয়। নাড়ি খসে পড়ার সময় নাভিমূলে যে ক্ষত হয় সে-ক্ষত শুকোতে কয়েক দিন সময় লাগে। ঘা থাকাকালীন নাভিমূল যাতে বীজাণুর আক্রমণে বিষিয়ে না ওঠে সেজন্যে সেটি সর্বদা পরিষ্কার রাখা ও ঘায়ে হাত না-লাগানো কর্তব্য। আগেই বলেছি, এই সময়টায় শিশুকে অবগাহন স্নান না করিয়ে স্পঞ্জবাথ দেওয়াই ভালো। স্পঞ্জ-বাথের সময় নাভিমূলে জল লাগলে এক টুকরো তুলো কিংবা পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে জায়গাটা খটখটে শুকনো করে ফেলা কর্তব্য। অতঃপর ছোট্ট এক টুকরো বোরিক তুলো অ্যালকোহলে ভিজিয়ে নাভিমূলের ওপর রেখে তার ওপরে বেশ পুরু করে খানিকটা চৌকো গজ-কাপড় চাপা দিতে হবে ও পেটের ওপর দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখতে হবে। নাভিমূলের ঘা-টি এইভাবে শুকনো করে রাখতে পারলে কয়েক দিনের মধ্যেই ওপরে মড়মড়ি পড়ে ঘা শুকিয়ে আসবে। ঘা পেকে উঠলে ও পুঁজ গড়াতে শুরু করলে নাভিমূলে যাতে একেবারে জল না লাগে তা তো দেখতে হবেই, তাছাড়া প্রতিদিন জায়গাটি অ্যালকোহল দিয়ে মুছে ও তাতেই ভিজিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখার দরকার হবে। এরকম ক্ষেত্রে কিংবা নাভিমূল ও তার চার পাশের চামড়া লাল হয়ে উঠতে দেখলে অবিলম্বে ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক বলে জানবেন।

মাথার তালুর যত্ন

শিশুর মাথার ওপর মাঝামাঝি একটা জায়গা, অর্থাৎ ব্রহ্মতালুটি, মাথার অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেক নরম ও তলতলে হতে দেখা যায়। এটি আর কিছুই নয়, যে-চার টুকরো হাড় জোড়া লেগে

মাথার খুলিটি তৈরি হয়, সেই হাড় চারখানা তখনো পর্যন্ত যথেষ্ট বড় হয়ে সারা মাথা ঢেকে ফেলতে পারেনি বলেই শিশুর মাথার এই অবস্থা। শিশুভেদে মাথার ব্রহ্মতালুর এই নরম জায়গাটিও ছোট-বড় হয়। শিশুর মাথার নরম জায়গাটি অপেক্ষাকৃত বড় হলে সে-কারণে প্রসূতির ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তবে এটা ঠিক, আকারে বড় হলে জায়গাটি ভরাট হতেও দেরি লাগে। সাধারণত শিশুর এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যেই ব্রহ্মতালু শক্ত হয়ে ওঠে। তবে কারো কারো মাত্র ন-দশ মাস বয়সেই মাথা শক্ত হয়ে যায়, আবার কারো-বা শক্ত হতে বছর দুই পর্যন্ত সময় লাগতে দেখা যায়।

শিশুকে নিয়মিতভাবে ভিটামিন-ডি-যুক্ত খাদ্য, যেমন কড্‌লিভার অয়েল না খাওয়ালে তার মাথার নবম জায়গা ভবাট হতে দেরি হয়। এমন কি, নবম জায়গাব আকাব বেশ ছোট হলেও ভিটামিন-ডি-ব অভাবে সেই ছোট ফাঁকটুকু ভবতেও অস্বাভাবিক দেরি হতে পারে।

প্রসূতি অনেক সময় শিশুর মাথাব নরম জায়গায় হাত দিতে ভয় পান। এ-ব্যাপাবে অতিবিক্ত ভয় নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন। কেননা, আগেই বলেছি, এ-জায়গাব চামড়া এত ঘাতসহ হয়ে থাকে যে অল্পস্বল্প আঘাতে সহজে কোনো ক্ষতি হয় না।

শিশুর সাজ ও শয্যা

শিশুকে কী পরিমাণে ঢেকেঢুকে বাখতে হবে কিংবা জামা-কাপড় পরাতে হবে এক কথায় তা বলা সম্ভব নয়। তবে বিশেষ বিশেষ শিশুব ওজন ও তার শবীবে চর্বিব মাত্রা বিবেচনা করে এ-সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে। পাঁচ পাউণ্ডেব চেয়ে কম ওজনবিশিষ্ট শিশুর স্বাভাবিকভাবেই শীতাতপ সহ্য করাব শক্তি কম থাকে। কাজেই এ-ধরনের শিশুকে যতদূর সম্ভব রৌদ্রে কিংবা ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে না রাখাই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এরকম শিশুকে

বর্ষা কিংবা শীতের দিনে একটু বেশি ঢাকাঢুকি দিয়ে কিংবা জামা-কাপড় পরিয়ে রাখতে হবে এবং ঠাণ্ডা বেশি পড়লে শিশু যে-ঘরে থাকে সেই ঘরটিও গরম করার (কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে কিংবা সম্ভবস্থলে ইলেক্‌ট্রিক হীটারের সাহায্যে) ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর ওজন বেড়ে ৮ পাউণ্ড হবার পর থেকে তার শীতাতপ সহ্য করার ক্ষমতা সম্পর্কে নির্ভর করা যেতে পারে।

যে-সমস্ত শিশু ও বালক মোটামুটি মোটাসোটা বা গোলগাল চেহারার, ঠাণ্ডার দিনে তাদের পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের চেয়েও কম জামাকাপড় পরলে চলে। আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরে শিশুদের—তা তারা রোগাই হোক আর মোটাই হোক—একটু বেশিরকম জামাকাপড় পরানোর রেওয়াজ। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এ-অভ্যাসটি মোটেই উপকারী নয়। মানুষের শরীর প্রাকৃতিক আবহাওয়া পবিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার স্বাভাবিক ক্ষমতা রাখে। অতিরিক্ত জামাকাপড় পরলে এই স্বাভাবিক ক্ষমতাটি লোপ পেয়ে যায়। ফলে আচমকা ঠাণ্ডা কিংবা গবমে এ-ধরনেব শিশুব চট্‌ কবে সর্দি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব, সব থেকে ভালো উপায় হল, শিশুকে একটা অতিরিক্ত বেশি জামা না পবিয়ে বরং একটা কম জামা পরানো এবং এর ফলে শিশু শীতবোধ কবছে কিনা তা লক্ষ্য করা। এটা বোঝার একটা পদ্ধতি হচ্ছে শিশুব পায়ের তলা, বাহু (মানে, হাতের কনুইয়ের ওপবেব অংশ) ও ঘাড় বেশি রকম ঠাণ্ডা কিনা পবীক্ষা করে দেখা। তবে এব সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা হল শিশুর মুখের রঙ বদলাচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা। শিশুব গালের রঙ ফ্যাকাশে কিংবা ঠোঁটের রঙ নীলচে দেখলে বুঝতে হবে তার শীত বেশি লাগছে ও তখন সেই অনুযায়ী তাকে শীতবস্ত্র পরাতে হবে।

শীতের দিনে শিশুব গায়ে লেপ চাপা না দিয়ে তাকে পুরো-পশমী হাল্‌কা কম্বল দিয়ে মুড়ে রাখা অনেক ভালো। এতে যেমন শীত কাটে তেমনি শিশুর বুকের ওপর বেশি ওজনও চাপানো হয় না।

ওজনে-ভারী লেপ-তোষক ইত্যাদি শিশুর গায়ে কখনও চাপানো উচিত নয়। সম্ভবস্থলে, এমন কি কম্বলও না চাপিয়ে হাতে-বোনা পশমের চওড়া স্কার্ফ দিয়ে শিশুকে মুড়ে রাখলে যেমন শিশু আরাম পায় তেমনি দরকারমতো তাকে স্কার্ফসুদ্ধই কোলে তুলে নেওয়া যেতে পাবে।

তবে লেপ, কম্বল, চাদব, স্কার্ফ ইত্যাদি যা দিয়েই শিশুকে ঢাকুন না কেন, দেখা দবকাব জিনিসটি যেন লম্বা-চওড়ায় বেশ বড় হয়। জিনিসটি যেন এতটা বড় হয় যে তা দিয়ে শিশুকে পুরোপুরি মুড়ে রাখা বা ঢেকে ধাবগুলি বিছানাব নিচে গুঁজে বাখা সম্ভব হয়, এবং শিশু হাত-পা ছুঁড়ে কিছুতেই ঢাকাটি যেন নিজেব মুখে চাপা দিতে না পাবে। শিশুর ব্যবহার্য কাঁথা ইত্যাদি চাবপাশ থেকে বিছানার নিচে গুঁজে বাখাব মতো বড় হয়, এটাও দেখা কর্তব্য।

শিশুর জামা, লেঙট, কাঁথা কাচা—শিশুব নিত্যব্যবহার্য সুতী জামা, লেঙট এবং কাঁথা প্রভৃতি যা কিছু সে প্রস্রাব ও পায়খানা কবে ভিজিযে ফেলবে, তা সবই প্রতিদিন সাবান দিয়ে কাচতে হবে। সাধাবণ কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে (সোডা দিয়ে নয় ; সোডায় কাচা জামায় সামান্য সোডার গুঁড়ো লেগে থাকলে তা-ই গায়ে লেগে শিশুব চামড়া হেজে যেতে পাবে) কলেব জলে এ-সব জিনিস কাচা চলতে পাবে। তবে এ-ভাবে কাপড় কাচলে কাপড়ে বোগের বীজাণু সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না ; বিশেষ কবে শিশুব গায়ে চুলকনা বেবোতে থাকলে কাপড় কাচাব ধবনটি পালটানো দবকাব হয়। কাপড়-কাচাব সবচেয়ে নিবাপদ উপায় হল সাবান-গোলা গরম জলে জামা-কাপড়, কাঁথা ইত্যাদি ডুবিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া। জলে জামা-কাপড় ডোবানোব আগে সাবান ঠিকমতো গুলেছে কিনা দেখা দরকার। জামা-কাপড় এইভাবে সেদ্ধ করলে যেমন তা থেকে মলেব দাগ ইত্যাদি উঠে যায় যেমনি সব কিছু বীজাণুমুক্তও হয়। অতঃপর, ফোটানোর পর জামাকাপড়গুলি পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলেব ধারার নিচে

ধরে ঠাণ্ডা করে ও ধুয়ে নিতে হবে। তিন-চারবার এইভাবে ধোয়ার পর জামাকাপড়ে সাবানের কুচি বা ফেনা লেগে নেই বুঝতে পারলে সব কিছু নিংড়ে নিয়ে রৌদ্রের মধ্যে একটা তার বা দড়ির ওপর মেলে দিতে হবে। রৌদ্রে শুকিয়ে নিলে জামাকাপড়গুলি ফের দ্বিতীয়বার বিশোধিত হয়ে যাবে।

শিশুর প্রস্রাবে-ভেজা লেঙট বা কাঁথা না-কেচে শুধুমাত্র রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা উচিত নয়। এর ফলে শিশুর পিঠে ও কোমরে চুলকনা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

শিশুর ব্যবহৃত পশমী জামা, সোয়েটার, স্কার্ফ ইত্যাদি মাঝে মাঝে রিঠে-মেশানো কিংবা লাক্স ইত্যাদি সাবানেব গুঁড়ো-মেশানো গরম জলে ডুবিয়ে ও তাবপব ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে কেচে নেওয়া যেতে পারে।

খোলা হাওয়ায় বেড়ানো

শিশুর পক্ষে প্রচুব পবিমাণে বিশুদ্ধ বা খোলা হাওয়া দবকার হয়। বয়স্ক ব্যক্তি ও অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের বালকবালিকাদের বেলায় যেমন, নবজাত শিশুদের ক্ষেত্রেও তেমনি যারা অন্যদেব চেয়ে বেশি সময় খোলা হাওয়ায় থাকতে পায় তাদেব স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে গড়ে ওঠে। খোলা হাওয়ায় বেড়ানো অভ্যাস করলে শিশুদেরও শীতাতপ সহ্য করাব শক্তি ও খাওয়ায় রুচি বাড়ে।

অতএব সম্ভব হলে প্রসূতি যেন প্রতিদিনই অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে শিশুকে খোলা আলো-হাওয়ায় রাখেন কিংবা শিশুকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেড়াতে যান। অবশ্য নিয়ম করে বেরোতে হবে বলে যে চড়চড়ে রৌদ্র কিংবা ঝড়বৃষ্টি কিংবা শীতের কনকনে হাওয়ার মধ্যেও বাড়ির বার হতে হবে তা নয়। অতিরিক্ত গরম, বর্ষা বা শীতের দিন নিশ্চয়ই বাদ দিতে হবে। সাধারণভাবে বলা চলে শীতের দিনে সকালের দিকে একটু বেলায় কিংবা দুপুরে ও বছরের অন্যান্য সময়ে ভোরবেলা ও বিকেলবেলা দুই থেকে তিন ঘণ্টা শিশুকে খোলা

হাওয়ায় রাখা কিংবা পেরাম্বুলেটরে চাপিয়ে বাড়ির বাইরে ঘুরিয়ে আনা যেতে পারে।

রোদ-পোয়ানো

আগেই বলা হয়েছে শিশুকে সরাসবি বৌদ্রে বাখলে বৌদ্রের মধ্যে-কাব আলট্রাভাযোলেট রশ্মি শিশুব চামড়াব মধ্যে ভিটামিন-ডি সৃষ্টি কবে। তাছাড়া সবাসবি বোদ-পোয়ানোর আরো অনেক সুফল থাকতে পাবে ; এ-ব্যাপাবে সব কিছু যে ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে তা বলা যায় না। এ-কাবণে প্রতিদিন কিছু সময় ধরে শিশুকে সবাসবি রৌদ্রে রাখা নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। তবে শিশুকে বোদ-পোযাতে দেবাব সময নিম্নোক্ত তিনটি বিযয খেয়াল বাখা দবকাব : প্রথমত গ্রীষ্মকালে বোদ-পোয়ানোর সময়টি খুব অল্প থেকে অত্যন্ত ধীবে ধীবে বাডাতে হবে ; দ্বিতীয়ত, কখনই একসঙ্গে আধ ঘণ্টাব বেশিক্ষণ বোদ-পোযাতে দেওয়া উচিত হবে না , তৃতীযত, এ-কথাটা মনে বাখা দবকার যে রোদের পোড়া ও আগুনে-পোড়া একই বকম বিপজ্জনক ব্যাপার।

আগেই বলা হযেছে সকাল ৯টা কিংবা ১০টাব খাওযাব আগে শিশুর স্নানেব সময নির্দিষ্ট কবা এবং ওই স্নানেব আগে বৌদ্রে বেখে শিশুকে তেল মাখানো সবচেযে প্রশস্ত। তবে গরমের দিনে আবো সকালে শিশুকে বোদ-পোয়াতে দিলে এবং সম্ভবস্থলে তেল মাখিয়ে রোদ-পোযাতে দিলে খুবই ভালো হয়।

শিশুব ওজন ৫ পাউণ্ডেবও কম হলে তাকে এভাবে খোলা হাওয়ায় ও রৌদ্রে রাখা সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে প্রসূতিব পরামর্শ কবা দরকার হবে।

শিশুর ঘুম ও খেলাধুলো

শিশু কতক্ষণ ঘুমোবে ? এ-প্রশ্নের জবাব একমাত্র শিশু নিজে ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয়। কোনো শিশুর দিনেব মধ্যে অনেকখানি

সময় ঘুমোনোর দরকার হয়, কারো-বা ঘুম আশ্চর্যরকম কম। শিশু যদি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে, যখন-তখন না কাঁদে, প্রচুর পরিমাণে খোলা আলো-বাতাস পায় ও শান্তিতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ঘুমোয় তাহলে তার খুশিমতো তাকে ঘুমোতে দেওয়া উচিত।

জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস নিয়মিত পেটভরে খেতে পেলে ও গরহজমের দরুন পেট-কামড়ানিতে না ভুগলে শিশুরা সারাদিন খালি খায় আর ঘুমোয়। প্রত্যেক দু-বার খাওয়ার মধ্যে খালি ঘুমোনো ছাড়া তখন তারা কিছুই করে না। তবে আবার এমনও কিছু শিশু দেখা যায় যাদের ঘুম ওই গোড়া থেকেই অসম্ভব কম। এটা যে কোনোরকম অসুবিধা কিংবা শারীরিক কষ্টের জন্যে ঘটে তাও সব সময়ে নয়। এ-ধরনের শিশুর স্বভাব বদলানোর কোনো উপায় এমন কি ডাক্তারবাবুরাও বাত্‌লাতে পারেন না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শিশুর ঘুমের মাত্রাও কমতে থাকে। এই সময়ে প্রথম প্রথম সন্ধ্যার দিকে তাকে না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে দেখা যায়। ক্রমশ দিনের অন্যান্য সময়েও চোখে পড়তে থাকে যে সে জেগে থাকছে। তাছাড়া এও লক্ষ্য করা যায় যে প্রতিদিন কম-বেশি প্রায় একই সময়ে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। এইভাবে প্রথম বছরের শেষদিকে হয়তো দেখা যাবে তার ঘুমের মাত্রা কমতে কমতে দিনে মাত্র দু-বার কি তিনবারে এসে ঠেকেছে। তারপর এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে তার ঘুম সম্ভবত আরো কমে গিয়ে সারাদিনে মাত্র একবার কি বড় জোর দু-বারে দাঁড়িয়ে যাবে।

জন্মের পর থেকে বছর দুই বয়স পর্যন্ত শিশু আপনা থেকে কম ঘুমোলে কিছু করার থাকে না একথা সত্যি। কিন্তু দু-বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়সের শিশু যদি অস্বাভাবিকরকম কম ঘুমোতে থাকে, তাহলে তাকে সব সময় 'আপনা থেকে' বলে মনে করা যায় না। কেননা, মনে রাখবেন, ওই বয়সে শিশুর মন নামে বস্তুটি প্রথম নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করতে শুরু করে—যথা, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, দুঃস্বপ্ন, ভাইবোন সম্পর্কে ঈর্ষা প্রভৃতি; আর এরই প্রভাবে হঠাৎ

শিশুর ঘুমের মাত্রা কমে যেতে পারে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুর মনের জটিলতা কৌশলে দূর করতে পারলে তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত বেশিক্ষণ ঘুমোনো সম্ভব।

খাওয়ার পর ঘুমোনো—শিশুকে খাওয়ার পরই বিছানায় শোয়ানো ও ঘুম পাড়ানো অভ্যাস হিসেবে ভালো। তাছাড়া শিশুর বয়স ৩ মাস পেরোনোর পর তাকে তার নিজের বিছানায় আলাদা হয়ে শোয়া ও ঘুমোনো অভ্যাস কবানোও খুব ভালো। যে-সব প্রসূতি খাওয়ানোর পর শিশুকে কোলে করে দোল-দেওয়া অভ্যাস করেন তাঁদের সন্তানেরা ক্রমশ খাওয়ার পর ঘুমোনোর অভ্যাসটি ত্যাগ করে। কেননা তারা বোঝে এ-সময়ে ঘুমোলেই তাদের কোল থেকে বিছানায় নামিয়ে দেওয়া হবে। এ-ধরনের শিশুর বদভাস ত্যাগ করাতে হলে তাদের কিছুটা শাস্তি দিতে হবে। অর্থাৎ জোর করে তাদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দশ, পনেরো কি বিশ মিনিট কাঁদতে দিতে হবে। এতে সাধারণ ক্ষেত্রে কয়েক দিনের মধ্যে শিশুর অভ্যাস বদলে যাওয়াব কথা। তবে শিশুটি একটু অস্বাভাবিক ধরনের হলে, অর্থাৎ তার কান্না দশ-বিশ মিনিটে না থেমে ক্রমশ বেড়ে চললে ও কয়েক দিনেব চেষ্টার ফলেও অভ্যাস না পালটালে, তাকে কোলে না বেখে বরং দোলনায় শুইয়ে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এই ধরনের শিশুকে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যথাসম্ভব বিছানায় বা দোলনায় রেখে শান্ত করার চেষ্টা প্রয়োজন। সাধারণত শিশুকে যত কম কোলে নিয়ে পারা যায় ততই ভালো।

অনেকে বলেন প্রথম ৬ মাস শিশুকে চিত করে শোয়ানো এবং ঘুম পাড়ানো অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবস্থা। সম্ভব হলে এ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে এর সামান্য একটু অসুবিধাও আছে। শিশুকে চিত করে শোওয়ালে সাধারণত তার বিশেষ এক দিকেই ঘাড় ফেরানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে তার

মাথার সেই বিশেষ দিকটা খানিকটা চ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে। তবে এতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার আকৃতিও ফের স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে প্রসূতি যদি শিশুকে প্রতিবার দিক-পরিবর্তন করে শোওয়াতে পারেন (অর্থাৎ প্রথম বার যেদিকে মাথা, দ্বিতীয় বার সেদিকে পা, আবার তৃতীয় বার প্রথম বারের মাথার দিকে মাথা—এইভাবে) ও শিশুকে কৌশলে দু-দিকেই ঘাড় ঘোরাতে বাধ্য করতে পারেন তাহলে এই অসুবিধা দূর হতে পারে।

পৃথক ঘরে শোওয়ানো—শিশুর বাপ মা যদি সঙ্গতিপন্ন হন কিংবা বাড়িতে শিশুর জন্যে পৃথক ঘরের বন্দোবস্ত করার মতো যথেষ্ট ঘর থাকে এবং তাঁরা যদি ইচ্ছুক হন তবে শিশুকে ৬ মাস বয়স থেকেই আলাদা ঘরে শোওয়ানো অভ্যাস করতে পারেন। তবে শিশুর শয়নকক্ষটি তাঁদের শোবার ঘরের যথাসম্ভব কাছে (একেবারে পাশা-পাশি হলে সবচেয়ে ভালো) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিশুকে পৃথক ঘরে শোওয়াতে হলে খুব বেশি হলেও ৬ মাস থেকে এক বছরের বেশি দেরি করা উচিত নয়। কেননা এর পর শিশুর পছন্দ-অপছন্দের জোরটা এত প্রবল হয়ে উঠতে পারে যে তখন তাকে স্থানান্তরিত করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য হতে পারে। শিশু পৃথক ঘরে শুয়ে ভয় পেলে কিংবা অন্য কোনো কারণে কান্না জুড়লে তাকে নিজেদের কাছে এনে শোওয়ানোর চেয়ে বাপ-মা যদি শিশুর ঘরে উঠে গিয়ে তার বিছানায় বসে সান্ত্বনা দেন ও ঘুম পাড়িয়ে ফের নিজেদের ঘরে ফিরে আসেন তো ভালো হয়।

শিশুকে সঙ্গদান– শিশুকে সঙ্গদান বলতে বিশেষভাবে কোমর বেঁধে শিশুর সঙ্গে মেশা বা শিশুকে সর্বদা গায়ে-গায়ে জড়িয়ে রাখা বোঝায় না। মনে রাখবেন, শিশুকে ভালোবাসা মানে আদর ইত্যাদির মাত্রাছাড়ানো বাড়াবাড়ি নয়। মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সব ক্ষেত্রেই

খারাপ। আবার এর অর্থ এ নয় যে পাছে শিশু প্রশ্রয় পায় এই ভয়ে তাকে উপেক্ষা করতে হবে বা সর্বদা শতহস্ত দূরে রেখে চলতে হবে। শিশুকে ভালোবাসা মানে তার সঙ্গে সহজ, স্বাভাবিক, অন্তরঙ্গ ব্যবহার। শিশুকে সঙ্গদানের অর্থ দিনের মধ্যে ফুরসত পেলেই এবং সে-সময়ে শিশু জেগে থাকলে তার কাছে-কাছে থাকা। শিশু তার সহজাত বৃত্তির বশেই বোঝে যিনি তাকে প্রতিনিয়ত খেতে দিচ্ছেন, ঢেকুব তোলাচ্ছেন, স্নান করাচ্ছেন, পোশাক পরাচ্ছেন, কাঁথা বদলে দিচ্ছেন, কাঁদলে কোলে নিচ্ছেন কিংবা কাছে-কাছে আছেন তিনি তার কত আপন এবং সে নিজেও সেই মায়ের কত আদরের বস্তু। এইবকম বাপ-মা যখন তাকে এক-আধটুকু আদর কবেন, গাল টিপে দেন, কি তারই মতো করে আধো-আধো বুলিতে আলাপ জমাবাব চেষ্টা করেন তখন কি তাব তেমনই মনের পুষ্টি হয় না দুধে যেমন তার শরীরেব পুষ্টি ঘটে? কিন্তু তাই বলে কি কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে সব সময়েই শিশুর সঙ্গে বকরবকর করতে হবে, না চব্বিশ ঘণ্টা কোলে কবে তাকে নাচাতে হবে? এভাবে তাকে বিরক্ত করার কিংবা কোলে চড়ায় অভ্যস্ত করে তোলার কোনো মানে হয় না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে বেশি-বেশি সময় জেগে থাকতে শুরু করে। এবং সেই সময়টাতেই সাধারণত লোক-জনের সঙ্গ তারা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। তবে অল্প কিছু শিশু দিনের অন্য সময়েও এ-সব পছন্দ করে থাকে। যাই হোক, শিশু ঘুম থেকে উঠলেই তাকে কোলে নেবাব দরকার নেই, বরং তার খাট বা দোলনার কাছে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলতে পারেন। তবে শিশু কান্না শুরু করলে তাকে তুলে এনে অন্য কোনো বিছানায় বা সোফায় শুইয়ে দিতে পারেন ও কাছে-কাছে থাকতে পাবেন। এর ফলে চারিদিকে নজর চললে শিশু শান্ত হয়ে যেতে পারে। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও চুপ না করলে তখন বাধ্য হয়েই কোলে নিয়ে তাকে শান্ত করতে হবে।

শিশুকে লাই দেওয়া—শিশুর প্রয়োজনের সময় তার প্রয়োজন মেটালে, খিদে পেলে খেতে দিলে, নিরানন্দ বোধ করলে সান্ত্বনা দিলে কিংবা তার সঙ্গে সহজ অন্তরঙ্গভাবে মিশলে সে মোটেই প্রশ্রয় পায় না বা মাথায় ওঠে না। শিশু সাধারণত মাথায় ওঠে প্রয়োজন ছাড়া তার প্রতি বাড়াবাড়িরকম নজর দিলে। যে-শিশু আপন মনে খেলছে তাকে আপনার মনে থাকতে না দিয়ে কোলে তুলে চুমো খেয়ে অস্থির করে তুললে এবং এই অভ্যাসটি দিনের পর দিন বজায় রাখলে, কিংবা সারাক্ষণ শিশুকে আঁকড়ে থাকলে বা তার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে কী কবছে, কেন করছে ইত্যাদি ঠাহর করতে থাকলে প্রশ্রয় পেয়ে শিশু যে অচিরে মায়ের মাথায় উঠবে এতে আর আশ্চর্য কী।

তাছাড়া, শিশুর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে অল্পে অল্পে স্বাধীনভাবে চলতে দিয়ে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র বিকাশের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া বাপ-মায়ের কর্তব্য। এতে বাধা দিয়ে বাপ-মায়ের ওপর নির্ভরশীল করে রাখলে, অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে বলে শিশুকে 'আঁচলের তলায় ঢেকে রাখলে' শিশু শুধু পরনির্ভরশীলই হয় না, বাপ-মায়ের এই স্নেহের অত্যাচারের পাল্‌টা শোধও সে তুলতে থাকে। অর্থাৎ সে স্নেহান্ধ বাপ-মায়ের দুর্বলতার সুযোগ নিতে থাকে। ছ-মাসের শিশুর হাতে যেমন ঝুমঝুমি জুগিয়ে না দিলে শিশু নাচার, দেড় কি দু-বছরের শিশুকে তেমনি নিজে থেকে খেলনা খুঁজে নেওয়া বা তৈরি করা শিখতে দিতে হয়। এ না করলেই বরং এই শেষোক্ত শিশুকে নাচার করে তোলা হয়। এইরকম চার মাসের শিশুর সঙ্গে যে ধরনের আধো-আধো কথা বলা দরকার হয়, তিন বছরের শিশুর সঙ্গে তেমনভাবে কথা বললে সে-যে ওই চার মাসেরটির মতোই রয়ে যাবে এতে সন্দেহ কী।

শিশুকে চুমো খাওয়া—প্রসূতি ইচ্ছা হলেই শিশুকে চুমো খেতে পারেন। তবে পারতপক্ষে শিশুর ঠোঁটে চুমো না-খাওয়া বা তার

মুখের মধ্যে ফুঁ না-দেওয়াই উচিত।

এখন প্রশ্ন হল, চুমো খেলে শিশুর দেহে রোগের বীজাণু সংক্রামিত হতে পারে কিনা। ব্যাপারটি একটু আলোচনা কবে দেখা যাক। বীজাণু নামক বস্তুটি অবশ্য সর্বত্র বিরাজ করছে, বিশেষ করে মানুষের গলার মধ্যে, হাতেব ভাঁজে ইত্যাদি জায়গায় তো বটেই। তবে এর বেশির ভাগ শিশুর পক্ষে অনিষ্টকাবী নয় বললেই চলে। শিশু ক্রমশ বড় হয়ে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে মা বা ধাত্রী, বাপ ইত্যাদি যাঁরা তার কাছে-কাছে থাকেন তাঁদের শবীব থেকে এই সব বীজাণু তার নাক, গলা প্রভৃতি জায়গায় বাসা বাঁধতে থাকে। ফলে এর সঙ্গে তার রোগ-প্রতিরোধের শক্তিও বাড়তে থাকে। তবু, তা সত্ত্বেও, শিশুর নাকে-মুখে এক সঙ্গে একগাদা কম-বেশি অনিষ্টকর বীজাণু ঢুকিয়ে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে শিশু খাবাপ বীজাণুর আক্রমণ ঠেকাতে সমর্থ নাও হতে পাবে। বিশেষ করে প্রসূতির সামান্যতম সর্দিকাশি, কি গলায় ব্যথা, কি জ্বরভাব হয়ে থাকলে শিশুকে চুমো না খাওয়া বা এমন কি তার মুখেব কাছে মুখ না-আনাই কর্তব্য। প্রসূতি ছাড়া বাড়িব অন্য কাবো এবকম শরীব খারাপ হয়ে থাকলে তাকেও শিশুর কাছে ঘেষতে দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখবেন, সর্দি-কাশি কিংবা গলায় ব্যথাব মতো অসুখ একেবাবে প্রথম সূচনায় যতটা ছোঁয়াচে থাকে পবে আব ততটা থাকে না।

তবে শিশু তাব নিজেব ব্যবহাবেব চামচে, ঝিনুক, চুষিকাঠি বা জামাকাপড় মুখে দিলে বীজাণুব ভয়ে আঁতকে ওঠার দবকাব নেই। কেননা ওই সব জিনিসে যদি বীজাণু লেগেও থাকে তা শিশুর নিজের শবীরেব মধ্যেকাব বীজাণু বলেই জানবেন এবং জেনে নিশ্চিন্ত হবেন যে এতে শিশুর কোনো ক্ষতি হবে না।

পাঁচ । শিশুর স্বাস্থ্য, অভ্যাস, অসুখবিসুখ

ওজনবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা

আগেই বলেছি জন্মের পর প্রথম এক সপ্তাহ ধরে শিশুর ওজন কমতে থাকে। অতঃপর একটি সাধারণ শিশু প্রতি সপ্তাহে প্রায় চার আউন্স করে ওজনে বাড়ে। ওজনবৃদ্ধির এই হার শিশুর ৩ মাস বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তারপর অল্পে অল্পে কমতে থাকে। শিশুর বয়স ৬ মাস হলে সপ্তাহে তার ওজনবৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় প্রায় দু-আউন্স করে। অবশেষে প্রথম বছরের শেষ তিন মাসে ও দ্বিতীয় বছরে এই হাব আবো কমে গিয়ে সপ্তাহপ্রতি যথাক্রমে এক থেকে দেড় আউন্স ও এক আউন্সে দাঁড়িয়ে যায়। একটি সাধারণ শিশুর জন্মের সময় যা ওজন থাকে, তাব বয়স ৫ মাস হলে সেই ওজন বেড়ে সাধারণত দ্বিগুণ হয়। আমাদের দেশে একটি সাধারণ শিশুর ওজন জন্মেব সময় ৫ থেকে ৫৷৷০ পাউণ্ডেব মতো হয়ে থাকে, কাজেই ৫ মাস বয়সে তার ওজন বেড়ে ১০ থেকে ১১ পাউণ্ডের মতো হওয়া উচিত।

তাহলে, ওপরের এই হিসেব থেকে আমবা দুটি তথ্য দেখতে পাচ্ছি— (১) একটি সাধারণ শিশুব বয়সবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের ওজন-বৃদ্ধির হার আনুপাতিকভাবে কমতে থাকে এবং এই সাপ্তাহিক বা মাসিক ওজনবৃদ্ধিও ক্রমশ অনিয়মিতভাবে হতে থাকে, এবং (২) এ-ধরনের শিশুর জন্মকালীন ওজন শিশুব ৫ মাস বয়সের সময় বেড়ে দ্বিগুণ হয়।

তবে, মনে বাখা দরকার যে আসলে বাস্তবে "সাধারণ শিশু" বলে কোনো শিশু নেই। এই "সাধারণ" কথাটি হল অঙ্ক কষে বের করা হিসেবের গড় মাত্র। আসলে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়

শিশুর ওজনবৃদ্ধির হার এই "সাধারণ" হিসেবের চেয়ে হয় বেশি নয় কম হয়ে থাকে।

শিশুর ওজনবৃদ্ধির হার এই সাধারণ হারের চেয়ে কম হলে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করা দরকার—যথা, (১) সে ঠিক প্রয়োজন অনুযায়ী খেতে পাচ্ছে কিনা; নাকি স্তনদুগ্ধ কিংবা বোতলের দুধ উপযুক্ত পরিমাণে না-পেয়ে ক্ষুধার্ত থেকে যাচ্ছে (শিশু ক্ষুধার্ত থেকে যাওয়ার কয়েকটি লক্ষণ: প্রতিবার খাওয়ার নির্ধারিত সময়েব আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা আগে জেগে ওঠা ও কাঁদা, বোতলের দুধে পালিত হলে প্রতিবার বোতল চেটেপুটে সাফ করে ফেলা ও আরো খাওয়ার জন্যে লালায়িত হওয়া কিংবা কাঁদা, ইত্যাদি), কিংবা (২) তার কোনো-রকম অসুখবিসুখ হয়েছে কিনা, যথা, গরহজম, অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি, শরীরে আয়রন কিংবা ভিটামিনের অভাব, দাঁত ওঠার দরুন শরীর খারাপ, ইত্যাদি। শিশু ক্ষুধার্ত থেকে যাচ্ছে কিংবা তার কোনো অসুখবিসুখ হয়েছে বলে ওজনবৃদ্ধির হার কম হচ্ছে বা কমে যাচ্ছে এমন সন্দেহ হওয়ামাত্রই অবিলম্বে ডাক্তারবাবুকে দিয়ে শিশুকে পরীক্ষা করান। অসুখ হলে তো ডাক্তাববাবুব শরণাপন্ন হতে হবেই, এমন কি শিশুর নেহাতই পেট ভরছে না বলে ওজন ঠিকমতো বাড়ছে না এটা বুঝতে পারলেও তাব খাবার কী পরিমাণে বাড়াতে হবে তা ঠিক করার জন্যে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া ভালো। তবে একান্তই এ সম্ভব না হলে এ-বইয়ে ইতিপূর্বে শিশুর যে খাদ্যতালিকা দেওয়া হয়েছে প্রসূতি সে-অনুসাবে চলবার চেষ্টা করতে পারেন।

তবে এ-সমস্ত কারণ ছাড়াও এমনিতে স্বাভাবিকভাবে শিশুর ওজন-বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত ধীরগতি হতে পারে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই; শিশুকে জবরদস্তি প্রয়োজনের বেশি খাইয়ে রাতারাতি মোটা করে তোলার চেষ্টা করেও লাভ নেই। মনে রাখবেন, পেট ভরে খেতে পাওয়া ও স্বাভাবিক সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও শিশুর বাড় আপনা থেকে কম হলে, তার জন্যে অযথা নিজেকে ব্যস্ত না করে সে যেমনটি তাকে তেমনিই মেনে নেওয়া উচিত।

গরহজমের নানা ধরন

আগেই বলেছি, শিশুর গরহজম বা অন্য কোনো অসুখ দেখা দিলেই অবিলম্বে ডাক্তার দিয়ে তাকে পরীক্ষা করান। নিজে শিশুর ওপর ডাক্তারি ফলাতে চেষ্টা করবেন না। আত্মবিশ্বাস ভালো জিনিস, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে অতটা আত্মবিশ্বাসের ফল শেষপর্যন্ত মারাত্মক হতে পারে। তাছাড়া, মনে রাখবেন, শিশুর বমি, পেট-কামড়ানি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি যে সব সময়েই গরহজমের দরুন ঘটে তারও কোনো মানে নেই।

শিশুর গরহজমের কয়েকটি লক্ষণ সম্পর্কে নিচে কিছুটা আলোচনা করা হল।

হেঁচকি—জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস প্রায় সব শিশুই খাওয়ার পর হিক্কা বা হেঁচকি তুলে থাকে। এমনিতে অবশ্য এর বিশেষ কোনো মানে নেই, বা এর জন্যে বিশেষ কিছু করাবও দরকার করে করে না। কেবল খাওয়ার পব ঢেকুব না-তোলার জন্যে এমনটি হচ্ছে কিনা প্রসূতি তা দেখে নিতে পাবেন। নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করলে শিশুকে এক-আধ ঝিনুক ঈষদুষ্ণ জল খাইয়েও ফলাফল দেখতে পাবেন।

দুধ-তোলা ও বমি—এ-দুটি আসলে একই ব্যাপাব। কেবল অল্প পরিমাণ বমিকে চলতি কথায় 'দুধ-তোলা' বলে থাকে। জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস প্রায় সব শিশুই দুধ তুলে থাকে, কেউ কম কেউ বেশি এইমাত্র তফাত। এতে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। কোনো কোনো শিশু প্রথম কয়েক সপ্তাহে প্রতিদিন নিয়মিতভাবেই একবার কি দু-বার বেশি পরিমাণে বমি করে থাকে। শিশুটি এমনিতে সুস্থ হলে, তার ওজন স্বাভাবিকভাবে বাড়লে ও তার গরহজমের অন্য কোনো লক্ষণ না থাকলে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। তবে এরকম বমি কিছুদিন ধরে চলতে থাকলে প্রসূতি শিশুকে ডাক্তার

দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারেন। শিশু বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের অল্পস্বল্প দুধ-তোলা ও বমি সাধারণত কমতে কমতে এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

খাওয়ার পরেই শিশু অনেকটা বমি করলে, (আপাতদৃষ্টিতে সবটা খাবার তুলে দিয়েছে বলে মনে হলে) তাকে তখুনি দ্বিতীয়বার খাওয়ানোর দরকার আছে কি ? বমি করে শিশু যদি সুস্থ বোধ করে কিংবা খাওয়ার জন্যে ফের কান্না না জোড়ে তাহলে তাকে তখুনি খাওয়ানোর দরকার নেই। এক্ষেত্রে ফের খেতে চাইলে তবেই শিশুকে খেতে দেওয়া ভালো। কেননা সামান্য গরহজমের দরুন এমনটি হয়ে থাকলে পাকস্থলীকে তখনকারমতো বিশ্রাম দেওয়া দরকার হবে।

এমনিতে শিশুর বমির ধাত না হলে অথচ হঠাৎ বমি করলে, প্রথমেই প্রসূতির পক্ষে থার্মোমিটার দিয়ে তার শরীরের তাপ পরীক্ষা করা দরকার। কেননা, শুধু গরহজম নয়, জ্বর ও অন্য নানাবিধ রোগের প্রথম সূচনাও শিশুর বমি দেখে অনেক সময় ধরা যায়।

অনেক সময় অবশ্য নানা গুরুতর কারণেও শিশু বমি করে থাকে। যেমন পাকস্থলীতে শ্লেষ্মা জমে থাকার দরুন জন্মের পর একেবারে গোড়া থেকেই রীতিমতো বমি শুরু করা, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যবর্তী ভ্যাল্‌ভ বা দরজাটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়াব জন্যে খাদ্যচলাচলে বাধা ('পাইলোরোস্প্যাজম' ও 'পাইলোরিক স্টেনোসিস') এবং এ-কারণে একেবারে গোড়া থেকে কিংবা জন্মেব কয়েক সপ্তাহ পর থেকে বারে বারে প্রচণ্ড জোবে ফিনকি দিয়ে বমি করতে থাকা (এই শেষোক্ত অসুখ দুটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ শিশুদের হয়ে থাকে) ইত্যাদি। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুকে ডাক্তারি চিকিৎসার অধীনে রাখা একান্ত আবশ্যক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-ধবনের রোগ উপশমের জন্যে শিশুর ওপর এমন কি অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হয়।

আন্ত্রিক বেদনা ও কাঁদুনে শিশু—জন্মের পর দুই, তিন, কিংবা চার সপ্তাহ থেকে তিন মাস বয়সের মধ্যে অনেক শিশু 'কলিক পেইন' বা আন্ত্রিক বেদনায় ভোগে, অনেকে আবার ঠিক এই বয়সটায় বদরাগী ও কাঁদুনে হয়ে ওঠে। আবার এমন অনেক শিশুও দেখা যায় যারা এ-সময়ে একই সঙ্গে আন্ত্রিক বেদনায় ভোগে এবং রাগী ও কাঁদুনে হয়। প্রায়ই সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১০টার মধ্যে শিশুদের এইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করতে কিংবা কাঁদতে দেখা যায়। যে-শিশু পেটের তীব্র (আন্ত্রিক) বেদনায় ভোগে তাকে এই বয়সে সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই দেখা যায় যন্ত্রণার চোটে দুই-পা গুটিয়ে ওপর দিকে তুলে চিল-চিৎকার করছে এবং হয়তো বা তার মলদ্বার দিয়ে বায়ুও নিঃসৃত হচ্ছে। এ-সময়ে প্রসূতি তাকে উল্টেপাল্টে শুইয়ে, কোলে নিয়ে ভুলিয়ে, আদর করে, জল খাইয়ে কিছুতেই শান্ত করতে পারেন না। একাধিক ঘণ্টা শিশু এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন চিৎকার করে চলে। অনেক মা একে শিশুর খিদের কান্না মনে করে স্তন দিয়ে কিংবা বোতল খাইয়ে তাকে চুপ করাবার প্রয়াস পান। শিশুও সাময়িকভাবে হয়তো এ-চেষ্টায় ভোলে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় সে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্তন বা বোতল মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে ফের কান্না শুরু করে। অনেক সময় একাদি-ক্রমে ঘণ্টা চারেক কাঁদার পর শিশু তার পরবর্তী খাওয়ার নির্ধারিত সময়ে খেয়ে হঠাৎ একসময়ে শান্ত হয়ে যায়। শিশুর ক্ষুধার কান্নার সঙ্গে এই আন্ত্রিক বেদনার কান্নার তফাত আছে। ক্ষুধার কান্না সাধারণত তার খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা আগে শুরু হয়, আর আন্ত্রিক বেদনার কান্না প্রায়ই শিশুর খাওয়ার আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা পরে, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাওয়ার অব্যবহিত পরেই, শুরু হয়। শিশুর আন্ত্রিক বেদনা সাধারণত দিনের মধ্যে তার কোনো একবারের খাওয়ার পর দেখা দেয়। প্রায়ই সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১০টা কিংবা রাত্রি ২টো থেকে ৬টার মধ্যে এটি দেখা দিয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিনের বেলা ও অপেক্ষাকৃত

দীর্ঘ সময় ধরেও একে চাগিয়ে উঠতে দেখা যায়।

এছাড়া আরো এক ধরনের শিশু থাকে যারা আন্ত্রিক বেদনায় না ভুগলেও ওই দু-সপ্তাহ থেকে ৩ মাস বয়সের মধ্যে ভীষণ খিটখিটে মেজাজের, রাগী ও কাঁদুনে হয়ে ওঠে। পেট ভরে খেতে পাওয়া সত্ত্বেও এবং পেটে বেদনা বা বায়ুর চাপের কোনো লক্ষণ না দেখা গেলেও এরা থেকে থেকে একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে কাঁদতে থাকে। অনেক সময় প্রসূতি কোলে নিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করলে এরা সাময়িকভাবে চুপ করে বটে কিন্তু ফের বিছানায় শুইয়ে দিলেই চিৎকার জুড়ে দেয়।

শিশুর এরকম আন্ত্রিক বেদনার এবং বদমেজাজী ও কাঁদুনে হয়ে ওঠার মূল কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায় না। এ-সব ক্ষুধার কান্না নয়, কাজেই এক্ষেত্রে শিশুর খাওয়া বাড়িয়ে লাভ হয় না। হজমের গণ্ডগোলও এর আসল কারণ নয় বলে দেখা যায়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে এই দুই ধরনের শিশুর স্বাস্থ্যই অন্যান্য সাধারণ শিশুর চেয়ে ওজনবৃদ্ধির হার ইত্যাদি সব দিক থেকে অস্বাভাবিকরকম ভালো হতে দেখা যায়। তবু এদের কান্না ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতেই থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ অনুমান করেন, অনধিক তিন মাসের শিশুর অপরিণত স্নায়ুতন্ত্রে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় সম্ভবত এই দুই অবস্থা দেখা দেয়। উপসর্গ দুটি সাধারণত সন্ধ্যা ও রাত্রের দিকে দেখা দেয় বলে এদের সঙ্গে শিশুর শারীরিক ক্লান্তিরও কিছুটা সম্পর্ক আছে এমন অনুমান করা চলে।

অতএব শিশু এ-বয়সে আন্ত্রিক বেদনায় ভুগলে বা বদরাগী ও কাঁদুনে হয়ে পড়লে তার বাপ-মায়ের এ-কারণে বেশি ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। মনে রাখবেন, নবজাত শিশুদের মধ্যে এই দুই ধরনের উপসর্গ হামেশা দেখা যায় এবং এর ফলে শিশুদের কোনো স্থায়ী বা গুরুতর ক্ষতি হতেও দেখা যায় না। কাজেই এরকম ক্ষেত্রে বাপ-মা নিজেরা শান্ত সংযত থেকে শিশুকে কোলে নিয়ে ভোলাতে, কিংবা বিছানায় বা হাঁটুর ওপর উপুড় করে শুইয়ে ও

দরকারমতো পেটে অল্প-গরম জলের সেঁক দিয়ে ঘুম পাড়াতে, কিংবা কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো শিশুকে নুনজল কিংবা বাইকার্বোনেট-অব-সোডা ও জলের 'এনেমা' বা ডুশ দিয়ে পেট পরিষ্কার করাতে পারেন।

অল্পস্বল্প গরহজম ও বায়ু-নিঃসরণ—অনেক সময় নবজাত শিশুর আন্ত্রিক বেদনা দেখা না দিলেও মাঝে মাঝে কয়েকদিন ধরে নিছক গরহজমের পালা চলতে থাকে। আন্ত্রিক বেদনার মতো এটি যে দিনেব কোনো এক বিশেষ সময়ে দেখা দেয় তা নয়। বরং কয়েক দিন ধবে দিনের মধ্যে মাঝে-মাঝেই শিশুব পেটকামড়ানি-জনিত কান্না, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসবণ, দুধ তোলা ও বমি এবং খানিক-পাতলা খানিক-দই-দই ও (সম্ভবত) সবুজ পায়খানা চলতে থাকে। এক্ষেত্রে সুবিধা থাকলেই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। ডাক্তাববাবুর সঙ্গে পরামর্শের সুযোগ-সুবিধা না মিললে এবং শিশুর হজমের গোলমাল বেড়ে চললে প্রসূতি শিশুর খাদ্যতালিকায় নিম্নরূপ রদবদল কবে দেখতে পারেন। ওষুধের দোকানে কেমিক্যাল 'ল্যাকটিক অ্যাসিড' নামে একরকম অ্যাসিড কিনতে পাওয়া যায়। ওই অ্যাসিড কিনে এনে শিশুর বোতলের তৈরি-দুধের সঙ্গে মিশিয়ে তাই শিশুকে খাওয়াতে হবে। এই মিশ্রণের পদ্ধতি হল : দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড মেশাতে হলে তার আগে দুধ, জল ইত্যাদি বরফের বাক্সে বসিয়ে রীতিমতো ঠাণ্ডা করে নিতে হবে, অ্যাসিড খুব ধীবে ধীরে দুধের সঙ্গে ফেটিয়ে মেশাতে হবে এবং দুধে অ্যাসিড মেশানোর পর তা খুব দ্রুত কিংবা খুব বেশি গরম করে খাওয়ানো চলবে না। প্রথমত, শিশুর দুধের নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী অ্যাসিডের মাত্রা স্থির কবতে হবে। শিশু সারা দিনে ১২ থেকে ১৫ আউন্স দুধ খেলে তার ওই পরিমাণ দুধের সঙ্গে আধ চায়ের চামচ এবং ২৪ থেকে ৩০ আউন্স দুধ খেলে এক চায়ের চামচ অ্যাসিড মেশানো দরকার। অ্যাসিড সরাসরি দুধের সঙ্গে

মেশানো হয় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ ও চিনির জল দুটো আলাদা পাত্রে পৃথকভাবে ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করে বরফের বাক্সে রেখে দিতে হয়। অতঃপর ওই দুধ আর চিনি-মেশানো জল দুটোই কনকনে ঠাণ্ডা হবার পর, প্রথমে চিনি-মেশানো জলে প্রয়োজনমতো আধ থেকে এক চায়ের চামচ ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড মেশাতে হয়। চিনি ও অ্যাসিড-মেশানো জল এবপব খুব আস্তে আস্তে দুধের সঙ্গে মেশাতে হয় এবং দুধটি সঙ্গে সঙ্গে সজোবে ঘন ঘন ফেটাতে হয়। এইভাবে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড-মেশানো দুধ তৈরি হবার পর তা খুব সামান্য গরম করে বোতলে ভবে শিশুকে খাওয়াতে হয়। কয়েক দিন এইভাবে খাওয়ানোর পবও শিশুর পেটেব কোনো উন্নতি না দেখলে শিশুর অ্যাসিড-মেশানো দুধে দানাদার চিনির বদলে বাজার থেকে কিনে পরিমাণমতো কর্নসিবাপ মেশাতে হবে এবং তৈরি দুধ অর্ধেক কিংবা চারভাগেব এক ভাগ জল মিশিয়ে পাতলা করে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এতে শিশুর পেটের উপকার হলে এবং তাব ওজনবৃদ্ধিতে বাধা না হলে অ্যাসিড-মেশানো পাতলা দুধ একাধিক মাস ব্যবহার কবা যেতে পাবে।

শিশুর কান্না

প্রসূতিকে মনে বাখতে হবে, অল্প কয়েক সপ্তাহ বয়সেব শিশুব পক্ষে কান্না একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এই বয়সের শিশুকে কাঁদতে দেখলে প্রায় কোনোক্ষেত্রেই গুরুতর অসুখবিসুখ ইত্যাদির কথা চিন্তা করাব দবকার নেই। গুরুতব অসুখবিসুখ ছাড়াও শিশুর কান্নার নানাবিধ কাবণ থাকতে পাবে। শিশু খিদে পেলে কাঁদে, আবার পেট কামড়ালেও সে কান্নাকাটি কবে। এছাড়া প্রস্রাব করে বিছানা ভিজিয়ে ফেললে কিংবা শরীবে আঘাত পেলে কিংবা অল্পবিস্তর অসুস্থ হলেও শিশু কাঁদে। আবার ঘন ঘন কোলে চড়ায় অভ্যস্ত হলে ও প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠলেও শিশু কান্নাকাটি কবে।

এখন, শিশুব কান্না শুনে উপরোক্ত সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে থেকে

সে-কান্নার আসল কারণটি খুঁজে বের করার উপায় কি? নতুন মায়ের পক্ষে প্রথম কয়েক সপ্তাহে অবশ্য এই কান্নার কারণ আবিষ্কারে কিছুটা মুশকিলে পড়তে হতে পারে। তবে শিশু ক্রমশ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাস কয়েকের মধ্যে প্রথম প্রসূতিও তাঁর শিশুর ধরনধারন রপ্ত করে ফেলতে পারবেন এবং তখন তাঁর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন কারণে কান্নার আলাদা ধরনগুলিও চিনে নেওয়া শক্ত হবে না।

শিশুর খিদের কান্না সাধারণত তার অন্যান্য ধরনের কান্নার চেয়ে কিছুটা অন্য রকমের হয়। এটা জানা কথা যে শিশু সাধারণত একেক দিন একেক সময়ে হঠাৎ-হঠাৎ ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে ন। প্রতিদিন কমবেশি প্রায় নির্দিষ্ট সময়েই শিশু ক্ষুধার্ত হয় এবং খিদেও আচমকা সাংঘাতিক প্রবল হয়ে ওঠে না। শিশুর খিদে ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। তাছাড়া একেকবাবের খাওয়ায় পেট না ভরলে শিশু প্রথম প্রথম আরো বেশি খাওয়ার জন্যে হাঁকপাঁক করতে থাকে, আরো বেশি খাবার খোঁজে। অতঃপর এর পরের কয়েক দিন শিশু তার প্রত্যেক দু-বার খাওয়ার মধ্যে, অর্থাৎ পরেব বারের খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে, ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করে। শিশুর খিদে যদি এর চেয়েও জোরালো হয় (অর্থাৎ প্রতিবারের খাওয়ায় তার পেট যদি এর চেয়েও কম ভরে) তাহলে তার ঘুমও প্রত্যেক দুটি খাওয়ার মধ্যে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ভাঙতে থাকে। এইভাবে কয়েক দিন চলার পর তবেই হয়তো শিশু প্রতিবার খাওয়ার ঠিক পরেই আরো বেশি খাওয়ার জন্যে কাঁদতে থাকে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে শিশু জেগে উঠে কাঁদতে থাকলে তাকে খেতে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট ঘণ্টায় প্রতিবার খাওয়ার সময়ে সে যাতে পেটভরা খাবার পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

তবে পেটভরা খাদ্য পাবার পরও আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে শিশু ফের জেগে উঠে অসময়ে কান্না জুড়লে সে-কান্না খিদের না হয়ে শিশুর পেট কামড়ানির দরুন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রস্রাব করে বিছানা ভিজিয়ে ফেলার জন্যে অস্বস্তি বোধ করার দরুন শিশু কাঁদতে থাকলে সে-কান্নার কারণ আবিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। তবে এমন বহু শিশু দেখা যায় যারা বিছানা ভেজার দরুন মোটেই অস্বস্তি বোধ করে না বা কাঁদে না।

এইরকম শিশুর শরীরে আঘাতজনিত কান্নার কারণ আবিষ্কারও সহজ ব্যাপার।

অল্পস্বল্প কিংবা গুরুতর অসুখের জন্যেও শিশু কাঁদতে পারে। জন্মের পর গোড়ার কয়েক মাসে শিশুর সর্দিকাশি ও পেটের গোলযোগ অতি সাধারণ ঘটনা। তবে এ-ধরনেব অসুখ হলে শিশু যে একটু বেশি কাঁদে তাই নয়, এর সঙ্গে নাক দিয়ে সর্দি ঝরা, শব্দ করে কাশা, পাতলা পায়খানা করা ইত্যাদি নানা উপসর্গও দেখা দেয়। ফলে কান্না ছাড়াও এই সব রোগলক্ষণ দেখে রোগনির্ণয় করা সহজ হয়ে পড়ে। জন্মেব পর প্রথম কয়েক মাসে এইসব রোগ ছাড়া অন্যান্য রোগের সংক্রমণ খুবই বিরল ঘটনা। তবে শিশুর কান্না ও উপরোক্ত লক্ষণগুলি ছাড়াও তার চেহারায় ও গায়েব রঙে কোনোরকম পবিবর্তন লক্ষ্য কবলে প্রসূতির কর্তব্য হবে অবিলম্বে থার্মোমিটারের সাহায্যে শিশুব গায়েব তাপ পবীক্ষা করা এবং ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হওয়া।

শিশু কাঁদলে তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেওয়া ও শান্ত করা উচিত। "যথাসম্ভব" মানে মাঝে-মাঝে এক-আধটুকু কোলে নেওয়া কিংবা দোল দেওয়া বোঝানো হচ্ছে। জন্মের পর প্রথম দু-তিন মাস এতে ক্ষতি হয় না। তবে এ-বয়সেও শিশুকে কাঁদা মাত্রই কোলে নেওয়া ঠিক নয়। এরকম বহু শিশু দেখা যায় যারা এ-বয়সে থেকে থেকে অকাবণে কেঁদে ওঠে ও ফের আপনা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। অনেকে আবার প্রতিবার ঘুমানোর আগে কয়েক মিনিট না কেঁদে ঘুমোতে পারে না। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে নেহাত প্রয়োজন না হলে শিশুকে কোলে না-নেওয়াই কর্তব্য।

অনেক সময় তিন মাস কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়সের শিশুকে

অতিরিক্ত কাঁদুনে হয়ে উঠতে দেখা যায়। সাধারণত যে-সব শিশু জন্মের পর প্রথম তিন মাস আন্ত্রিক বেদনায় ভোগে এবং এইভাবে কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী অসুখে ভোগার দরুন যাদের মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে ওঠে ও ঘুম কমে যায় ও যারা অসুস্থতার জন্যে যখন-তখন কোলে চড়তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তিন মাস বয়সের পর আন্ত্রিক অসুখ সেরে গেলেও তাদের মধ্যে অনেককে কাঁদুনে হয়ে উঠতে ও যখন-তখন কোলে ওঠার জন্যে সোহাগেব কান্না কাঁদতে দেখা যায়। তিন মাস কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়সের এ-ধরনের শিশুকে একমাত্র তার খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে পারতপক্ষে কোলে না নেওয়াই সঙ্গত। এদের ববং দোল দিয়ে, দোলনায় পুতুল ঝুলিয়ে কিংবা দিনের মধ্যে বেশ কিছুটা সময় ঘবেব বাইরে উঠোনে কিংবা বারান্দায় রেখে ভোলানোর চেষ্টা করাই কর্তব্য।

তবে শিশু স্বাভাবিক সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অতিবিক্তরকম কাঁদুনে হলে এবং তাকে শান্ত করার উপরোক্ত উপায়গুলি তেমন কার্যকরী না হলে প্রসূতির উচিত এ-ব্যাপারে তাঁর ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হচ্ছে শিশুর কান্না নিয়ে খুব বেশি মাথা না-ঘামানো, অর্থাৎ শিশুকে কেঁদে কেঁদে আপনা থেকে চুপ করতে শেখানো। এ-ধবনের শিশুর মা বাড়িতে থেকে এতটা কান্না সহ্য করতে না পাবলে তিনি যেন মাঝে মাঝে—সপ্তাহে দু-তিন দিন—সকালে কিংবা সন্ধ্যায় শিশুর ভার অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করে দু-তিন ঘণ্টা অন্য কারো বাড়ি ঘুরে আসেন। এর ফলে শিশুকে নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর সুযোগ যেমন কমবে, তেমনি অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা এড়াতে পেরে প্রসূতির মানসিক ভারসাম্যও রক্ষিত হবে। ফলে, শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই উপকার হবে।

কোনো কোনো শিশু কাঁদতে কাঁদতে এত রেগে ওঠে যে তারা দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্বাস বন্ধ করে থাকে ও সময়-সময় একেবারে নীল হয়ে যায়। শিশুর শরীর যদি স্বাভাবিক সুস্থ থাকে (অর্থাৎ আন্ত্রিক বেদনা ইত্যাদি না থাকে) এবং তা সত্ত্বেও যদি সে এভাবে কাঁদতে অভ্যস্ত

হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে স্বভাবতই বদ্‌মেজাজী। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে প্রসূতির কর্তব্য হবে ডাক্তারবাবুকে বিষয়টি জানানো। তবে শিশু অসুস্থ না হলে প্রসূতি কিংবা ডাক্তারবাবু কারো এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু করার থাকে না। কাঁদতে কাঁদতে শিশু দম বন্ধ করে থাকে ও নীল হয়ে যায় বলে যে তাকে সর্বক্ষণ কোলে তুলে নাচাতে হবে ও প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলতে হবে তার কোনো মানে নেই।

শিশুর পায়খানা

জন্মের পর প্রথম এক দিন কিংবা দু-দিন শিশু চট্‌চটে আঠালো, নরম, সব্‌জে-কালো রঙের পায়খানা কবে থাকে। অতঃপর ওই পায়খানার রঙ বদলে বাদামি ও হলদে রঙেব হয়ে থাকে।

প্রথম কয়েক সপ্তাহে স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশু দিনের মধ্যে বেশ বার-কয়েক পায়খানা কবে থাকে। এদেব মধ্যে কেউ কেউ প্রতিবার স্তন্যপানের পবে পরেই একবার করে মলত্যাগ করে। এই ধরনের শিশুর মল সাধারণত হাল্‌কা হলদে রঙের হয়ে থাকে। এই মল চট্‌চটে আঠালো কিংবা থকথকে পাতলা দইয়ের মতো হয়, কিন্তু প্রায় কখনোই অতিরিক্ত শক্ত হয় না। স্তন্যপানে অভ্যস্ত শিশুদের মধ্যে অনেকের এক, দুই কিংবা তিন মাস বয়সেব পবে পায়খানার অভ্যাস বদলে যেতে দেখা যায়। তখন এদেব মধ্যে কেউ দিনে মাত্র একবাব, কেউ-বা একদিন অন্তব একবার, আবাব অন্য কেউ-কেউ প্রতি তিন দিনে একবার করে মলত্যাগে অভ্যস্ত হয়। শিশু যদি অস্বস্তি বোধ না কবে ও স্বাভাবিক সুস্থ থাকে তাহলে প্রতি তিন দিনে একবার পায়খানা করলেও প্রসূতির ভয় পাবার কিছু নেই। তবে এই রকম দিন দুই-তিন অন্তর পায়খানা করতে গিয়ে শিশু নিয়মিতভাবে অস্বস্তি বোধ করলে ও মলত্যাগ অপেক্ষাকৃত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া ভালো।

গোরুর দুধে অভ্যস্ত শিশু প্রথম প্রথম দিনে এক থেকে চার বারের মতো পায়খানা করে থাকে। অতঃপর ক্রমশ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে

সঙ্গে ওই সংখ্যা কমে দিনে এক কিংবা দু-বারে দাঁড়িয়ে যায়। এ-ধরনের শিশুর পায়খানা প্রায়ই চট্‌চটে আঠালো ও ফিকে হলুদে রঙের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার দই-দই, জল-জল পায়খানাও করে থাকে। শিশু যদি স্বাভাবিক সুস্থ বোধ করে ও তার ওজনবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে তাহলে অবশ্য পায়খানার বার ও পরিমাণ ইত্যাদিতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। গোরুর দুধে অভ্যস্ত শিশুর পায়খানার যে-বিশেষ গণ্ডগোলটি বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় তা হল মলের কাঠিন্যের দিকে একটা প্রবণতা।

বোতলের দুধে অভ্যস্ত অল্প কিছু শিশুর ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক মাস পাতলা পায়খানার দিকে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এও দেখা যায় যে দুধে চিনির মাত্রা বাড়ালে পায়খানাও ক্রমশ বেশি পাতলা হতে থাকে। অবস্থা জটিল বলে বোধ হলে এ-সমস্ত ক্ষেত্রে অবিলম্বে ডাক্তারবাবুর চিকিৎসাধীনে শিশুকে রাখা কর্তব্য।

শিশুর পায়খানায় হঠাৎ কোনোরকম পরিবর্তন দেখা দিলে কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল ঘটেছে বলে মনে করতে হবে ও ডাক্তারবাবুকে অবিলম্বে বিষয়টি জানাতে হবে। অনেক সময় অল্পস্বল্প গরহজম কিংবা আন্ত্রিক অসুখের দরুন আগেকার চট্‌চটে আঠালো মলের জায়গায় বড়ি-বড়ি, কিংবা আগের চেয়ে আরো একটু পাতলা ও আরো একটু ঘন ঘন পায়খানা হওয়া সম্ভব। পায়খানা যদি স্পষ্টতই আগের চেয়ে পাতলা হয় ও তার রঙ হয় সবুজ-গোছের এবং আগের চেয়ে ঘন ঘন পায়খানা হতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে শিশুর নিশ্চিতই উদরাময় বা আন্ত্রিক অসুখ ঘটেছে। দু-এক দিন বন্ধ থাকার পর অস্বাভাবিক শক্ত পায়খানা হলে বুঝতে হবে সম্ভবত এটি ঠাণ্ডা-লাগা ও গলা-বসার প্রাথমিক লক্ষণ।

কোষ্ঠকাঠিন্য

শিশু যদি অস্বস্তি বোধ না করে ও স্বাভাবিক সুস্থ থাকে এবং তার পায়খানা যদি বেশ নরম থাকে, তাহলে তার এক কিংবা দু-দিন

অন্তর পায়খানা হলে ও দিনের মধ্যে অনিয়মিত সময়ে পায়খানা হলেও এ-অবস্থাকে কোষ্ঠকাঠিন্য বলা চলবে না। সাধারণত পায়খানা অতিরিক্ত শক্ত হলে ও মলত্যাগ রীতিমতো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে তাকেই কোষ্ঠকাঠিন্য বলা হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি গোরুব দুধে পালিত শিশুব মল অনেক সময় রীতি-মতো শক্ত ও জমাট-বাঁধা হয়ে থাকে এবং তা সময়-সময ত্যাগ করা বেশ কষ্টকবও হয। এ এক ধবনেব কোষ্ঠকাঠিন্যেবই অবস্থা। শিশুর এবকম কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে তাকে ডাক্তাব দেখানো কর্তব্য।

অপেক্ষাকৃত বেশি বযসেব শিশু বা বালকবালিকা, যারা দুধ ছাড়াও অন্যান্য বকমাবি খাদ্য, যথা—ভাত, রুটি, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি খায, তাদেব মধ্যে দীর্ঘস্থাযী কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায। শিশুব কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে প্রথমেই নিজে থেকে চিকিৎসাব চেষ্টা না কবে প্রসূতিব উচিত অবিলম্বে ডাক্তারের শবণাপন্ন হওয়া। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে 'এনেমা' বা ডুশেব ব্যবস্থা যথা-সম্ভব কম কবা বিধেয়। ববং ডাক্তাববাবুব পবামর্শমতো পথ্য, ওষুধ-বিষুধ কিংবা ব্যাযামেব ব্যাপাবে শিশুকে খেলাচ্ছলে বাজী কবানোয় সুফল হবে বেশি। তবে নিতান্তই চিকিৎসকেব সাহায্য পেতে অপারগ হলে প্রসূতি সাময়িকভাবে তাঁব শিশুকে বযস অনুযায়ী তরিতরকাবি, ফল ইত্যাদি খেতে দিতে, ব্যাযাম কবাতে ও মাঝে মাঝে এক-আধবাব এনেমার ব্যবস্থা কবতে পাবেন।

যে-কোনো অসুখে, বিশেষ কবে যদি তাব সঙ্গে জ্বর থাকে, আনুষঙ্গিক উপসর্গ হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। একে সাধাবণত সামযিক ও স্বল্পস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য বলা হয। আগেকার দিনে তো বটেই, এমন কি আজকেব দিনেও, বহু শিশুব বাপ-মা মনে করেন যে শিশুব জ্ববেব এই 'আনুষঙ্গিক উপসর্গ'টিব চিকিৎসাই সবচেযে আগে করা দরকাব এবং যতক্ষণ না বোগীর "পেট পবিষ্কাব" হচ্ছে ততক্ষণ নাকি তাব অসুখ সাববে না। অনেকে এমন কি এই কোষ্ঠকাঠিন্যকেই শিশুর অসুখবিসুখেব মূল কাবণ বলে মনে করেন।

এ ধারণাটি কিন্তু ঠিক নয়। আসলে শিশু জ্বর কিংবা অন্য কোনো অসুখে আক্রান্ত হলে তার ফলে তার পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদি খাদ্য-পরিপাক যন্ত্রগুলিও কমবেশি বিকল হয়ে পড়ে। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ক্ষুধামান্দ্য, গা-বমির ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি দেখা দেয়। অতএব জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে ডাক্তার দেখুন আর না দেখুন, প্রসূতি যেন তার শুশ্রূষা কিংবা চিকিৎসা করতে গিয়ে শিশুর কোষ্ঠ-কাঠিন্য নিয়ে অতিরিক্ত মাথা না ঘামান। এ-ব্যাপারে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর চেয়ে একেবারে মাথা না ঘামানো বরং ভালো। বড়জোর শিশুর সর্দিজ্বর কিংবা ওই ধরনের কোনো সংক্রামক রোগ হয়েছে বলে নিশ্চিত হলে ও রোগী দু-তিন দিন পায়খানা করেনি দেখলে তাকে একবার এনেমা দেওয়া যেতে পারে. এই পর্যন্ত।

এছাড়া এমন আরো দু-ধরনের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, শিশুর এক থেকে দু-বছর বয়সের মধ্যে নিছক মনস্তাত্ত্বিক কারণে যাদের উদ্ভব হতে দেখা যায়। ওই বয়সে দু-একবাব শক্ত পায়খানা করার দরুন কোনো শিশুর যদি মলদ্বারে যন্ত্রণা বোধ হওয়াব অভিজ্ঞতা জন্মে থাকে, তাহলে তাকে তারপর কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস ধরে জোর করে পায়খানা চেপে বেখে যন্ত্রণা এড়াবাব চেষ্টা করতে দেখা যায়। শিশু দু-একদিন পায়খানা চেপে রাখলেই তার মল শক্ত হয়ে যায়। ফলে শিশু এইভাবে নিজে থেকেই কোষ্ঠকাঠিন্য ও পায়খানা করার সমস্যাকে জিইয়ে রাখে। এছাড়া আরো একটা কারণে শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। মা যদি জবরদস্তি শিশুকে নিয়মিত মল-ত্যাগের অভ্যাস আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করেন তাহলেও অনেক সময় শিশু বেঁকে বসে ও জোর করে পায়খানা চেপে রেখে মায়ের জবর-দস্তির প্রতিবাদ জানাতে চায়। এর ফলেও শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে প্রসূতির উচিত নিজে চিকিৎসা ও ওষুধবিষুধের ব্যবস্থা না করে যতদূর সম্ভব ডাক্তাবের শরণাপন্ন হওয়া, কেননা ভুল চিকিৎসায় সাময়িক কোষ্ঠকাঠিন্যও অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী

অসুখে পরিণত হতে পারে এবং এতে শিশুর স্বাস্থ্যের হানি ঘটার সম্ভাবনা।

শিশুর উদরাময়

জন্মের পর প্রথম দু-এক বছর শিশুর অন্ত্র-নামের অঙ্গগুলি একটু বেশি স্পর্শকাতর অবস্থায় থাকে। এ-কারণে সামান্য একটু খাওয়ার গণ্ডগোলে—যেমন, বোতলের দুধে চিনির মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলে কিংবা অমুক তরকারির জায়গায় শিশুকে অমুক সব্‌জি খেতে দিলে, কিংবা সর্দিকাশি বা অন্য কোনো রোগ-বীজাণুর সংক্রমণ ঘটলে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের শিশুদের কিংবা পরিণত-বয়স্কদের যেখানে কিছুই হয় না সেখানে ওই বয়সের শিশুর পেট খারাপ হয় বা উদরাময় দেখা দেয়। এই জন্যেই নবজাত শিশুদের সর্দিকাশির আক্রমণ থেকে ও অন্যান্য রোগ-বীজাণুর সংক্রমণ থেকে সংরক্ষণের জন্যে এত তোড়জোড়, যথা, আবহাওয়ার অবস্থানুযায়ী তাদের জামা-কাপড় পরানোর ও অসুস্থ লোকের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার ব্যবস্থা। এই কারণেই তাদের খাদ্যবস্তু, বিশেষ করে তাদের পানীয় দুধ, অত যত্ন নিয়ে বিশোধন করার ব্যবস্থা। আবার শিশুর এই উদরাময় নিবারণের জন্যেই তার খাওয়ার অনিয়ম এড়ানোও—যথা, বোতলের দুধের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়ানো, খাদ্য-তালিকায় নতুন খাদ্যবস্তু যথাসম্ভব ধীরে-সুস্থে যোগ করা, ইত্যাদি—প্রসূতির পক্ষে বিশেষ কর্তব্য বলে গণ্য।

যে-শিশু সাধারণত ভালো পায়খানা করে থাকে, হঠাৎ তার পায়খানা পাতলা হলে ধরে নিতে হবে যে তার আন্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছে। আন্ত্রিক গোলযোগ বা উদরাময় হলে শিশুর পায়খানার অন্যান্য পরিবর্তনও দেখা দিয়ে থাকে। যেমন, পায়খানার রঙ প্রায়ই বদলাতে দেখা যায় এবং সাধারণত সবুজ রঙের পায়খানা হয়ে থাকে। এছাড়া মলের গন্ধেরও পরিবর্তন ঘটে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে পায়খানার প্রকৃতিতে, যেমন, অতিরিক্ত

শক্ত পায়খানা হঠাৎ নরম হয়ে যায় কিংবা স্বাভাবিক নরম পায়খানা একেবারে পাতলা হয়ে যায়, ইত্যাদি। মলের এই প্রকৃতিগত পরিবর্তনটিই উদরাময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রেই খুব মৃদু ধরনেব উদরাময় হয়ে থাকে এবং গোড়া থেকে চিকিৎসা করালে এ-অসুখ সহজে সেরেও যায়। তবে কোনো কোনো সময়ে শিশুর রীতিমতো গুরুতর ধরনের উদরাময়ও দেখা দিয়ে থাকে। নিম্নলিখিত যে-কোনো এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা গেলেই শিশুর উদরাময় গুরুতর রকমের হয়েছে বলে মনে করতে হবে: যথা, পাতলা জলের মতো পায়খানা, পায়খানায় পুঁজ অথবা রক্তের ছিটে, বমি, ১০২° ডিগ্রি কিংবা তার চেয়ে বেশি জ্বর, শিশুর নিস্তেজ অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকা কিংবা তার চোখ বসে যাওয়া ও চোখের কোলে কালি-পড়া, ইত্যাদি।

শিশুর উদরাময় দেখা দিলেই অবিলম্বে ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হওয়া দরকার। পেট-খারাপ অল্পস্বল্প ধরনের হলেও এতে ক্ষতি হবে না, বরং গোড়া থেকে সুচিকিৎসা হওয়ায় শিশু দ্রুত আবোগ্য লাভ করবে। আর উদবাময় গুরুতব ধরনেব হলে তো কথাই নেই, সেক্ষেত্রে যত দূব থেকে হোক ডাক্তাবকে ডেকে আনতেই হবে এবং প্রয়োজন হলে শিশুকেও হাসপাতালে স্থানান্তবিত করতে হবে।

উদরামযের জরুরী চিকিৎসা—ডাক্তাববাবুর কলে আসতে অতিরিক্ত রকমের দেরি হলে সেই সব বিশেষ ক্ষেত্রে প্রসূতি নিজে নিম্নোক্ত ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা কবতে পারেন। তবে, মনে রাখা দরকাব, দ্রুত ডাক্তার ডাকার সুযোগ-সুবিধা থাকলে প্রসূতির পক্ষে কোনো-ক্রমেই আপনা থেকে শিশুর ওপর ডাক্তারি ফলানোব চেষ্টা করা উচিত নয়। এ-জরুরী ব্যবস্থা কেবলমাত্র সেই সব প্রসূতির পক্ষে প্রযোজ্য যাঁদের পক্ষে কোনোক্রমেই বেশ কয়েক ঘণ্টা কিংবা কয়েক দিনের মধ্যে ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়।

শিশু স্তন্যপানে অভ্যস্ত হলে, অসুস্থ শিশুর ক্ষেত্রেও স্তন্যদান চালিয়ে

গেলে ক্ষতি নেই। মায়ের স্তনদুগ্ধ উদরাময়ের পক্ষে উপকারী বলা চলে। তবে এ-হেন শিশু পরিমাণে কম দুধ খেতে চাইলে তাকে ইচ্ছামতো খেতে দেওয়াই উচিত। শিশু দুধের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যে অতরল বা শক্ত খাবার ধরে থাকলে, ডাক্তারবাবু রোগী না দেখা বা উদরাময় সেরে না-যাওয়া পর্যন্ত তা পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে।

এছাড়া, শিশু যদি শুধুমাত্র বোতলের দুধের ওপর নির্ভরশীল হয় এবং তার পেটের অসুখ অল্পস্বল্প ধরনের হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিবার তার পুরো বোতলের দুধের অর্ধেক বাদ দিয়ে সমপরিমাণ জল ওই দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। ওই অর্ধেক জল-মেশানো দুধও শিশুকে তার ইচ্ছামতো খেতে দিতে হবে, অর্থাৎ শিশু বোতল খালি করে না ফেললেও তাকে জবরদস্তি খাওয়ানো চলবে না। তবে এই পাতলা দুধ খেয়ে শিশুর যদি আগের চেয়ে ঘন ঘন খিদের উদ্রেক হয় তো তাকে অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন ওই উপরোক্ত ধরনের দুধ খেতে দিতে বাধা নেই। যতদিন না শিশুর পায়খানা আবার স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করছে ততদিন এবং তার পরেও আরো চব্বিশ ঘণ্টা শিশুকে ওই অর্ধেক জল-মেশানো দুধের ওপরই রাখতে হবে। অতঃপর ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে দুধে জলের অনুপাত কমিয়ে দুধের মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। তবে এ-সমস্ত ক্ষেত্রে পেটের অসুখ দু-তিন দিনের বেশি সময় স্থায়ী হলে বুঝতে হবে রোগ নিতান্ত অল্পস্বল্প ধরনের নয় এবং সেক্ষেত্রে অবিলম্বে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

যদি কোনো শিশু একই সঙ্গে বোতলের দুধ ও শক্ত খাবারের ওপর নির্ভরশীল হয় ও তার অল্পস্বল্প পেটের অসুখ দেখা দেয়, তাহলে প্রথমেই শক্ত খাবার বন্ধ করতে হবে। যতদিন না তার অসুখ সম্পূর্ণ সারে, ততদিন এই শক্ত খাবার বন্ধ রাখাই বিধেয়। যদি দেখা যায় যে এতেও শিশুর অসুখ ভালো হচ্ছে না বা তার দুধের খিদেও যথোপযুক্ত পরিমাণে হচ্ছে না, তাহলে তার বোতলের দুধেও

পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে অর্ধেক জল মিশিয়ে পরপর কয়েক দিন খেতে দিতে হবে। অতঃপর শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর প্রথমে বোতলের দুধে জলের অনুপাত পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ক্রমশ কমিয়ে ফেলতে হবে ও বোতলের দুধ ফের স্বাভাবিক অনুপাতে ফিরে এলে পরে ক্রমে ক্রমে পরিমাণে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আবার শক্ত খাবার খেতে দিতে হবে। অতরল খাদ্য প্রথম দিন স্বাভাবিক পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ, দ্বিতীয় দিন দুই-তৃতীয়াংশ, তৃতীয় দিন পুরো পরিমাণ—এইভাবে বাড়াতে হবে। এছাড়া, একেক দিন একেক ধরনের শক্ত খাবার শিশুর খাদ্য-তালিকায় যোগ করতে হবে; যেমন, প্রথম দিন শুধু ভাত, দ্বিতীয় দিন ভাত ও ডালের ওপরের জলের মতো ঝোল এবং কমলা লেবুর রস, তৃতীয় দিন আলু ইত্যাদি, চতুর্থ দিন সহজপাচ্য মাছ, পঞ্চম দিন ডিম ইত্যাদি, ষষ্ঠ দিন অন্যান্য ফল ও কড্‌লিভার অয়েল, সপ্তম দিন শাকসব্‌জি ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রত্যেকটি ধরনের খাদ্যই প্রথম দিন স্বাভাবিক পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ খেতে দিয়ে শুরু করতে হবে।

কিন্তু এ তো গেল অল্পস্বল্প পেটের অসুখের কথা। কোনো শিশুর গুরুতর ধরনের উদরাময় দেখা দিলে এবং অসুখ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সাহায্য না পাওয়া গেলে, শিশুকে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা নিছক ফোটানো জল খাইয়ে রাখতে হবে। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে, এমন কি অর্ধেক জল-মেশানো দুধ পর্যন্ত খাওয়ানো চলবে না। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা কিংবা ডাক্তারবাবু না-আসা পর্যন্ত শিশুর চাহিদা অনুযায়ী প্রতি দুই কিংবা তিন ঘণ্টা অন্তর এক থেকে চার আউন্স পরিমাণ জল খাওয়ানো যেতে পারে। অতঃপর শিশু যদি বেশ কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠে তাহলে নিম্নোক্ত অনুপাত অনুসারে তাকে দুধ খাওয়ানো ও দুধের মাত্রা ক্রমশ বাড়ানো সম্ভব হবে। যেমন, প্রথম দু-দিন শিশুর দুধের স্বাভাবিক পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ দুধ, তিন-চতুর্থাংশ জল ও চিনি একেবারে বাদ (এই জল-মিশ্রিত দুধ আবার ২০ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে); তৃতীয় ও চতুর্থ দিন

স্বাভাবিক পরিমাণের অর্ধেক দুধ অর্ধেক জল, চিনি বাদ ; পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন স্বাভাবিক পরিমাণের তিন-চতুর্থাংশ দুধ, বাকি জল, চিনি বাদ ; সপ্তম ও অষ্টম দিন আগের মতোই স্বাভাবিক পরিমাণ দুধ ও জল, চিনি বাদ ; নবম ও দশম দিন ওই দুধে-জলে স্বাভাবিক পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশ চিনি ; একাদশ ও দ্বাদশ দিন স্বাভাবিক পরিমাণ দুধে-জলে স্বাভাবিক পরিমাণ চিনি ; তেরো দিনের দিন থেকে রোগীর দুধ প্রতিবার আর ২০ মিনিট ধরে ফোটানোর দরকার নেই ; চোদ্দ দিনের দিন থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে খাদ্য-তালিকায় শক্ত খাবার যোগ করা চলতে পারে। তবে এই উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করার মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে শিশুর ফের পাতলা পায়খানা দেখা দিলে সমস্ত পথ্য বন্ধ করে অবশ্যই আবার সেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে।

অন্যান্য কয়েকটি উপসর্গ

চুলকানি—জন্মের পর গোড়ার কয়েক মাস প্রায় সমস্ত শিশুর গায়ের চামড়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। ফলে, তার শরীরের যে-অংশ কাঁথা বা অয়েলক্লথের সঙ্গে ঠেকে থাকে, যথা পিঠ ও ঘাড়ের পেছনদিক এবং শিশুকে লেঙটজাতীয় কাপড়ের টুকরো পরানো হলে তার কোমর ও তার নিচের অংশ অনেক সময় চুলকানির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই চুলকানি সাধারণত খুব ছোট ছোট লাল বা সাদা পুঁজভরা ফুস্কুড়ি কিংবা চাপবাঁধা অবস্থায় দেখা দিয়ে থাকে। সাধারণত শিশুর প্রস্রাবে সিক্ত কাপড়চোপড় থেকে উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার ক্রিয়ার ফলে এই জাতীয় চুলকানি দেখা দেয়। একারণে শিশুর ব্যবহৃত অয়েলক্লথ, কাঁথা, জামাকাপড়, লেঙট, চাদর ইত্যাদি সব কিছু প্রস্রাবে ভেজামাত্র বদলে দেওয়া, প্রস্রাবে-ভেজা কাপড়চোপড় ইত্যাদি প্রতিবার রৌদ্রে দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া এবং প্রতিদিন নিয়ম করে আগের দিনের ব্যবহৃত যাবতীয় জিনিসপত্র সাবান-জলে ভালো করে ফুটিয়ে, কেচে, রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া কর্তব্য।

শিশুর দেহে চুলকানি দেখা দিলে এইসব জিনিসপত্র অধিকন্তু অ্যামোনিয়ানাশক বিশোধক কোনো ওষুধ দিয়ে কেচে নিতে পারলে ও শিশুর দেহের আক্রান্ত অঙ্গগুলি প্রতিদিন বেশ কিছুক্ষণ আলো-হাওয়ায় খুলে রাখতে ও দিনে দু-তিনবার সেখানে জিঙ্ক অয়েন্টমেন্ট বা ওই জাতীয় কোনো মলম প্রয়োগ করতে পারলে খুব ভালো হয়।

উপরোক্ত চুলকানি ছাড়াও গ্রীষ্মকালে শিশুদের গলা, ঘাড়, পিঠ, কুঁচকি ইত্যাদি অঙ্গে ঘামাচি দেখা দেওয়াও একটি অতি সাধারণ ঘটনা। এ-সমস্ত ক্ষেত্রে শিশুকে খালি গায়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা এবং ঘামাচিতে আক্রান্ত অঙ্গে ওষুধযুক্ত পাউডারের কিংবা তরল বাইকারবোনেট-অব-সোডা সলিউশনের প্রলেপ বিশেষ ফলপ্রদ।

এছাড়া, গোড়ার কয়েক মাসে নবজাতকের মাথার তালুতে ঘা বা একৃজিমা আর একটি সাধারণ উপসর্গ। এ-রোগের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হল মাথায় জল বা সাবান একেবারে স্পর্শ না করানো ও তার পরিবর্তে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো কোনো একটি খনিজ তেল তুলোয় ভিজিয়ে দিনে বার দুয়েক আক্রান্ত অঙ্গটি পরিষ্কার করে দেওয়া।

চোখে জল ও পিচুটি পড়া—জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই অনেক শিশুর চোখে জল পড়তে ও চোখের কোণে অতিরিক্ত রকম পিচুটি জমতে শুরু করে। অনেক সময় জন্মকালে শিশুর চোখে সিল্‌ভার সলিউশন দেওয়ার দরুন এই উপসর্গটি দেখা দেয়। উপসর্গটি দ্রুত আরোগ্য না হলে কিংবা এর সঙ্গে (বা আলাদাভাবে) চোখের সাদা অংশটি লাল বা গোলাপী হয়ে উঠলে শিশুর চোখে কোনো রোগের সংক্রমণ ঘটেছে বলে মনে করা ও তাকে ডাক্তার দেখানো অবশ্যকর্তব্য।

ছয় | উপসংহার

শিশুর বিকাশ ঃ মানবেতিহাসের পুনরাবৃত্তি

দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতো ছোট্ট একটি শিশুর বেড়ে ওঠা, শিশুর বিকাশ—এর চেয়ে রোমহর্ষক, কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য পৃথিবীতে আর কি আছে? আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে অন্যান্য যে-কোনো জিনিসের মতো একটি বিশেষ বস্তুর এ বুঝি শুধুই বেড়ে-ওঠা। ছোট্ট একটি জিনিস ক্রমশ বড় হয়ে উঠল, এ আর বেশি কথা কী? তারপর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওই ছোট্ট প্রাণীটি যখন জাগতিক নানা বিষয় নানা কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে তখনও আমরা বলি, 'আহা, বাচ্চাটি কতই না কায়দা শিখছে!' কিন্তু আসলে এ কি সত্যিই শুধুমাত্র 'বেড়ে ওঠা' শুধুমাত্র 'কায়দা শেখা'? মোটেই নয়। এ-সবের তাৎপর্য আরো জটিল, এর অর্থ খুঁজতে হবে জীবনের আরো গভীরে। প্রত্যেকটি মানবশিশু ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে, শারীরিক ও আত্মিক এই দুই অর্থেই, সমগ্র মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। মাতৃগর্ভে ছোট্ট একটিমাত্র জীবকোষ হিসেবে প্রথম যখন শিশুসৃষ্টির সূচনা হয়, তখন তার মধ্যে কোটি কোটি বছর আগেকার এক-কোষবিশিষ্ট পৃথিবীর প্রথম জীবিত প্রাণীর জীবনধারার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অতঃপর কয়েক সপ্তাহ পরে প্রসূতির জরায়ুর মধ্যে অ্যাম্‌নিয়টিক জলে ভাসমান ভ্রূণশিশুর শরীরে জলচর মাছের মতো কানকো দেখা যায়। জন্মের পর প্রথম বছরের শেষে শিশু যখন চার হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দেওয়া ছেড়ে দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে, তখন সে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের পূর্বপুরুষদের পায়ে-ভর-দিয়ে দাঁড়ানোর ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করে। ঠিক ওই এক বছর

বয়সের মাথায় শিশু তার হাতের আঙুলের সূক্ষ্ম ও জটিল ব্যবহারও শেখে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও একদা তাঁদের হাতের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পেরেই চার হাতে-পায়ে হাঁটা বন্ধ করেছিলেন এবং চলাফেরার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র তাঁদের পা-ছুটিকেই নিয়োজিত করেছিলেন। ৬ বছর বয়সের পর বাপ-মায়ের ওপর শিশুর নির্ভরশীলতা আংশিকভাবে কমে যায়; শিশু তখন তার পরিবারের বাইরেকার বিরাট জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এই খেলাকে সে তখন গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে শেখে। সম্ভবত এভাবে সে মানুষের ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্যায়টিরই পুনরভিনয় করে যখন আমাদের বন্য পূর্বপুরুষেরা অরণ্যব... পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠী গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং নিজ নিজ পারিবারিক গোষ্ঠীর বৃদ্ধ পিতার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভরশীল হয়ে না থেকে বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টায় আত্ম-সংযম, পারস্পরিক সহযোগিতা, নিয়মশৃঙ্খলা শিক্ষা, ইত্যাদি মানবোচিত গুণ আয়ত্ত করেছিলেন।

আশা করি এইভাবে শিশু কিসের প্রতীক, শিশুর বিকাশের তাৎপর্য কী ইত্যাদির গভীর অর্থ শিশুর বাপ-মা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সন্তানের সঙ্গে সম্যকভাবে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সমর্থ হবেন।